ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

ষোড়শ বর্ষ • শারদ সংখ্যা • আশ্বিন ১৪৩৩ • অক্টোবর ২০২৬.

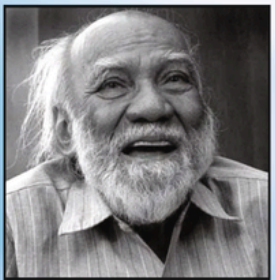

- ওষুধ শিল্প
- ক্যান্সার
- অটিজম
- সমাজে নারী
- কাঁদছে পাহাড়
- উজবেকিস্তানের দর্শন
- যশ পালের গল্প শম্ভুক

দ্বিশতবর্ষে রাজনারায়ণ বসু,
শতবর্ষে ইলা মিত্র মহাশ্বেতা দেবী,
শতবর্ষে বাদল সরকার
স্মরণে শংকর আনবে পেতে ই আশা ভোঁসলে মারতাবিল রঘু রাই
দস্তয়েভস্কি ও ব্রাদার্স কারমা জাভ

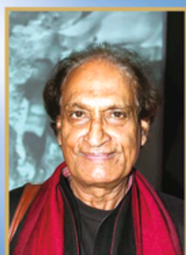

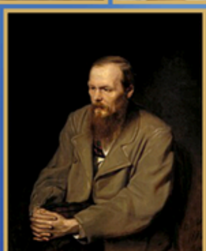

স্বাস্থ্য

শিক্ষা

উন্নয়নের

স্বাস্থ্য

শিক্ষা

উন্নয়নের

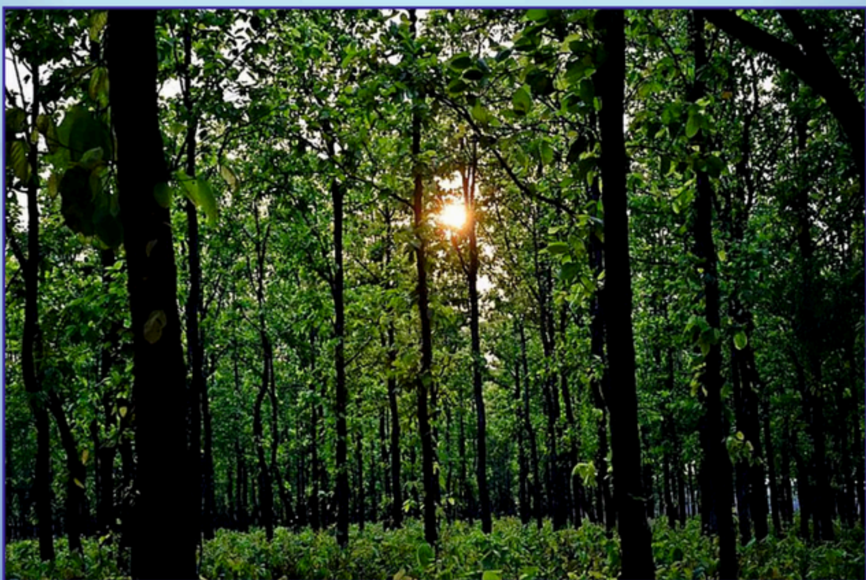

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর | ISSN: 13660

ষোড়শ বর্ষ ● শারদ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪৩৩ ● অক্টোবর ২০২৬

পৃষ্ঠপোষক : জ্ঞানব্রত শীল, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, রূপক ঘোষ, অনিতা মজুমদার, ষড়ানন পাণ্ডা, অরুণ সেন, বিজন ভট্টাচার্য, ফণিগোপাল ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু নাথ, কুমার রাণা, প্রবীর সিংহ রায়, দীপক দাঁ, হীরালাল কোনার, পুণ্যব্রত গুন, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর পাল, রাহুল মুখোপাধ্যায়, বরুণ সাহা, সন্দীপ ঘোষ, সৈয়দ শাজাহান সিরাজ এবং অলকানন্দা রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী : শুভেন্দু দাশগুপ্ত, জয়া মিত্র, তৃপ্তি সান্ত্রা, ভবানীপ্রসাদ সাহু, জাতিশ্বর ভারতী, কৌশিক সেন, সোমনাথ গুহ, সোমা সেনগুপ্ত, অর্ণব সেনগুপ্ত, অমিতাভ চক্রবর্তী, সোমেন চক্রবর্তী, শুভম ভট্টাচার্য, সুদেব সাহা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শমিত কর, অমিত পান, ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ চৌধুরি, শুভময় দত্ত এবং অরণি সেন

সম্পাদকীয় সহযোগিতা : অভিজিৎ দাস, অনন্ত কর্মকার, রাজা রাউথ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম শর্মা, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায় এবং অরুণাভ বিশ্বাস

ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সোম, দিলীপ সেন, অর্ঘ্য মিত্র, সুমন্ত বিশ্বাস এবং তপন দাস

যোগাযোগ : রামজীবন ভৌমিক (কোচবিহার), সুমন গোস্বামী (আলিপুরদুয়ার), গার্গী সিংহ (জলপাইগুড়ি), ধীরাজ লাখোটিয়া (শিলিগুড়ি), রূপক পাল (রায়গঞ্জ), সূরজ দাস (বালুরঘাট), মৃদুল কান্তি সরকার (মালদা), সুমনা সেনগুপ্ত (বহরমপুর), রঞ্জন আচার্য (পুরুলিয়া), সুনীল সোরেন (সিউড়ি), তুষার গলুই (দুর্গাপুর), মৃণাল বাগচী (চাকদা), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), নীলকণ্ঠ আচার্য (বারাসাত), আনোয়ার হোসেন (দঃ বারাসাত), লক্ষ্মী ভট্টাচার্য (বজবজ), সুশান্ত রায় (হাওড়া)

পরিবেশনা : অয়ন ঘোষ, প্রদীপন গাঙ্গুলী, বনানী ঘোষ, সুজয় পাল, স্বপন সামন্ত এবং স্বরূপ প্রামানিক

প্রচ্ছদ : গৌতম আচার্য; বর্ণসংস্থাপন : রাজু রায়

ই-মেল : ssunnayan@gmail.com ।। ওয়েবসাইট www.ssu2011.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট-জীববিজ্ঞানী জানি গুডাল; দার্শনিক ইয়ুরগেন হেবারমাস; চিকিৎসক মণি ছেত্রী; ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ রজত কান্ত রায়; সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত; সঙ্গীত শিল্পী জুবিন গর্গ, ফারিদা পারভিন, অভিরূপ গুহঠাকুরতা, অর্ঘ্য সেন, সুমন কল্যাণপুর, এস জানকি; সাহিত্যিক লোবো আন্তুনেস, এস. এস. ভাইরাপ্পা, বিনোদ শুক্লা; কবি কে. এন. দারুওয়ালা; গণসঙ্গীতশিল্পী জলি বাগচী; সাংবাদিক মার্ক টালি, নিরঞ্জন হালদার, স্বপ্না দেব; সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী নীলাঞ্জন দত্ত; অভিনেতা-অভিনেত্রী ব্রিজিত বার্দো, সতীশ শাহ, ধর্মেন্দ্র, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়; ভাস্কর রাম সুতার; ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ভেস পেজ; ক্রিকেটার ববি সিম্পসন, বানার্ড জুলিয়েন; ফুটবলার মোহন সিং, কেভিন কিগান; মানবাধিকার সংগঠক জগদীপ ছোকর, শৈলেন মিশ্র; বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ পীযুষ পাণ্ডে; ঐতিহাসিক কে এন পানিক্কর; সমাজকর্মী সুধাংশু শীল; চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত, মারজান সাত্রাপি; চিত্রশিল্পী ডেভিড হকনি; শুটার যশপাল রানা; জনস্বাস্থ্য সংগঠক ও মানবাধিকার কর্মী অমিতদ্যুতি কুমার।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

- চলমান বিশ্বযুদ্ধ

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৫

- রাজনারায়ণ বসু: এক অনন্য স্বদেশানুরাগী—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
- ইলা মিত্র: এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা—সুমনা গুপ্ত
- আগুনপাখি মহাশ্বেতা দেবী: সামান্য স্মৃতি—অরণি সেন
- মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার— সুরজিৎ মিশ্র, জয়দেব পাঠক ও অরণি সেনs
- বাদল সরকার—কুনাল বাগচী

স্মরণিকা ১৩

- শংকর • আন্দ্রে বেতেই • মাধব গ্যাডগিল • আশা ভোঁসলে
- জুবিন গর্গ • রঘু রাই

ব্যক্তিত্ব ১৫

- বদরুদ্দীন উমর—এক উজ্জ্বল দিশা: প্রণব দে

জনস্বাস্থ্য ১৭

- ওষুধের দাম বাড়ছে-দাম কমছে মানুষের—আশিসকুসুম ঘোষ
- অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)—অরুণালোক ভট্টাচার্য্য
- আধুনিকতার অসুখ ক্যান্সার—আমেরিকান আধিপত্য এবং সর্বগ্রাসী যুদ্ধেরও—জয়ন্ত ভট্টাচার্য
- সমাজে নারী : চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ—দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত
- আন্দোলন বৃথা যায় না—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৪০

- প্রকৃতির নীরব দূত: ডায়ান ফসি, জানে গুডাল এবং বিরুটে গালডিকুস—অজন্তা প্রবাহিতা
- কাঁদছে পাহাড়, ফুঁসে উঠছে নদী: উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি এখন বিপর্যস্ত—রাজা রাউত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৪৪

- পিকরিক অ্যাসিড নিয়ে যত কাণ্ড—অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
- ড্রোন বিজ্ঞান: একটি চ্যালেঞ্জ—তপন দাস

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৫১

- পশ্চিমবঙ্গের বিগত পাঁচ দশকের শিক্ষা ব্যবস্থা: একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান—তপন সামন্ত
- রাজ্যে বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার হাল ফেরাবে কে?—সনাতন মুর্মু

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৬২

- মণিপুরে এত গণ্ডগোল কেন?—বাসব রায়
- বিরোধী শূন্য ভোটার তালিকা তৈরি করাটাই SIR এর প্রাথমিক লক্ষ্য—সুমন সেনগুপ্ত
- অগভীর গঙ্গার দ্বীপে মিনি বন্দর বলাগড়ে—বিবর্তন ভট্টাচার্য
- নাস্তিকতার আন্দোলন—ভবানীপ্রসাদ সাহু

- **অর্থনীতি** ৬৪

- অর্থনীতির হালহকিকৎ—বুনো রামনাথ
- পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও অর্থ ব্যবস্থা—উজান বিশ্বাস

আন্তর্জাতিক ৮০

- ধারাবাহিক হিংসার গ্রাসে সোনার বাংলা—বাপ্পাদিত্য রায়
- মার্কিন-ইরান ভঙ্গুর চুক্তি—গ্যাব্রিয়েল লোপেজ

খেলার জগৎ ৯৩

- খেলার যে খবর খবরের কাগজে থাকে না—নিলয় সামন্ত
- বিশ্বকাপ ফুটবলের কাণ্ডকারখানা—ফালকাও

শিল্প ও সংস্কৃতি ১০৩

- ফিওদর দস্তভয়েস্কি ও তাঁর ব্রাদার্স কারামাজভ—নাসির আহমেদ

ভ্রমণ ১০৬

- উজবেকিস্তান দর্শন—মৌসুমী রায় ভট্টাচার্য
- হাতছানি দেয় ‘সাতশো পাহাড়’—দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

কবিতা ১১২

- কাগজের নৌকো—মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া • অস্তিত্ব—সুপ্তশ্রী সোম
- সে ভাষার বিরোধী—আর্যতীর্থ • লড়াই—সিদ্ধার্থ সেন

ছোটগল্প ১১৪

- শম্বুক (হিন্দি মূল রচনা: যশপাল) —বাংলা রূপান্তর: দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

চিঠিপত্র ও রিপোর্ট ১১৬

- ছায়ানটের প্রতিক্রিয়া
- ব্যারেজ নয় নদীর জীবন ফেরত চাই আদি গঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন

খবরাখবর ১১৮

যৎকিঞ্চিৎ ১২০

তিকিতাকা থেকে হাই লাইন ডিফেন্স—সুধীর কর্মকার

সম্পাদকীয়

চলমান বিশ্বযুদ্ধ

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরান আক্রমণ করায় মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ নতুন মাত্রা পায়। মার্কিন ও ইজরায়েলি বিমান বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও বোমার আঘাতে তেহেরান, ইস্পাহান, সিরাজ প্রভৃতি প্রধান নগরী ও শিল্পকেন্দ্র, সামরিক কেন্দ্র এবং পরমাণু কেন্দ্রগুলির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও ধর্মগুরু আয়াতোল্লা আলি খামেইনি সহ প্রথম সারির সেনাপতি ও নেতাদের হত্যা করে। মিনাবের একটি মেয়েদের স্কুলে ১২০টি শিশুর মৃত্যু হয়। এর প্রত্যুত্তরে রুশ, চিনা ও উত্তর কোরিয় সামরিক প্রযুক্তিতে বলীয়ান মার্কিন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ইরান তার উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ভাণ্ডার নিয়ে ৩২টি সেক্টরে বিভাজিত কমাণ্ড ব্যবস্থায় পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ১৬টি মার্কিন ঘাঁটি, ইজরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিনসঙ্গী সৌদি আরব, আরব আমীরশাহী, কাতার, বাহরিন প্রভৃতির তেল শোধনাগার, বন্দর, শিল্প ও পর্যটন নগরীগুলি তছনছ করে দেয়। ছায়াসঙ্গী লেবাননের হেজবোল্লা, ইয়েমেনের হুথি এবং ইরাক-সিরিয়ার শিয়া মিলিশিয়াগুলিও যুদ্ধে নেমে পড়ে। দুইপক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু, পরিবেশ দূষণ, অর্থনৈতিক সঙ্কট ইত্যাদির পরও এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলতে থাকে। যা ছড়িয়ে পড়ে ইরাক, কুয়েত, জর্ডান, লেবানন, গাজা প্রভৃতি এলাকায়। এরপর ইরান পারস্য উপসাগরের মুখ হরমুজ প্রণালী অবরোধ করে।

হরমুজ প্রণালী থেকে বিশ্বের ২৫% তেল ও ২০% প্রাকৃতিক গ্যাস জাহাজে করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। বিশেষ করে জাপান, চিন, দঃ কোরিয়া, ভারত, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ এই জ্বালানির উপরে নির্ভরশীল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউরোপীয় দেশগুলিও। এর ফলে সারা বিশ্বজুড়ে জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং নতুন করে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার বৃহত্তর তেল ভাণ্ডার কব্জা করলেও সেই কর্দমাক্ত 'সাওয়ার ক্রুড' মার্কিনের চাহিদা মেটাতে পারে না। ফলে শুল্কের পর শক্তি সঙ্কট সৃষ্টি করার জন্য অন্যরা আকারে ইঙ্গিতে ট্রাম প্রশাসনকেই দায়ী করেন। ন্যাটোভুক্ত স্পেন সরাসরি ট্রাম্পের বিরোধিতা করে এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি প্রমুখ ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধ ও হরমুজ মুক্ত করার ডাকে সাড়া দেয় না। একের পর এক ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এপস্টেইন ফাইলে ট্রাম্পের কুকর্ম, যুদ্ধের বিপুল খরচ ও ক্ষয়ক্ষতি, মার্কিন সেনার মৃত্যু, মার্কিন ঘাঁটি ও যুদ্ধবিমান ধ্বংস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেশের মধ্যেও ট্রাম্প বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

১৯৭৯তে ইসলামিক বিপ্লবের পর হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ইরান এতদিন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের ক্ষেত্রে ছিল একমাত্র বাধা এবং সেই কারণে লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু ইরান এক বিশাল ও সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিকেন্দ্রিভূত দেশ। তার শিয়া সামরিক মোল্লাতন্ত্রের দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস আছে। ১৯৮০-'৮৮ ইরাক যুদ্ধ এবং ১৯৭৯-র পর থেকে ২০২৫ অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের ধারাবাহিক ছায়া যুদ্ধ এবং আর্থিক নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে লড়াই। আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে সুন্নি সৌদি আরবের সঙ্গে লড়াই। ইরানের শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকলেও তার মূল চালিকাশক্তি ধর্মীয় মিলিশিয়া বাহিনী 'ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ডস কর্পস (আই আর জি সি)'। পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি দিয়ে ঘেরা ইরানে গ্রাউণ্ড অপারেশন বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া সে দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন অভিযানের জন্য প্রস্তুত এবং তার ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার সাঙ্ঘাতিক ও অফুরন্ত। তাই ইরানকে জোরালো ধাক্কা দিতে পারলেও পরাজিত করা যায় নি। ট্রাম্পকে পিছু হটতে হল এবং যুদ্ধের ৪০ দিনের মাথায় ৮ এপ্রিল যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হল। এমনকি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের ভয়ে মার্কিন রণতরীগুলিকে ওমান উপসাগরের দক্ষিণে পেছিয়ে নিতে হল। তারপর পাকিস্তানের মাধ্যমে মরীয়া চেষ্টা হল এক মার্কিন বান্ধব চুক্তি করে ইরান যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার। মনোবল পাওয়া ইরান এই অসম চুক্তি মানল না। ইরানের হাতে থাকা আগামী দিনে পরমাণু বোমা তৈরি করার মত শোধিত ইউরেনিয়ামের হস্তান্তর চুক্তির প্রধান বাধা। ইরান কিছুতেই সেগুলি হাতছাড়া করতে চায় না। ইরানের দাবি অনাক্রমণ প্রতিশ্রুতি, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ক্ষতিপূরণ। ফলে এই যুদ্ধ বিরতি খুব দুর্বল অবস্থায় ছিল এবং যে কোন সময় আবার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ২৭ মে থেকে পুনরায় যুদ্ধ শুরুও হল। আবার মাঝখানে কিছুদিন থেমে, সুইজারল্যাণ্ডে দুদেশের আলোচনার পর পুনরায় শুরু হয়েছে।

এই ভয়ানক যুদ্ধের মধ্যে ইজরায়েল গাজাকে আরও দুরমুশ করছে এবং লেবাননের দক্ষিণে লিটানি নদী অবধি বাফার জোন বাড়িয়ে নিয়েছে। ইজরায়েলের ভয়ঙ্কর বোমা বর্ষণ এবং হেজবোল্লাহর মরিয়া প্রতিরোধের মধ্যে দক্ষিণ লেবানন বিপর্যস্ত। ইরান বান্ধব হুথি আবার এশিয়া থেকে ইওরোপ যাওয়ার নৌপথ সুয়েজ খাল যাওয়ার পথে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মধ্যবর্তী বাব-এল মানদেব প্রণালীতে একের পর এক বাণিজ্যিক জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ায় এই পথও আর নিরাপদ নয়। ফলে জাহাজগুলিকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে চলাচল করতে হচ্ছে। ফলে যাতায়াতের খরচ ও সময় অনেকগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

সজ্ঘর্ষ বিরতি নিয়ে কথাবার্তা চললেও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের বিরাম নেই। ইউক্রেনের পূর্বাংশ দখল নেওয়া রাশিয়া কিভ সহ ইউক্রেন জুড়ে দিনের বেলাতেই ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা

চালায়। ইউক্রেনও রুশ ভূখণ্ডে ও দখলীকৃত ক্রাইমিয়াতে ড্রোন হামলা চালায়। এরপর রাশিয়া তার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ বাড়িয়ে তোলে। একটি ড্রোন সীমান্ত পেরিয়ে ন্যাটোভুক্ত দেশ রোমানিয়ার গালতি শহরে আছড়ে পড়ে। ট্রাম্পের গ্রিনল্যাণ্ড দখলের হুমকি এবং রাশিয়ার ইউক্রেন দখলে সন্ত্রস্ত ইউরোপে একদিকে আশঙ্কা বেড়ে চলে, অন্যদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। হাঙ্গেরিতে নির্বাচনে কট্টর রক্ষণশীল ভিক্টর অরবানের দীর্ঘ শাসনের অবসান হয়ে রক্ষণশীল পিটার ম্যাগিয়ারের যাত্রা শুরু হয়। জার্মানিতে ইতিমধ্যে ফ্রেডেরিখ মার্জের নেতৃত্বে মধ্য-দক্ষিণদের সঙ্গে সমাজগণতন্ত্রীরা ক্ষমতায়, ফ্রান্সে বাম ও দক্ষিণদের মধ্যে মধ্যপন্থীরা কোনরকমে চালিয়ে যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতাসীন লেবর দল গভীর সঙ্কটে। ট্রাম্প ইরান যুদ্ধের পর কিউবা দখলের হুমকি দিয়ে চলেছেন। পূর্ব, পশ্চিম ও সাব-সাহারান আফ্রিকা জুড়ে বিরামহীন গৃহযুদ্ধ। পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধ এবং থাইল্যাণ্ড-কম্পোডিয়া যুদ্ধ নিয়ে আঞ্চলিক উত্তেজনা রয়েছে। উত্তেজনা সমগ্র দক্ষিণ চিন সাগরে আধিপত্যবাদী চিন বনাম তাইওয়ান, জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনসের সঙ্গে। উত্তর কোরিয়া তার মারণঘাতী ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমারে গৃহযুদ্ধ, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভারত-চিন এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তেও উত্তেজনা। ফলে সারা পৃথিবী জুড়েই অস্থিরতা, যুদ্ধ বা যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে যা এই গ্রহ এবং তার প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাসিন্দাদের পক্ষে প্রলয়ঙ্করী।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন

এপ্রিল '২৬এ অসম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও কেরালাম রাজ্য এবং পুদুচুরি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে ছমাস ধরে চলল এস.আই.আর এর নামে প্রবল বিভ্রান্তি, হয়রানি এবং তৃণমূল-বিজেপি টানাপোড়েন। বহু নাম বাদ গেল। তারপর একদিকে নরেন্দ্র মোদি অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুই দলের প্রবল প্রচার। অতিসক্রিয় নির্বাচন কমিশন কেন্দ্র বাহিনীর সাহায্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংঘটিত করলেন। রেকর্ড ৯৩% মানুষ ভোট দিলেন। ২৯৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২০৮, তৃণমূল ৮০, কংগ্রেস ২, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ২, সিপিআইএম ১ এবং আইএসএফ ১ আসন পেল। দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকার গঠিত হল। ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী ও এনডিএর নেতৃত্বের উপস্থিতিতে শপথ অনুষ্ঠান হল। বিরোধী নেতা এবং পরপর দুবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে পরাজিত করে শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তৃণমূল এই ফলাফল মানতে চাইল না।

অসমে ১২৬টি আসনের মধ্যে ৮২টিতে জয়লাভ করে তৃতীয়বার বিজেপি ক্ষমতায় এল। কংগ্রেস ১৯, বিওপিএল ১০, অগপ ১০, এআইইউডিএফ ২টি আসন পেল। তামিলনাড়ুতে এতদিনকার দুটি দ্রাবিড়িয় দলের শাসন ভেঙ্গে কংগ্রেস ও ছোট ছোট দলগুলিকে নিয়ে চলচ্চিত্রের নায়ক চন্দ্রশেখর জোসেফ বিজয় 'থলপতি' সরকার গড়লেন। ২৩৪টির মধ্যে তার টিভিকে পেল ১০৮টি আসন। ডিএমকে ৫৯, এআইডিএমকে ৪৭, কংগ্রেস ৫, পিএমকে ৪টি আসন। সেখানে নির্বাচনের পর কংগ্রেস ডিএমকের সঙ্গে জোট ভেঙ্গে টিভিকেকে সমর্থন করে মন্ত্রীসভায় চলে গেল। কেরালামের ১৪০টি আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউডিএফ ক্ষমতায় এল। কংগ্রেস পেল ৬৩ আসন। কেরালাম কংগ্রেসের তীব্র গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে অনেকদিন পর ভি.ডি. সতীশনকে হাইকমাণ্ড মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করল। পুদুচেরিতে ৩০টি আসনের মধ্যে এআইএনআরসি পেল ১২, সহযোগী বিজেপি ৪ এবং এআইডিএমকে ১টি আসন পেয়ে এনডিএ জোট সরকার গড়ল। কর্নাটকে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী পাল্টিয়ে সিদ্দারামাইয়ার জায়গায় শিবকুমারকে আনল। পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের পর কুশলী চালে বিজেপি শুধু তৃণমূলের সংসদ ও বিধায়কদের দলই নয় পুরো সংগঠনটিই ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হল। একটি অংশ মমতা-অভিষেকের সঙ্গে, আরেকটি অংশ ঋতব্রত-র সঙ্গে, তৃতীয়টি এনসিপিআই নাম নিয়ে বিজেপিতে ঢোকার অপেক্ষায়।

আর্থিক বৈষম্য ও সঙ্কট

ভারত জুড়ে আর্থিক বৈষম্য, কৃষিতে সঙ্কট এবং কর্মসংস্থানের অভাব এক বড় সমস্যা। বিশ্বের জনবহুলতম দেশে বেশিরভাগ মানুষকে খুব কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তারমধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তাদের আরও সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। এর উপর দীর্ঘ উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তেল ও গ্যাসের জন্য উপসাগর নির্ভর ভারতকে আরও সমস্যায় ফেলে দেয়। তেলের ক্ষেত্রে রাশিয়ার জোগান সামাল দিলেও গ্যাসের অভাব পূরণ হয় না। ফলে যানবাহন সঙ্কট; সার, গ্যাস ও তেলের দাম বৃদ্ধি; সংশ্লিষ্ট সবকিছুর দামবৃদ্ধি মানুষের যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তোলে।

রাজনৈতিক শূন্যতা ও আরশোলার আগমন

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে টানা তিনবার কেন্দ্রের শাসন, ২২টি রাজ্য জয় এবং দক্ষিণ ভারত বাদ দিয়ে সারাভারত দখল, অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ধারাবাহিক ব্যর্থতা ও দুর্বল হয়ে পড়া বিরোধীশূন্য দেশে এক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি করে। সেই কারণে বেকার যুবকদের প্রতি শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বিদ্রুপজাত সমাজ মাধ্যমে জাত ককরোচ জনতা পার্টি'র মত নবপ্রজন্মের সমাবেশগুলির জন্ম দেয়, এই সিজেপি-র নেতৃত্বে রাজধানীর বুকে জেন জি-র জাগরণ এবং আন্দোলনে চমকপ্রদ সাফল্য। এবার ই২০ জ্বালানি তেল প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে নাগরিকরা, ফসলের সহায়ক মূল্য নিয়ে কৃষকরা সক্রিয়।

২৫.০৭২০২৬

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজনারায়ণ বসু: এক অনন্য স্বদেশানুরাগী

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের নবজাগরণের সূচনা করে রামমোহন চলে গেলেন। ঐ শতকের বিশের দশকে জন্মগ্রহণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-'৯৯) প্রমুখ। রাজনারায়ণ বসু শুধু সমাজ সংস্কারক, শুধু সাহিত্যিক নন, তাঁকে বলা হত 'বাংলার জাতীয়তাবাদের পিতামহ'। তাঁর মধ্যে ঘটেছিল ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয়। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, অন্যদিকে ঐতিহ্য। বাঙালি সমাজ তখন দ্বিধাবিভক্ত। সেই সময়ের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, রাজনারায়ণ বসু। যেসব মনীষী শিক্ষাজগতকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রবর্তনের পথ সুগম করেছিলেন, নবীন সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বজনগণ্য রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার এবং রামতনু লাহিড়ী।

এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ঢেউ প্রবলভাবে বাংলার ওপর এসে পড়েছিল, তাই নতুন সমাজ গঠনে এই তিনজন আচার্যশ্রেষ্ঠের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই তিনজনই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষার জাঁকজমক হিন্দু কলেজের একদল ছাত্রকে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল। হিন্দু কলেজের সেই ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদন দত্তও ছিলেন। তাঁদের কাছে প্রতীচ্যের সবকিছু ছিল অনুকরণযোগ্য। এমন এক আত্মবিস্মৃতির যুগে তিনজন আচার্যপ্রবর পাশ্চাত্য কুশিক্ষা ও কদাচারের বিরুদ্ধে থেকে শুধুমাত্র তার নির্মল অংশটুকু দেশীয় শিক্ষার সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষার এই বিবর্তন ঘটাতে শুরু করলেন। ইংরেজি ১৮২৬ অব্দের ৭ সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর জন্ম হয়। এই বসু পরিবারের আদি নিবাস ছিল গড় গোবিন্দপুর গ্রামে। ফোর্ট উইলিয়াম যখন নির্মিত হয় তখন রাজনারায়ণের প্রপিতামহ শুকদেব বসু গ্রাম পরিত্যাগ করেন। তারপর থেকে ঠিকানা হয় বোড়াল গ্রামে। রাজনারায়ণের পিতা ছিল নন্দকিশোর বসু। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের কাছে ইংরেজি পড়েছিলেন এবং তাঁর সেক্রেটারি হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডে বলেছিলেন, 'That Nandakishore who used to write English so well.'' নন্দকিশোর পরবর্তী জীবনে স্পেশাল কমিশন অফিসে হেড ক্লার্ক নিযুক্ত হন। এই কমিশনের কাজ ছিল দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। অনেক দেবোত্তর সম্পত্তির অছি পরিষদের সদস্যরা তাঁদের জমিকে মুক্ত করার জন্য নন্দকিশোর বসুর কাছে আসতেন। তিনি উৎকোচ প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর সৎ প্রবৃত্তির জন্য, অমায়িক স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এমন সৎ চরিত্রবান পিতার সন্তান রাজনারায়ণ বসু।

শিক্ষারম্ভ: বর্ধমান জেলার এক গুরুমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিজ গৃহেই রাজনারায়ণের শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু সাত বছর বয়সে কলকাতায় এসে প্রথমে শম্ভু মাস্টারের কাছে তারপর ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত হেয়ার সাহেবের স্কুলে অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে স্কুলটির নাম ছিল 'School Society's School'। রাজনারায়ণ যখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তখন সহপাঠীদের সঙ্গে হাতযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র ক্লাব ম্যাগাজিন প্রতি সোমবার প্রকাশ করতেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ভূয়সী প্রশংসাই করেননি, ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী হবার কথা বলেছিলেন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ থেকে কৃতী ছাত্র হিসেবে উত্তীর্ণ হন। সেই সময়ে ভালো ছেলেদের লিখিত প্রশ্নের উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার রীতি ছিল। রাজনারায়ণ বসুর লিখিত উত্তরও প্রকাশিত হয়েছিল। 'বেঙ্গল হেরল্ড' সংবাদপত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তা থেকে ভবিষ্যতের রাজনারায়ণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়, ''The student (Rajnarayan Basu) presides a much extraordinary memory and faculty of expression of English writer with a rapidity which is rare even among Englishmen.''

এরপর খুব দ্রুত রাজনারায়ণের জীবনে পরিবর্তন আসে। ১৯৪৫ সালে কলেজের পাঠ শেষ করার সময়ে প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয়। এই বছরেই পিতার মৃত্যু হয়। ডেভিড হিউমের গ্রন্থ পাঠ করে সংশয়বাদী হয়েছিলেন। পত্নী ও পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে ধর্মভাব জেগে ওঠে এবং ১৮৪৬ সালে প্রথম দিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ বিষয়ে লিখছেন, ''হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্ম্মমতে পরস্পর কতগুলি পরিবর্তন হয়, কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি।'' মহর্ষির ভাবনার অনুযায়ী হয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মেরই 'উন্নত ও শুদ্ধতর' রূপ বলে মনে করতেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'প্রকৃত হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মধর্ম' সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

কর্মজীবন: পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অভাবহেতু চাকরি সন্ধান করতে হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সভায় উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের পদে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়োগ করেন। রাজনারায়ণ বসু কঠ, কেন, ঈশ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অনুবাদ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা মুদ্রিত 'বিবলিওথিকা ইন্ডিকা' নামক সংগ্রহে তাঁর অনুবাদকে প্রামাণিক অনুবাদ হিসেবে ডাঃ রো উল্লেখ করেছেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় ইংরেজি শিক্ষকের পদ খালি হয়। রাজনারায়ণ ৭০ টাকা বেতনে সেই স্থলে নিযুক্ত হন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজ ছিল চাঁদের হাট। সাহিত্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অলঙ্কারে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ন্যায়ে নরনারায়ণ তর্করত্ন, স্মৃতির ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রমুখ। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোম প্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রাজনারায়ণ বসুর কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে দু'বছর কাজ করার পর ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর অতিবাহিত করেন। যখন তিনি এই স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তখন সেখানে আশি জন ছাত্র এবং ছ'জন শিক্ষক। যে বছর তিনি এলেন, সেবছর দুটি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। যখন তিনি অবসর নিলেন তখন এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা তিনশ। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে তখন স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী ছিল আধুনিক। আত্মজীবনচরিতে লিখেছেন, 'অনেক শিক্ষাপ্রদ আমোদজনক গল্প কহিতাম, তাহাতে বালক-বালিকাদের মন আমার প্রতি আকৃষ্ট হইত। পুস্তকের কোন স্থানের অর্থ একেবারে বলিয়া দিতাম না। প্রশ্নশ্রেণীর দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাহাদের মুখ হইতে বাহির করিতাম।''

রাজনারায়ণ বসু নিজেকে বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সমাজের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়, শ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, সুরাপান নিবারণী সভা তৈরি করেন। জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভার প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়কালে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—১) Defence of Brahmoism, ২) ব্রহ্মসাধন, ৩) ধর্মতত্ত্বদীপিকা। ধর্মতত্ত্বদীপিকা বাংলা ভাষায় 'ধর্মবিজ্ঞান' সম্পর্কীয় প্রথম গ্রন্থ।

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ। কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্রেরা হলেন ঋষি শ্রী অরবিন্দ, দেশপ্রেমিক বারীন্দ্র ঘোষ। রাজনারায়ণ বসুর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ বসুর পুত্র বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে রাজনারায়ণ অগ্রণী ছিলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আন্দোলন যখন ছড়িয়ে পড়েছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ উচিত কিনা' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করছেন, রাজনারায়ণ জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র দুর্গাচরণ বসু এবং ভ্রাতা মদনমোহন বসুর সঙ্গে দুই বিধবা বালিকার বিবাহ দেন। এই কাজের জন্য তিনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। এমনকি মায়ের মৃত্যুর সময়েও রাজনারায়ণ থাকতে পারেননি।

রাজনারায়ণ বসুর স্বাস্থ্য মন্দ হতে আরম্ভ হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ভাগলপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে জলহাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। ভাগলপুর থেকে এলাহাবাদ গিয়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর লক্ষ্ণৌ। সেখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে কানপুরে গিয়ে সাক্ষাৎ পান ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। সেখান থেকে দুজনে মিলে কান্যকুব্জ দেখতে যান। কিন্তু শরীরের কিছু উন্নতি হলো না। ১৮৬৬ খ্রি. ৩১ ডিসেম্বরে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

কলকাতায় ফিরে রমানাথ কবিরাজের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হলে নতুন করে কাজের কথা ভাবলেন। তাঁর প্রথম কাজ হল 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর একটি বক্তৃতা প্রদান। ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে হিন্দু ট্রেনিং স্কুল ভবনে এই বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো বিদগ্ধ মানুষেরা। জনসমাজে তাঁর বক্তৃতার এতটাই প্রভাব পড়েছিল যে সেই সময়েই শিবচন্দ্র গুহ রাজনারায়ণের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করার কথা বলেছিলেন। 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক জেমস রুটলেজ বক্তৃতাটি 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সোমপ্রকাশে বক্তৃতার বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশ ও প্রশংসা করা হয়।

এরপরের বক্তৃতার নাম ছিল 'সেকাল ও একাল'। ১৮৭৩ খ্রি. ২৩ মার্চ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ভুজগেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এই বক্তৃতাটি রাজনারায়ণ প্রদান করেছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। স্কুলস্তর থেকে শুরু করে সর্বস্তরে বক্তৃতাটি জনপ্রিয় হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল বক্তৃতাটি।

হিন্দু স্কুলের থিয়েটারে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' শিরোনামে ১৮৭৭ খ্রি. ১১ আগস্ট রাজনারায়ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানেও সভাপতি হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'তুমি কি একটা বল বা লিখ দুমাস তাহার জের থাকে।'

প্রাক্তন ছাত্রসভার সূচনা করেন রাজনারায়ণ বসু। ১৮৭৫ সালের ১ জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মরকতকুঞ্জে প্রথম সম্মেলনটি হয়। এই সম্মেলনে পাঠ করেন 'হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত'। সেই সময়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল নিজের বাড়িতে কলকাতায় সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাজনারায়ণবাবুও উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। মেদিনীপুরে থাকাকালীন তাঁর কাজ জেলার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কলকাতায় বাসের সময় তাঁর কাজের কথা দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে।

এরপর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে দেওঘরে যান এবং সেখানেই বাড়ি তৈরি করে বাস

করতে শুরু করেন। এখানে তাঁর প্রথম লেখা ‘An Old Hindu’s Hopes’ নামে একটি ইংরেজি পুস্তক। কুমার নীলকৃষ্ণ দেবের অর্থানুকূল্যে বইটি প্রকাশিত হয়। ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকার বইটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর বাসগৃহে অনেক মনীষী পদার্পণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে নানা মানুষ উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আসতেন। সুপ্রসিদ্ধ নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে আসতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাবার আগে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রথমদিকে রাজনারায়ণ বসুর বাড়িতে থাকতেন। পরে নিজে একটি বাড়ি তৈরি করে নেন।

রাজনারায়ণ বসু জ্ঞানী, ব্যক্তিই শুধু ছিলেন না, তিনি সমাজ-সচেতন মানুষ। তাঁর উদ্যোগে এবং ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অর্থানুকূল্যে দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় কুড়ি বছর তিনি দেওঘরে ছিলেন। সত্তর বছর বয়সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। আড়াই বছর শয্যাগত থাকেন। অবশেষে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বৈদ্যনাথধামে দেহত্যাগ করেন।

শেষ কথা: ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন জ্ঞানী, বাগ্মী, সুলেখক। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান পুরোহিত, স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত প্রবর্তক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। শিক্ষানুরাগী রাজনারায়ণ শিক্ষকতার পথ বেছে নিয়েছিলেন অন্য উচ্চতর পদ ছেড়ে। ‘গ্র্যান্ডফাদার অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম’ তাঁর জীবনের বিভিন্ন বাঁককে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন। অনেক সভা-সমিতির তিনি ছিলেন মুখ্য চরিত্র। ‘হা ম চু পা মু হা ফ্’ এমন বিচিত্র নামে সভার অধিবেশন বসত ঠনঠনিয়া অঞ্চলের এক পুরনো বাড়িতে। এই সভার সভাপতি হয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এমন এক বৈচিত্র্যময় চরিত্রের দ্বিশতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ইলা মিত্র: এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা

সুমনা গুপ্ত

“ইলা মিত্র কৃষকের প্রাণ
ইলা মিত্র ফুচিকের বোন
ইলা মিত্র স্টালিনন্দিনী
ইলা মিত্র তোমার আমার
সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক
ইলা মিত্র দলাদলি আর
ক্ষুদ্রতার রূঢ় ভর্ৎসনা,
ইলা মিত্র নারীর মহিমা!
ইলা মিত্র বাঙালির মেয়ে!”—কবি গোলাম কুদ্দুস

ইলা মিত্রকে পরবর্তী সময়ে ওপার বাংলার প্রান্তিক মানুষ চিনবে রানি মা বলে।

রানি ইলা মিত্র। তাঁর জন্ম ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর, কলকাতায়। তাদের আদিনিবাস ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের যশোর জেলার ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে। তার বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীন বাংলার অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল। বাবার চাকরির সুবাদে তাঁরা কলকাতায় থাকতেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেন। কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজের পড়াশোনা শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

কৈশোরে তিনি খেলাধুলায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন। সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায়ও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে হিসেবে ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে বিশ্বযুদ্ধের জন্য অলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ায় তার অংশগ্রহণ করা হয়নি। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৮ এই ১৪ বছর ছিল তাঁর জীবনের মোর ঘোরানো পর্ব। যা তাঁকে জীবন্ত কিংবদন্তি তে পরিণত করে।

রাজনীতির আঙিনায় ইলা মিত্রের প্রবেশ তাঁর ছাত্রী জীবনে নারী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। সময়টা ১৯৪৩ সাল। ইলা সেন কলকাতা মহিলা সমিতির সদস্য হলেন। এই সমিতির কাজ করতে করতেই তাঁর পরিচয় ঘটলো কমিউনিস্ট মতাদর্শের সঙ্গে। তিনি যুক্ত হন কমিউনিস্টদের পরিচালিত গার্লস স্টোর্স কমিটির সঙ্গে। নিজের উদ্যোগেই শুরু করেন মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশোনা করা। ইলা মিত্র পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন “ওরা সমাজকে পাল্টাতে চায় এবং একই সঙ্গে করতে চায় মানুষের সেবাও। এই দুটো একসঙ্গে আমাকে দারুন আকর্ষণ করে।” ৪৩ এর মন্বন্তরে তিনি খাদ্য আন্দোলন, ভুখা মিছিল, লঙ্গরখানা পরিচালনা ইত্যাদি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ওই ৪৩ সালেই কমলা মুখোপাধ্যায় এবং মনিকুন্তলা সেনের সুপারিশে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪৫ সালে তাঁর বিয়ে হয় পার্টির সংগঠক রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে।

ইলা মিত্রর আলোচনা প্রসঙ্গে তার সহ যোদ্ধা এবং জীবন সঙ্গী

রমেন্দ্রনাথ মিত্রের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জমিদার পরিবারের সন্তান রমেন্দ্রনাথ মিত্র উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী ডিভিশনের মালদা জেলার নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর গ্রাম থেকে। তাঁর বাবার মৃত্যু হয় তাঁর বয়স যখন মাত্র তিন। সংসার চালাতেন তাঁর মা বিশ্বময়ী দেবী। তিনি ছিলেন তেজস্বী মহিলা। দেশভাগের পর হিন্দুরা যখন দলে দলে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে তিনি রামচন্দ্রপুরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। রমেন্দ্রনাথ মিত্রের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির নির্দেশে তাঁকে চলে যেতে হয় মালদা জেলার কৃষক ফ্রন্ট এ কাজ করার জন্য। বিয়ের পর ইলা মিত্র। সেই প্রথম স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা রামচন্দ্রপুরে পা রাখেন। কলকাতার আলোকিত জীবন ছেড়ে রামচন্দ্রপুরে এক রক্ষণশীল পরিবারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন।

এই পরিবেশেও ইলা মিত্র থেমে থাকেননি। সংসার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে স্বামীর সহযোগীদের সঙ্গে। পরবর্তী কালে পরিবারের ঘনিষ্ঠ নিয়াজ বিশ্বাসের কাছ থেকে জানা যায় রামচন্দ্রপুরে ইলা মিত্রর জনপ্রিয়তার কথা। তিনি দারুণ মিশুকে ছিলেন। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতেন। হিন্দু মুসলিম কোন ভেদাভেদ ছিল না। সবাই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করত যা তাঁর পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়েছিল। গ্রামে একটি মেয়েদের স্কুল খোলা হল। প্রথমে দেখা গেল ছাত্রী সংখ্যা মাত্র তিনজন। ইলা মিত্র প্রধান শিক্ষিকা। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যে ওই স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশে।

১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালীর দাঙ্গার পর অনেকেই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে ওই জেলায় যান। শ্বশুর বাড়ির বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ইলা মিত্র এই কাজের সামিল হন। ৪৬ সালে সারা বাংলা জুড়ে তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ ওঠে।

স্বাধীনতার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার কমিউনিস্টদের প্রতি কঠোর মনোভাব দেখাতে থাকে। প্রকাশ্যে পার্টির কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই রামচন্দ্রপুর থেকে বহু পার্টিকর্মী পার্শ্ববর্তী রাজশাহী জেলার নাচোলে চলে যেতে থাকেন। বাড়িতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা না করে রমেন্দ্রনাথ ও ইলাও নাচোল যাত্রা করেন।

রমেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় তিনি, মাতলা মাঝি, ফণি ভূষণ রায়, হরেক মন্ডল, শেখ আজহার হোসেন ইত্যাদিরা ৪৬ সাল থেকেই নাচোলে সাংগঠনিক কাজ করে চলেছিলেন। মাতলা মাঝির সাঁওতালি ভাষার বক্তৃতা আদিবাসীদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করত। বস্তুত তাঁর কারণেই আদিবাসীদের কাছে কমিউনিস্টরা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এইসব সংগঠকদের সঙ্গে পরে যুক্ত হন বৃন্দাবন সাহা, ইলা মিত্র প্রমুখ।

ইলা মিত্র তাঁর স্বভাবজাত দক্ষতায় একেবারে শুরু থেকেই আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সাঁওতালরা ইলা মিত্রকে সম্বোধন করত রানিমা বলে। ইলা মিত্রর সঙ্গে নারী সংগঠন গড়তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন মাতলা মাঝির স্ত্রীও।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সমগ্র বাংলায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে কৃষকদের ওপর শোষণের মাত্রা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এ সময়কার অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে মরিয়া হয়ে ওঠে শোষিত কৃষকরা। তিন ভাগের দুই ভাগ ফসল কৃষকের এই দাবি নিয়ে জোরদার হয় তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬ সালে দিনাজপুরে সূচিত হয় যে তেভাগা আন্দোলন তা আগুনের মত সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কৃষক শহীদ হন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ এ দিনাজপুরের খাঁপুর গ্রামে কৌশল্যা কামারিণী, চিয়ার শাই শেখ, হোপান মার্ডি সহ ২২ জন কৃষক একই দিনে পুলিশের গুলিতে মারা যান। তেভাগা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা ছিলেন কংশারি হালদার, চারু মজুমদার, ইলা মিত্র, অশোক বোস, মণি সিং, গণেশ দাস, মহম্মদ দানেশ প্রমুখ।

ইলা মিত্র স্বামীর সঙ্গে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। কৃষকদের দাবি ছিল দুটি। ফসলের সাত আরি জিন ও তেভাগা। ইলা মিত্র কে নিয়ে ওই এলাকায় পরে যে গান বাধা হয় তার লাইনগুলো ছিল এই রকম:

ইলা মিত্র নারী
আইন করলো জারি
আধি জমি টিকুটি ভাগ
জিন হল সাত আরি রে ভাই
জিন হল ৭ আড়ি।

তেভাগা আন্দোলনের গতি ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠে, আন্দোলনের পুরো ভাগে যারা আছেন তারা জোতদার দের বাড়ি আক্রমণ করেন। এবং পুলিশ ডাকার অপরাধে তাদের কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করেন। অনেক জোতদার তেভাগার দাবি মেনে নিতে রাজি হন। পরে পুলিশি নিপীড়নে অন্যান্য জায়গায় অস্তমিত হলেও ইলা মিত্রের নেতৃত্বে সাঁওতাল কৃষক যোদ্ধারা নাচোলে এই আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখেন এবং তাকে সশস্ত্র প্রতিরোধে রূপান্তরিত করেন।

১৯৪৯ সালের মে মাস থেকে পুলিশ ও আনসার বাহিনী রাজশাহীর উপদ্রুত গ্রাম গুলোতে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার শুরু করে। এই সময় নাচোলে পুলিশ হত্যার ঘটনা আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। সেনা তলব করা হয়। এর পরেই সেনা এবং পুলিশ একজোট হয়ে নাচোলের কমিউনিস্ট প্রভাবিত গ্রাম গুলোতে হানা দেয়। গ্রামে প্রবেশ করে তারা এলোপাথাড়ি গুলি করে আদিবাসী, বৃদ্ধ শিশু, নারী সকলকেই হত্যা করতে থাকে। বহু নারী ধর্ষিতা হন। ঘরের আসবাবপত্র, মজুত ফসল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বহু সাঁওতাল পুরুষকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় নাচোল থানায়। নাচোলের ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে বিদ্রোহ পরবর্তী পুলিশের অমানুষিক বর্বরতা জন্য। পুলিশ প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে আদিবাসী

কৃষকদের কাছ থেকে বয়ান আদায় করার জন্য যে পুলিশ হত্যার ঘটনায় ইলা মিত্র এবং তার দলের প্ররোচনা ছিল। তারা লোভ দেখিয়েছিল এই স্বীকারোক্তির পরেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ভালোবাসার কাছে লোভ পরাজিত হয়।

এরপর ইলা মিত্র একসময় ধরা পড়েন। ধরা পড়ার পর শুরু হয় ইলা মিত্র সহ আরো কয়েকজন আন্দোলনকারীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার। রাজশাহী জেলে তাকে একটি অন্ধকার সেলে একা রাখা হয়েছিল। প্রচন্ড অসুস্থ অবস্থায় বিপর্যস্ত ইলা মিত্রকে সেবা শুশ্রূষা করে কিছুটা সুস্থ করেন বরিশালের মনোরমা বসু, পুতুল দাশগুপ্ত, খুলনার ভানুদেবী, সিলেটের অপর্ণা পাল, ঢাকার নাদিরা বানু, ময়মনসিংহের ভদ্রমণি হাজং প্রমুখ বন্দী নারী কমিউনিস্ট কর্মীরা। তাদেরই অনুরোধে তিনি আদালতে তাঁর ওপর অত্যাচারের ঘটনার একটি জবানবন্দি দেন।

রাজশাহী আদালতে ইলা মিত্র ইংরেজিতে লিখিত যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন তা থেকে তাঁর ওপর যে নির্মম অত্যাচার হয়েছিল সে বিষয়ে জানা যায় ।

ইলা মিত্রর এই জবানবন্দি টি পাকিস্থানের মুসলিম লীগ সরকার গোপন করার চেষ্টা করলেও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইশতেহারের আকারে ছাপিয়ে তা মানুষের মধ্যে প্রচার করে।

রাজশাহী জেলে এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে তার বাঁচার আর কোন আশাই ছিল না। এদিকে ঢাকা হাইকোর্টে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে এই মামলা খারিজ হয়ে আসামিদের শাস্তি যাবজ্জীবন থেকে কমিয়ে ১০ বছর করা হয়। কিন্তু রাজশাহী এমনকি ঢাকা মেডিকেল কলেজেও তার শারীরিক অবস্থার কিছু মাত্র উন্নতি হয় না। এই পর্যায়ে তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বিশেষ অনুমতি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসা হয় ভারতে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে ইলা— স্বামী ও পুত্রের সঙ্গে বেহালার এক বস্তিতে থাকতে শুরু করেন। এরপর তার আইনজীবী কামিনী কুমার দত্তের পরামর্শে ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন।

আবার ফিরে আসেন ইউনিভার্সিটির চত্বরে। ১৯৫৭ সালে বাংলায় এমএ পাস করেন।

সেই বছরই তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপিকা হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। ততদিনে ইলা মিত্র এক জীবন্ত কিংবদন্তি তে পরিণত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে লেখা হচ্ছে একের পর এক গান কবিতা। ইলা মিত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৬২, ৬৭, ৬৯ ও ৭২—চার বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এত ঝড়ঝঞ্ঝা মধ্যেও তাঁর কলম থেমে থাকে নি। তিনি অনুবাদ করেছেন ‘জেলখানার চিঠি’, ‘হিরোশিমার মেয়ে’, ‘লেনিনের জীবনী’ ও ‘রাশিয়ার ছোট গল্প’। ‘হিরোশিমা চিঠি’ বইটির জন্য তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার লাভ করেন। তাঁকে নিয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন লিখেছেন ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ নামক উপন্যাসটি। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে নিয়ে তৈরি করেছিল তথ্যচিত্র “ইলা মিত্র”। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগী ভূমিকা রাখেন।

ইলা মিত্রর মৃত্যু হয় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায়, ২০০২ সালের ৯ই অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুতে শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে দুই বাংলাতেই নেমে আসে শোকের ছায়া। তাঁর জন্মশতবর্ষে প্রণাম।

আগুনপাখি মহাশ্বেতা দেবী: সামান্য স্মৃতি

অরণি সেন

পদ্মবিভূষণ, পদ্মশ্রী, ম্যাগসাইসাই, জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য আকাদেমি প্রমুখ বহু নামী পুরস্কারে ভূষিতা স্বতন্ত্র রচনাশৈলীর অধিকারিণী প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬ - ২০১৬) জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনেকে তাঁকে নিয়ে লিখছেন। কবি যশোধরা রায়চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছেন। ফেসবুকে অলোক কুমার লিখেছেন আরেকটি মন ছুঁয়ে যাওয়া প্রতিবেদন।

মহাশ্বেতা দেবীর বিশাল ব্যাপ্ত অননুকরণীয় সাহিত্যকৃতি নিয়ে বিশদে আলোচনা চলছে। শিশু পুত্রকে রেখে গিয়ে বুন্দেলখন্ডের রুখা জমি চষে সেখানকার লোকসমাজ ও লোকগাথা থেকে আহরণ করে লেখা ‘ঝাঁসির রানী’ এক অসামান্য বীরাঙ্গনা কাহিনী। তারপর ধনুকের ছিলার মত তাঁর কলম থেকে বেরোতে থাকলো ‘মাস্টার সাব’ (বিপ্লবী নেতা জগদীশ মাহাতো কে নিয়ে লেখা), ‘অরণ্যের অধিকার’ (‘ভগবান’ বীরসা মুন্ডার কাহিনী), ‘হাজার চুরাশির মা (নকশাল আন্দোলনের এক তরুণ শহীদের শোকস্তব্ধ জননীর ঘুরে দাঁড়ানোর মর্মস্পর্শী আখ্যান), ‘চেটটি মুন্ডা ও তাঁর তীর’, ‘স্তনদায়িনী’, ‘তিতুমির’, ‘রুদালি’, ‘অগ্নিগর্ভ’, ‘মূর্তি’, ‘নৈঋতে মেঘ’, ‘সপ্তপর্ণী’, ‘বেহুলা’, ‘শালগিরার ডাকে’ প্রভৃতি সাড়া জাগানো উদ্দীপনাময় সব উপন্যাস ও গল্প এবং তাদের সংকলন।

বসাই টুডু, দ্রৌপদী মেঝেন প্রমুখ অবিস্মরণীয় সংগ্রামী ঋজু চরিত্রগুলি উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। আবার জিম করবেট কে বাংলায় নিয়ে এসেছেন অনাবিল আনন্দে। দীর্ঘদিন ‘বর্তিকা’ নামক একটি ছোট পত্রিকা সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেছেন। তাঁর

সামগ্রিক সাহিত্য দর্শনের মূল ভাব—আঘাত, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে হার না মানা সংগ্রাম, বিজয় এবং সাম্যের প্রতিষ্ঠা। দেশে বিদেশে বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে তাঁর লেখমালা পাঠকদের মুগ্ধ করেছে। নাটক এবং সেলুলয়েডেও প্রতিভাত হয়েছে তাঁর সুনির্মিত চরিত্রগুলি। সবচাইতে বড় কথা প্রতিবাদী ও গণ আন্দোলন গুলিকে অনবরত অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

ঢাকার মিশনারী স্কুল, শান্তিনিকেতনের বিশ্ববীক্ষা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে বিংশ শতকের জনমুখী প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ তাঁকে ঋদ্ধ করেছে। আর তো ছিলই এক তুলনারহিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য ও পরিবেশ। মণীশ ও ধরিত্রী ঘটকের কন্যা, ঋত্বিক ঘটকের ভ্রাতুষ্পুত্রী, শচীন ও শঙ্খ চৌধুরীর ভাগ্নী, বিজন ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং নবারুণ ভট্টাচার্যের মা। অত্যন্ত সমাজ ও রাজনীতি সচেতন তিনি জীবনযাপনেও ছিলেন স্বতন্ত্র। অধ্যাপনার পাশাপাশি বহু রকমের কাজ করেছেন, আবার আপোষহীনভাবে আর্থিক সংকটকেও সঙ্গী করে নিয়েছেন। প্রবহমান গণআন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, বিভিন্ন জনমুখী আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, জনজাতিদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু কোন দলীয় বন্ধনে জড়ান নি।

এমনই এক প্রতিভাময়ী সাহসিনী মাতৃ চরিত্র সবসময়ই আমাদের আকর্ষণ করেছে এবং সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে। ১৯৮০ - ' ৮১ হবে। জরুরি অবস্থা পরবর্তী উত্তেজক পরিস্থিতিতে অন্যান্য অনেক কলেজের মত আমাদের মওলানা আজাদ কলেজের ছাত্র সংসদ থেকে তুমুল ছাত্র সমর্থন নিয়ে ছাত্র পরিষদ কে বিদায় করে আমরা তখন টগবগ করে ফুটছি। নির্বাচিত হয়েছি ক্লাশ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে। আমাদের সিএসইউ এবং এসএফআই মিলে এলডিএসএফ গড়ে তুলেছি। প্রতিরোধ করতে পেরেছি শাহীদ ইমাম (সুব্রত মুখোপাধ্যায় গোষ্ঠী) ও পুটিয়ার (সোমেন মিত্র গোষ্ঠী) দুর্বৃত্ত বাহিনীর হিংসাত্মক আক্রমণকে। অবশ্যই অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে। ডেন্টাল কলেজের সামনে এক অনুষ্ঠানে ছাত্র সংগঠক প্রশান্ত পাল বোমার আঘাতে শহীদ হলেন, কলেজের ভেতর বোমা ও অস্ত্রের আঘাতে সহপাঠী অভীক ক্ষতবিক্ষত হল, আরও অনেকেই কম বেশি আহত হয়েছিলেন।

সেই সময়েই অন্যান্য কলেজ ও মেডিকেল কলেজের আরও বেশ কিছু এসএ - ডিএসএ ছাত্র সংগঠন মিলে আমরা তৈরি করলাম 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (এবিএসএ)', যা পরবর্তিতে সর্বভারতীয় স্তরে 'অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস' এসোসিয়েশন (এআইএসএ)' এ রূপান্তরিত হয়। গড়ফা স্কুলের কনভেনশনে বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য্য সহ অনেকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে এসেছিলেন। সেখানে মহাশ্বেতা দির স্বল্প কিন্তু গভীর বক্তৃতার একটি কথা এখনও মনে আছে, "গ্রামে যেতে হবে।''

পরে আমাদের তখনকার নেতা 'আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাশ্বেতা দির বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে বাড়িটায় গেছি।

তারপর এক দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। উত্তরবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলায় চাকরি করি। একটি কেন্দ্রীয় টিম পরিদর্শনে এসেছে। পরিদর্শন সম্পূর্ণ এবার তাঁরা ফিরে যাবেন। তাঁদের দলপতি ডা. সুরজিৎ মিশ্র দেখা করতে এসে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন। উনি কোথা থেকে জেনে এসেছেন একসময় 'পিপলস হেল্থ', ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট বা আই পি এফের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সমকালীন লোক সমাচার' ইত্যাদি সম্পাদনার কাজে যুক্ত থেকেছি। উনি মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে একটি পত্রিকা বের করতে চান, আমাকে থাকতে হবে। আমি কিছুতেই থাকবো না, আর উনি নাছোড়।

যাইহোক সেই পত্রিকা বের করতে কলকাতায় এসে তিনি, ডা. জয়দেব পাঠক আর আমি মহাশ্বেতা দির আশীর্বাদ চাইতে তাঁর কসবা রাজডাঙ্গার নতুন বাড়িতে গেলাম। শুধু আশীর্বাদ নয়, অনেক পরামর্শ, একটি মহামূল্যবান সাক্ষাৎকার দিলেন। আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলেন, ছবি তুললেন। সেই সময় তিনি বেশ অসুস্থ এবং দর্শনার্থীদের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। কলকাতায় এসে আরও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। সেই সময় লক্ষ্য করেছি প্রচণ্ড অসুস্থ, অশক্ত মহাশ্বেতা দি একটি স্বার্থান্বেষী চক্রের ঘেরাটোপে প্রায় বন্দী হয়ে পড়েছেন। যারা আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইতেন না।

মহাশ্বেতা দি কথা বলার সময় অবধারিতভাবে জঙ্গলমহলের খেড়িয়া শবর সহ জনজাতিদের সমস্যার কথা বলতেন। তাঁদের নিয়ে খুব ভাবতেন। তাঁর সমসাময়িক মাননীয় ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মহাশয়ের কাছেও আমরা লোকদেখানো ব্যাবসায়িক নয় তাঁর মতই অবহেলিত জনজাতি, ভূমিজ, আদিবাসী সমাজের সম্পর্কে নিখাদ ভালবাসা ও উষ্ণ অনুভূতি অনুভব করতাম। মহাশ্বেতা দি কোন কোন জেলায় কাজ করেছি জানতে চেয়ে একটি কথা প্রায়ই বলতেন, "পুরুলিয়াতে কাজ কোরো।" প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেইসময় পুরুলিয়া ভ্রমণের কারণে গেলেও ওখানে কাজ করিনি। পরে যখন কাজের সুযোগ পেয়ে অপরূপা পুরুলিয়া জেলাতে যাই, তখন মহাশ্বেতা দির ঐ কথাটা মনে পড়ত। মহাশ্বেতা দেবী এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক, প্রতিবাদী চরিত্র এবং সক্রিয় সমাজকর্মী। তাঁর শততম জন্মবর্ষে আমাদের প্রণাম।

কবাডি বিশ্বকাপ '২৫এ ফাইনালে তাইওয়ানকে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল ভারতীয় মহিলা কবাডি দল। স্কোয়াশে বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হলেন অনাহত সিং।

মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার

[আমরা উপস্থিত হয়েছি ‘হাজার চুরাশীর মা’, ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘বসাই টুডু’, ‘চেট্টি মুন্ডা ও তার তীর’, ‘রুদালী’, ‘তিতুমীর’ প্রমুখ কালজয়ী উদ্দীপনাময় গ্রন্থের রচয়িতা বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে।

‘ম্যাগসাইসাই’, ‘পদ্মভূষণ’, ‘আকাদেমি’, ‘জ্ঞানপীঠ’, ‘বঙ্গবিভূষণ’ অসংখ্য সম্মানে ভূষিতা মহাশ্বেতা দেবী শুধু একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকই নন তিনি আদিবাসী, ভূমিজ, অন্ত্যজ, দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের লড়াইয়ের একজন সক্রিয় সংগঠক। 'যুবনাশ্ব’ মণীশ ঘটকের কন্যা, ঋত্বিক ঘটকের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বিজন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী, নবারুন ভট্টাচার্য্যের মা অশীতিপর মহাশ্বেতা দেবী যেখানে যত অন্যায় ধারাবাহিকভাবে তার তীব্র প্রতিবাদী। এককথায় বাংলার জাগ্রত বিবেক। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বলিষ্ঠ অথচ আন্তরিক ভাষায় আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। —সম্পাদকমণ্ডলী।]

প্রশ্ন: ১৯৪৭-র পর ভারত সরকার স্বাস্থ্য নিয়ে বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। সেগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে?

উত্তর: আমি আমার দেশকে যতটুকু দেখেছি, এইসব সুবিধার ছিটেফোঁটাও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনজাতিগুলির মধ্যে পৌঁছয় নি। তাঁরা অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা, পানীয় জলের অভাব, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অভাব, এইসব নিয়েই বসবাস করছেন। পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, চা-বাগান, খাদান, সুন্দরবন, চর, উপকূল ও ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় পরিস্থিতি আরও খারাপ।

প্রশ্ন: এইসব পশ্চাদপদ এলাকার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: আমি আদিবাসী-জনজাতিদের কখনও পশ্চাদপদ বলি না। তাঁদের রয়েছে উন্নত ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাঁরা শরীরকে নীরোগ রাখার অনেক উপায় নানারকম বনৌষধি ব্যবহার জানে যা আমরা জানি না। এগুলিকে নানা কায়দায় ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। আমলাশোলে কেন মৃত্যু হয়েছিল জানেন? সেখানে আদিবাসীদের জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যে জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাঁরা বেঁচে থাকেন।

প্রশ্ন: তথাকথিত জঙ্গলমহলের উন্নয়ন নিয়ে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে, এই বিষয় নিয়ে আপনার মতামত কি?

উত্তর: অবিলম্বে এই সার্কাস বন্ধ হোক।

প্রশ্ন: তাহলে ঐ অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে আমরা কি করতে পারি?

উত্তর: আপনারা গ্রামে গিয়ে মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে পারেন। তরুণ চিকিৎসকদের উদ্দীপিত করতে হবে। সব জায়গায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, তাছাড়া সেগুলি ভালভাবে চলে না। আপনারা স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেবেন, সচেতন করবেন, রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন, জ্বর-জ্বালার ওষুধ দেবেন। ঐসব ভিটামিন-টনিক ইত্যাদি দেওয়ার দরকার নেই। শিক্ষার উপর খুব জোর দিতে হবে। একবার আমরা তিনমাস খেড়িয়া শবরদের মধ্যে শিক্ষাক্রম চালিয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তোমাদের কি লাভ হল?’ ‘মা আমাদের একটা লাভ হয়েছে, ডাইন নাই আমরা ডাইনিকে তাড়াতে পেরেছি।’

প্রশ্ন: পত্রিকার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি?

উত্তর: অনেক কিছু করতে পারেন। খুব সহজ বাংলায় লিখতে হবে। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে লিখতে হবে। ব্যাপক মানুষর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

(‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন’-র সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত। মহাশ্বেতা দেবীর গৃহে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সুরজিৎ মিশ্র, জয়দেব পাঠক ও অরণি সেন)

বাদল সরকার

(১৯২৫-২০১১)

কুনাল বাগচী

> ‘‘ভোমা জঙ্গল। ভোমা আবাদ। ভোমা গ্রাম। ভারতবর্ষের বারো আনা লোক গ্রামে থাকে।...’’
>
> (‘ভোমা’, বাদল সরকার)

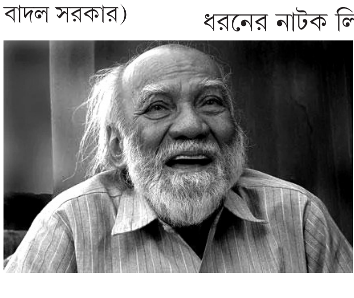

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙালী ও ভারতীয় নাট্যব্যক্তিত্ব। আধুনিক ভারতীয় নাট্যজগতের পুরোধা হিসাবে তাঁকে হাবিব তনভীর, বিজয় তেণ্ডুলকার, মোহন রাকেশ, গিরিশ কারনাড প্রমুখ দিকপালদের সঙ্গে একই আসনে বসানো হয়। ১৯৫১তে ‘চক্র’ নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে তাঁর লেখা ও অভিনয় করা নাটক ‘বড় তৃষ্ণা’ দিয়ে তাঁর নাটকের অভিযানের সূত্রপাত। তারপর একের পর এক নতুন ধরনের নাটক লিখে গেছেন এবং অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন। নাটকের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, সংলাপ, পোশাক, আলোর ব্যবহার, মঞ্চ ইত্যাদি নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। ১৯৬০-র দশকে তাঁর রচিত ‘বাকি ইতিহাস’, ‘প্রলাপ’, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, ‘পাগলা ঘোড়া’, ‘শেষ নাই’ শম্ভু মিত্রের ‘বহুরূপী’র মত নামী নাট্যদল মঞ্চস্থ করে। তিনি

নিজের নাট্যদল 'শতাব্দী' গঠন করেন ১৯৬৭তে।

কলকাতার এক শিক্ষিত খৃষ্টান পরিবারে জন্ম। পিতৃদত্ত নাম সুধীন্দ্র সরকার। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশুনা। তারপর শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (এখন IIEST) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক। তারপর টাউন প্ল্যানার হিসাবে ডিভিসিতে চাকরি। নাটক যেহেতু ছিল প্রথম প্রেম তাই নাট্যচর্চা চলছিলই। এরপর চাকরি নিয়ে চলে যান যুক্তরাজ্যে ও তারপর নাইজিরিয়ায়। সেখানকার নাটক এবং লোকসংস্কৃতি দেখার সুযোগ হয়। তাঁর যুগান্তকারী নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাইজিরিয়ায় ১৯৬৩তে লেখা। কলকাতায় ফিরে ১৯৬৫তে মঞ্চস্থ করেন। ৬০-র দশকের শেষ দিক থেকে তিনি নন-প্রসেনিয়াম স্ট্রিট ড্রামা ও রাজনৈতিক নাটকের দিকে ঝোঁকেন। মঞ্চের বাইরে গ্রামে শহরে সাধারণের মধ্যে শক্তিশালী বক্তব্যপূর্ণ পথ নাটিকা অনুষ্ঠিত করে চলেন।

সেখান থেকে উত্তরণ ঘটান অঙ্গন মঞ্চ থার্ড থিয়েটার। সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক প্রতিবাদ, সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প ছিল বিষয়বস্তু। সাধারণের ভাষা নিয়ে সংলাপ, সাধারণের মধ্যে থেকে অভিনেতা সংগ্রহ করে তাকে তৈরি করা। অভিনেতাদের শারীরিক দক্ষতা ও শক্তিশালী শরীরী ভাষা ছিল আরেকটি বৈশিষ্ট্য। মঞ্চ, আলো, মেকআপ, পোশাকের ন্যূনতম ব্যবহার। সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ। নকশাল আন্দোলনের সময় এবং সমগ্র '৭০ দশক জুড়ে তাঁর শক্তিশালী নাটকগুলি সাড়া জাগায়। এ পর্বের নাটক 'সাগিনা মাহাতো', 'স্পার্টাকাস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'বাসি খবর', 'বড় পিসিমা', 'হট্টমালার ওপারে', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'গণ্ডি', 'বাঘ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লিণ্ডসে স্ট্রিটে একটি হল ভাড়া করে প্রথমে হত, তারপর ধর্মতলার কার্জন বা সুরেন্দ্রনাথ পার্কের মুক্তমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় হত। এছাড়াও মফস্বল, গ্রামগঞ্জে দূরদূরান্তে নাটক নিয়ে চলে যেতেন।

বেশি বয়সে ১৯৯২তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমকালীন সাহিত্যে এম.এ. করেন। মহারাষ্ট্র, কেরল বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করা হয় এবং সম্মাননা পান। তাঁর নাটক বহু ভাষায় অনুদিত হয়। তিনি ১৯৬৮তে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৭২এ পদ্মশ্রী এবং ১৯৯৭এ সঙ্গীত নাটক আকাদেমি ফেলোশিপে ভূষিত হন। ২০০৩ অবধি তিনি তাঁর অঙ্গন মঞ্চ নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। তারপর একটি পথ দুর্ঘটনার পর তিনি শেকসপিয়র, গ্রাহাম গ্রিন প্রমুখের অনুবাদ; নাটক পড়া; নাটক লেখা প্রভৃতিতে ব্যস্ত ছিলেন। ২০১১তে বিদায় নেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে প্রণাম।

> ''কিসের ভয়? আমি তো আর কোথাও যাব না। আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।''...'' ('এবং ইন্দ্রজিৎ', বাদল সরকার)

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

বছর	বিজয়ী দল	আসন সংখ্যা	দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল	আসন সংখ্যা
১৯৫২	কংগ্রেস	১৫০	সিপিআই	২৮
১৯৫৭	কংগ্রেস	১৫২	সিপিআই	৪৬
১৯৬২	কংগ্রেস	১৫৭	সিপিআই	৫৫
১৯৬৭	কংগ্রেস	১২৭	সিপিআই(এম)	৪৩
১৯৬৯	সিপিআই(এম)	৮০	কংগ্রেস	৫৫
১৯৭১	সিপিআই(এম)	১১৩	কংগ্রেস (আর)	১০৫
১৯৭২	কংগ্রেস (আর)	২১৬	সিপিআই	৩৫
১৯৭৭	সিপিআই(এম)	১৭৮	জনতা পার্টি	২৯
১৯৮২	সিপিআই(এম)	১৭৪	কংগ্রেস (আই)	৪৯
১৯৮৭	সিপিআই(এম)	১৮৭	কংগ্রেস (আই)	৪০
১৯৯১	সিপিআই(এম)	১৮২	কংগ্রেস	৪৩
১৯৯৬	সিপিআই(এম)	১৫৩	কংগ্রেস	৮২
২০০১	সিপিআই(এম)	১৪৩	তৃণমূল কংগ্রেস	৬০
২০০৬	সিপিআই(এম)	১৭৬	তৃণমূল কংগ্রেস	৩০
২০১১	তৃণমূল কংগ্রেস	১৮৪	কংগ্রেস	৪২
২০১৬	তৃণমূল কংগ্রেস	২১১	কংগ্রেস	৪৪
২০২১	তৃণমূল কংগ্রেস	২১৫	বিজেপি	৭০
২০২৬	বিজেপি	২০৮	তৃণমূল	৮০

স্মরণিকা

শংকর

(১৯৩৩—২০২৬)

তার সমসময়ে সমরেশ বসু থেকে সমরেশ মজুমদার বাংলা ভাষার যশস্বী সাহিত্যিকদের তালিকায় তাঁর স্থান হয়নি; শেষ বেলায় সাহিত্য আকাদেমি, বঙ্কিম ও আনন্দ পুরস্কার ছাড়া সেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও জোটেনি; প্রেম, দেশভাগ, রাজনীতি ইত্যাদি বাঙালির প্রিয় বিষয় নিয়ে সেভাবে লেখেননি বলে সমালোচিত ছিলেন। কিন্তু তার নিজস্ব ঢঙের গল্প বলার মুন্সীয়ানা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—স্বাধীনতাউত্তর জীবনজীবিকার পরিবর্তনের আবহে সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা চরিত্রগুলির ঠাস বুনোট, সহজ ছন্দের অনর্গল গদ্য তাঁকে কিন্তু স্থান করে দিয়েছিল পাঠকদের হৃদয়ে। পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় তাঁর সমসময়ে তাঁর মত লেখক দুটি পাওয়া যাবে না। কোন উপলক্ষ্যে বাঙালির ঘরে যদি কোন বই আসত, তারমধ্যে অবধারিতভাবে শংকরের বই থাকত। 'চৌরঙ্গী' উপন্যাস ২০২২ অবধি ১২০ বার সংস্করণ বেরিয়েছে এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

পিতৃদত্ত নাম মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট এবং রিপন কলেজে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর রোজগারের জন্য মেসিন পরিষ্কার, ফেরিওয়ালা, চাপরাশি, কেরানি, টিউশনি, স্কুলে পড়ানো বিভিন্ন পেশায় তাঁকে থাকতে হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যরিষ্টার নোয়েল ফ্রেডেরিক বারওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবন বদলে দেয়। বারওয়েলের মুহুরি হিসাবে বৃহত্তর সমাজ থেকে তিনি তাঁর লেখার রসদ সংগ্রহ করেন। তিনি গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর এক্সিকিউটিভ হিসাবে অবসর নেন। গৌরকিশোর ঘোষের মাধ্যমে সাগরময় ঘোষের সঙ্গে পরিচয়। 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৫৪তে 'কত অজানারে' প্রকাশিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পান। তারপর থেকে দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী প্রমুখ পত্রিকায় এক নাগাড়ে লিখে গেছেন। 'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল', 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবেরটরি', 'সম্রাট ও সুন্দরী', 'ঘরের মধ্যে ঘর', 'সোনার সংসার', 'স্থানীয় সংবাদ', 'বিত্তবাসনা', 'তনয়া', 'চরণ ছুঁয়ে যাই' প্রমুখ তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। শেষবয়সে স্কুলের অগ্রজ শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনুপ্রেরণায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চা করেছেন। পিনাকীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উত্তমকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সুপ্রিয়া দেবী, অঞ্জনা ভৌমিক প্রমুখের অভিনীত 'চৌরঙ্গী' চলচ্চিত্র তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। সত্যজিৎ রায় 'জন অরণ্য' ও 'সীমাবদ্ধ' এবং বাসু চট্টোপাধ্যায় 'মানসম্মান' নিয়ে 'শীশা' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ঋত্বিক ঘটক 'কত অজানারে' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেছিলেন।

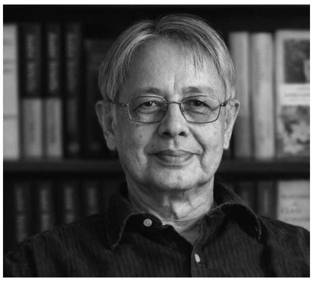

আন্দ্রে বেতেই

(১৯৩৪—২০২৬)

চন্দননগরে জন্ম ফরাসী পিতা ও বাঙালী মাতার সন্তান বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক আন্দ্রে বেতেই ছিলেন অর্ধেক ফরাসী, অর্ধেক বাঙালী এবং পুরোদস্তুর ভারতীয়। ক্ষমতা ও সামাজিক অসাম্য নিয়ে তাঁর অসামান্য সব কাজ। 'কাস্ট, ক্লাস অ্যাণ্ড পাওয়ার: চেঞ্জিং প্যাটার্নস অফ স্ট্র্যাটিফিকেশন ইন আ তাঞ্জোর ভিলেজ', 'ইনইকুয়ালিটি অ্যাণ্ড সোশ্যাল চেঞ্জ', 'অ্যান্টিমনিজ অফ সোসাইটি' প্রমুখ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এছাড়াও লিখেছেন প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। চন্দননগরের পাঠ শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব নিয়ে উচ্চশিক্ষা। তারপর 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট' হয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে যোগদান। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স সহ বহু নামী দেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। যার মধ্যে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকস, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, রটারডাম ও বার্লিন অগ্রগণ্য। অশোকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ' এর চেয়ারম্যান, ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির ফেলো, 'জাতীয় জ্ঞান কমিশন'-র সদস্য, জাতীয় অধ্যাপক। পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণে সম্মানিত হন।

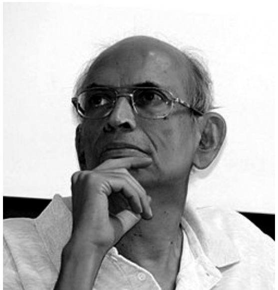

মাধব গ্যাডগিল

(১৯৪২—২০২৬)

খ্যাতিমান জীববিজ্ঞানী। পিতা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ধনঞ্জয় গ্যাডগিল। পিতৃবন্ধু পক্ষিবিশারদ সালিম আলি, প্রতিবেশী বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ইরাবতী কার্ভে প্রমুখের স্নেহধন্য ছিলেন। জীববিদ্যায় পুণের ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক ও বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পিএইচডি করেন। জীববিদ্যা নিয়ে তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণা, ম্যাথামেটিকাল মডেলিং, প্রবন্ধমালা দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও প্রশংসিত হয়। ১৯৬৯তে পিএইচডি সম্পূর্ণ করে হাভার্ডের জীববিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। বিশিষ্ট গণিতজ্ঞা ও আবহবিদ সুলোচনা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। ১৯৭১এ দেশে ফিরে পুণের আগরকর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সায়েন্টিফিক অফিসারের কাজে যোগ দেন। ১৯৭৩এ ব্যাঙ্গালোরের প্রখ্যাত 'ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-এ গবেষক হিসাবে যোগ দেন। ক্রমে গড়ে তোলেন বিশ্বমানের পরিবেশ গবেষণাকেন্দ্র 'সেন্টার অফ ইকোলোজিকাল স্টাডিজ'। এছাড়াও গোয়া, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলে প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক ছিলেন। এছাড়াও

প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও পরিবেশ উপদেষ্টা থেকে রিয়োতে অনুষ্ঠিত প্রথম আর্থ সামিটের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা প্যানেলের চেয়ারম্যান সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর পশ্চিমঘাট পর্বত এবং তার গভীর অরণ্যানি সংরক্ষণে তাঁর বিশেষ উদ্যোগ ছিল। পশ্চিমঘাট সংরক্ষণের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর প্রণীত 'গ্যাডগিল রিপোর্ট' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ সহ দেশ বিদেশের বহু সম্মাননা পান।

আশা ভোঁসলে

(১৯৩৩—২০২৬)

সঙ্গীত জগতে ইন্দ্রপতন। বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বড়দিদি লতা মঙ্গেশকারের (১৯২৯-২০২২) পর চলে গেলেন তাঁর সহোদরা বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী আশালতা দিননাথ মঙ্গেশকার যার প্রথমবার বিবাহের পর নাম হয়ে যায় আশালতা গণপত ভোঁসলে বা আশা ভোঁসলে। পিতার মৃত্যুর পর কিশোরী লতাজীর নেতৃত্বে তাঁদের জীবনসংগ্রাম, মাত্র ১০ বছর বয়স থেকে গান শুরু করে আট দশক গান গেয়ে যাওয়া, লতাদিদির মহীরূহসম চরিত্রের ছায়ায় অস্তমিত না হয়ে নিজেকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি কীর্তি এখন ইতিহাস। অসাধারণ মিষ্টি গলা এবং সময়ের সঙ্গে আধুনিক বিষয়গুলি গ্রহণ করা তাঁর ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কয়েক বছর আগে কলকাতার নজরুল স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। খালি গলায় একটি গানের অংশও গেয়েছিলেন এই বয়সে। মনে হচ্ছিল এক কিন্নরকণ্ঠী কিশোরী গাইছেন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ভজন, গজল, গুরবাণী, লোকগীতি, কাওয়ালি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি, পপ—বিভিন্ন ধরনের গান সফলতার সঙ্গে গেয়েছেন। তবে সবচাইতে সফল হয়েছেন আধুনিক গান এবং সিনেমার প্লেব্যাক সঙ্গীতে। হিন্দি, মারাঠি, বাংলা সহ ২০টি ভাষায় ১২০০০-র বেশি গান রেকর্ড করেছেন। ছিলেন বিশিষ্ট সুরকার রাহুল দেব বর্মনের ঘরণী। সন্তানের মৃত্যু সহ জীবনে অনেক বেদনা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর গানের জয়যাত্রাকে থামতে দেননি। দাদাসাহেব ফালকে, পদ্মভিভূষণ সহ বহু সম্মানে ভূষিত হন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

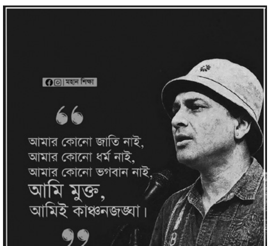

জুবিন গর্গ

(১৯৭২—২০২৫)

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী জুবিনগর্গ আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের আবালবৃদ্ধবণিতার নয়নের মণি। জনপ্রিয় গান গেয়ে এবং সামাজিক কাজ করে তিনি প্রবাদপ্রতিম শিল্পী ড: ভূপেন হাজারিকার পর আরেক স্মরণীয় জনমোহিনী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি সহ ৪০টি ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষায় ৪০,০০০ এর বেশি লোক, আধুনিক, সিনেমার গান গেয়েছিলেন। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন সঙ্গীতকার, সুরকার, চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক।

বিচারক-কবি কপিল বড় ঠাকুর ও সঙ্গীত শিল্পী ইলি বড় ঠাকুরের পুত্র, প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী জঙ্কি বড় ঠাকুরের জেষ্ঠ্যভ্রাতা জুবিন একদম ছোটবেলা থেকে দীর্ঘসময় মা এবং অন্যান্য গুরুদের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ভোরসঙ্গীত, লোক সঙ্গীত, তবলা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তামিল নিয়েছিলেন। ১২ রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। বিজ্ঞানের স্নাতক তিনি চরিত্রের দিক থেকে ছিলেন উদারতাবাদী, মানবতাবাদী, সাহসী, প্রতিবাদী, সমাজসেবী। পৈতে ছিঁড়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিভেদের বিরোধিতা করেছিলেন। স্রোতের বিপরীতে গিয়ে NRC-র বিরোধিতা করেন এবং বাঙালীদের পাশে দাঁড়ান। আবার CAA-র বিরোধিতা করে জাতিসত্ত্বাগুলির পাশে দাঁড়ান। কোভিডের সময় নিজগৃহ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এছাড়া বন্যাত্রাণ সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন। সিঙ্গাপুরে সমুদ্রে ডুবে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

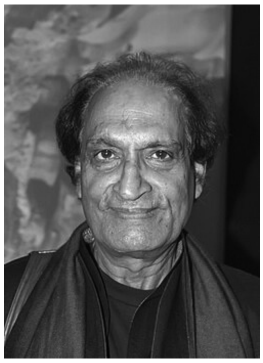

রঘু রাই

(১৯৪২—২০২৬)

ক্যামেরাকে করে ফেলেছিলেন তুলি। আদতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক ও চিত্রসাংবাদিক। বাল্যে পশ্চিম পাঞ্জাবের ঝং গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসা। একসময়ে চিত্রগ্রাহক বড়দাদা তাঁর হাতে ক্যামেরা তুলে দেন। আর ফিরে তাকাননি। তাঁর চিত্রগুলি টেকনিকালি যেমন উৎকৃষ্ট ছিল, উপরি ছিল তাতে ভাব, আবেগ ও গতি। তাঁর পাঁচটি প্রিয় বিষয়কে তিনি অনন্য করে তুলেছিলেন। কলকাতার গঙ্গা ও রাস্তাঘাটের ভিড়, কাশীর ঘাট, পুরনো দিল্লির গলি, ইন্দিরা গান্ধী এবং মাদার টেরেসা। এছাড়া বাংলাদেশ যুদ্ধে উদ্বাস্তুদের দুর্দশা, ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়, সত্যজিৎ রায়, দলাই লামা প্রমুখ তাঁর ছবিতে ভাস্বর হয়ে আছে। স্টেটসম্যান, ইণ্ডিয়া টুডে সহ বহু নামী পত্রিকায় কাজ করেছেন। কার্তিয়ে ব্রেসনের আহ্বানে বিশ্বসেরা ফোটোগ্রাফ সংস্থা 'ম্যাগনাম ফোটোস' এ যুক্ত ছিলেন। ওয়ার্ল্ড প্রেস ফোটোর জুরি ছিলেন। তাঁর অগুন্তি ছবি ছাপা হয়েছে টাইম, লাইফ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, নিউ ইয়র্ক টাইমস, নিউজ উইক সহ নামী সব পত্রিকায়। ৪০টি বই লিখেছেন। পদ্মশ্রী সহ দেশি বিদেশি বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। চার সন্তানের মধ্যে কন্যা অভনী চিত্রগ্রাহক।

সংকলন: অরণি সেন

ব্যক্তিত্ব

বদরুদ্দীন উমর—এক উজ্জ্বল দিশা

প্রণব দে

বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের সেই বিরল ব্যক্তিত্ব সমূহের একজন, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান পর্বের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্বের ২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থান পর্যন্ত সব কয়টি গণ-বিদ্রোহের সাক্ষী ছিলেন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তিনি দেখে যেতে পারলেন না। তার আগেই ২০২৫-এর ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ৯৩ বছর বয়সে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন।

উমরের মৃত্যু শুধু যে বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক শূন্যতা সৃষ্টি করল, তা নয়। সামগ্রিকভাবে এই উপমহাদেশের মার্কসবাদী রাজনৈতিক চর্চায় এক গভীর অভাববোধের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বাসে এবং জীবনচর্চায় একজন অদ্যন্ত মার্কসবাদী বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার কাশিয়ারা গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা **আবুল হাশিম** মহাশয় ছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা এবং তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য নাম। সুতরাং, পারিবারিক সূত্রেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই উমর লালিত হয়েছিলেন। আবুল হাশিম বাংলা বিভাজন-বিরোধী রাজনীতির একজন প্রধান প্রবর্তক ছিলেন। উমরের নিজের কথায় ''আমার পিতা যদিও মুসলিম লীগ করতেন, তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ওনার বন্ধুবান্ধব সব হিন্দু ছিল। আমরা সাম্প্রদায়িকতা বলে কিছু জানতাম না। বর্ধমানে আমাদের যে বৃহত্তর পরিবার, সেখানে তো সাম্প্রদায়িকতার কোনো লেশমাত্র ছিল না। দেশ বিভাগের পর বর্ধমান-এ থাকতে একটা দাঙ্গা হলো, এতে আমার আব্বা এমন ভেঙে গেলেন, যাকে বলে খুবই বিপর্যস্ত বোধ করলেন মানসিকভাবে এবং ঢাকাতে চলে এলাম আমরা।''

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। তাঁর নিজের কথায়, ''তারপর বলা যায় যখন আমি অক্সফোর্ডে পড়ি তখন থেকে আমি মার্কসবাদে এসে দাঁড়ালাম।'' দেশে ফিরে ১৯৬৪ সালে উমর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। এই সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনার সূত্রপাত। 'সাম্প্রদায়িক' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই সময়ে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি পুস্তকাকালে প্রকাশিত হলে বিতর্কের ঝড় তোলে। পাকিস্তান সরকার তাঁর বক্তব্যে এবং কার্যকলাপে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁকে সংযত হওয়ার উপদেশ দিলে, তিনি ১৯৬৮ সালে অধ্যাপক পদে ইস্তফা দিয়ে পূর্ণ সময় রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত হন।

উমর পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য মাধ্যম ***গণশক্তি*** পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে, কিছু মতভেদের কারণে, তিনি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হন। পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও, তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চর্চা এবং রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে সরে আসেননি। বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠনে তিনি সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ লেখক শিবির এবং বাংলাদেশ কৃষক সংগঠন—দুটিতেই তিনি একসময়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৩ সালে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল গঠিত হওয়ার পর তিনি আমৃত্যু তার সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ***সংস্কৃতি*** পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। কিন্তু সেই বছরই বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার ফলে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ রাখতে হয়। অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার পর পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে। আজীবন বদরুদ্দীন উমর পত্রিকাটির সম্পাদক পদে ব্রত ছিলেন।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় **'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'** গবেষণা গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই মহাকাব্যিক গ্রন্থ বদরুদ্দীন উমরকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্থায়ী স্থান করে দিয়েছে। মোটামুটি ষাট বছরের লেখক-জীবনে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা একশতর গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে। সবকয়টি গ্রন্থই তাঁর চিন্তাধারার স্বাক্ষর বহন করে। ভাষা আন্দোলন ব্যতীত তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—**'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ', 'The Emergence of Bangladesh** (Vol-I & II), **'বাঙলাদেশে ইতিহাসচর্চা'** ইত্যাদি। চার খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর **'আমার জীবন'** সমসাময়িক কালের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। উমরের গবেষণার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর তথ্যসন্ধান শুধুমাত্র মহাফেজখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন আন্দোলনে ব্যবহৃত প্রচারপত্র, দলীয় বিবৃতি, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্র ইত্যাদি তাঁর রচনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ফলত তাঁর বিশ্লেষণ হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বাস্তবনির্ভর এবং তথ্যনিষ্ঠ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে বদরুদ্দীন উমরকে পুরস্কার প্রদান করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমির একুশে পদক প্রদান করা হলে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক *স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার* দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করতে চাইলে তিনি সেটাও গ্রহণ করতে রাজি হননি। সরকারি অনুগ্রহ গ্রহণে আজীবন গররাজি থেকে আপোষহীন একজন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা এককথায় অতুলনীয়। উমরের ‘না’ বলার ক্ষমতা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত লেখক মন্তব্য করেছিলেন, ‘‘তাঁর সব গুণের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় এবং অন্য সব গুণের ভেতরে যেটি শিরদাঁড়ার মতো কাজ করে, সেটা হলো তাঁর ‘না বলার ক্ষমতা।’’

ভারতবর্ষের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী মহলে অনেকের সঙ্গেই বদরুদ্দীন উমরের সখ্য ছিল। ***অনীক*** পত্রিকার তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত লেখক। ***ইপিডব্লিউ, ফ্রন্টিয়ার*** ইত্যাদি পত্রিকাতেও তাঁর সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে উমরের শেষ সফর ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে। ***অনীক*** পত্রিকার সম্পাদক ‘দীপংকর চক্রবর্তী তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা’ দিতে তিনি ৮৬ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন। বয়সের ভার তাঁর স্মৃতিশক্তিকে এতটুকু কাবু করতে পারেনি। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল **‘অক্টোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ও নির্মাণের সমস্যা’**। এই আলোচনায় তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্র রক্ষায় স্ট্যালিনের বিশেষ অবদান এবং তাঁর ওপর মরণোত্তর আক্রমণের চক্রান্ত যে সোভিয়েতের পতনের সূচনা করেছিল, সে বিষয়ে সবিশেষ আলোকপাত করেন। বস্তুত সমাজতন্ত্রের সপক্ষে এবং একই সঙ্গে স্ট্যালিন-বিরোধিতার বিপক্ষে বদরুদ্দীন উমরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লড়াই যুদ্ধে অবিচল এক সৈনিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। পরিণত বয়সেও তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি এবং ইতিহাসকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের পরেও, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত আস্থাবান। স্পষ্ট ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন,

> যাঁরা সমাজতন্ত্রের দিন শেষ হয়েছে বলেন, তাঁরা এক হাতের বেশি দূরত্ব দেখতে পারেন না। বর্তমানই শেষ কথা নয়, শত শত বছরের ইতিহাস পরিক্রমায় একটি মুহূর্ত। আমরা থাকব না। পরের প্রজন্ম লড়বে, লড়তেই হবে। মানবজাতি বেঁচে থাকলে পরিবর্তন হবেই; যদি পুঁজিবাদী বিশ্ব গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে না দেয়। তারা কেবল শ্রমিককে ধ্বংস করছে না। মানুষ ও পরিবেশকেও ধ্বংস করছে।

সমাজ সচেতনতার এই অধোগতির যুগে, বদরুদ্দীন উমর অধ্যয়ন ও অনুশীলন দিশা দেখাতে পারে—এটা নিশ্চিত।

সাহায্যকারী গ্রন্থ—
বদরুদ্দীন উমরের জীবন ও কাজ-নিবেদিত প্রবন্ধাবলী

তৃণমূল সরকার কর্তৃক রাজ্য বাজেট ২০২৬-২০২৭ এক নজরে

(কোটি টাকায়)

	(২০২৫-২০২৬ সংশোধিত)	(২০২৬-২০২৭ সংশোধিত)
• রাজস্ব ঘাটতি	৪১,১৬৪.৩৫	২১,৭৫৯.৩৪
• রাজকোষ ঘাটতি	৬৭,৭৭৩.৯৮	৬২,৪২৩.২৬
• পুঞ্জিভূত ঋণ	৭,৬২,৩২৬.৬১	৮,১৫,৮৯১.৩৫
• ধার শোধের খরচ	৮৩,১৪৮.৯৮	৯৭,৬৪০.৩২
• মোট আয় (কেন্দ্রের ভাগ ৫২% ও ৫৬%)	২,৪৪,৮৫৬.৯১	২,৮৭,৭৯১.৭৩
• মোট ব্যায়	২,৮৬,০৩০.৯৫	৩,০৯,৫১১.০৭

• নিজস্ব আয়: ১,১৮,৫৬৯ • সামাজিক খাতে ব্যয়: ১,২০,৯৭৩
• লক্ষ্মীর ভাণ্ডার: ৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি (ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে), মোট খরচ: ৪২,৫০০
• নতুন প্রকল্প ও ভাতাবৃদ্ধিতে খরচ বৃদ্ধি ২২,৭০০
• গতবর্ষে খরচ বৃদ্ধি: ১৭০০০

ওষুধের দাম বাড়ছে-দাম কমছে মানুষের

আশিসকুসুম ঘোষ

এক আজব গণতন্ত্রে আমরা বাস করছি। বহু বছর আগে গাওয়া কিশোর কুমারের একটি গান লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। 'জিনিসের দাম বেড়েছে, মানুষের দাম কমেছে, হায়রে কপাল করব কি'। যাদের কপাল বলে পাশ ফিরে শোবার ইচ্ছা থাকে না, তাদের কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হয়। সত্যি কারণ কি দেখতে হয়—দেখাতে হয়।

কৃষকদের ঐতিহাসিক আন্দোলন ও জন সমর্থনে কুখ্যাত কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে হয়েছে। পাঁচ বছর ধরে অতি সাবধানে "শ্রম কোড" চালু করার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ চালু করে দেওয়া হয়েছে। গোদি - মিডিয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি, সব বড় বড় খবরের কাগজে বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান দেওয়া হলো শ্রমিক সহায়ক শ্রম - সংস্কার করা হয়েছে। যাদের জন্য করা হয়েছে তারা দেখলেন, কাজের ঘনত্ব বাড়ানো এবং মজুরি কমানোর ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। সংঘবদ্ধ হবার উপায় নেই। স্থায়ী চাকরি নেই। বিশাল সংখ্যক অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের জন্য কোনো আইন থাকলো না। বিশাল বেকার বাহিনী অপেক্ষায় আছে যে কোনো মূল্যে শ্রমের বাজারে আসার জন্য। এক কথায় 'শ্রম-শক্তি' আরো সস্তা হয়ে যাবে দিনে দিনে। মানুষের দাম কমতেই থাকবে। এর সাথে সরকার ও তার দোসররা বলে চলেছে এই শ্রম কোডের মাধ্যমে ব্যবসা করার (ease of doing business) পথ সুগম করে দেওয়া হয়েছে। যারা বেদ ছাড়া চলেন না। বিজ্ঞান নয় 'ব্যাদে সব আছে' বলে চিল চিৎকার করে থাকেন, সেই বেদেও লেখা নেই 'ব্যবসা' হচ্ছে মানব মুক্তির উপায়।

শরীর সুস্থ রাখতে এবং রোগ মুক্তির জন্য দরকার হয় চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধের। ওষুধের দাম সাধারণ মানুষের কাছে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওষুধের সাথে সেবা শব্দটি উচ্চারিত হলেও ওষুধ পণ্য, কড়ি দিয়ে কিনতে হয়। যাদের ওষুধের দরকার তাদের নির্ভর করতে হয় চিকিৎসা যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের নির্দেশ মত চলার। ক্রেতা অসহায় ভোক্তা মাত্র। সোজা কথায় বিক্রেতার বাজার। মুনাফা নিশ্চিত ও আকাশ ছোঁয়া।

ভারত বিশ্বে 'ওষুধের হাব' বলে খ্যাত। প্রায় ২০০ টি দেশে ভারত ওষুধ রপ্তানি করে। ওষুধ উৎপাদনের পরিমাণে বিশ্বে ভারত তৃতীয় এবং মূল্যমানে ১৩-তম দেশ। বিশ্বের ৬০% ভ্যাকসিন ভারত উৎপাদন করে। সব থেকে কম দামে এইডস চিকিৎসার ওষুধ ভারত বিশ্বে সরবরাহ করে।

আমাদের দেশে প্রায় ১২.৪০ লক্ষ ওষুধের দোকান থেকে সাধারণ মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ কিনে থাকেন। এই ওষুধগুলো 'ওভার দি কাউন্টার' (OTC) বিক্রি হয়। 'ড্রাগ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড' (DTAB) তৈরি নির্দিষ্ট ওষুধের লিস্ট অনুসারে বিক্রি হবার কথা কিন্তু সব ধরনের ওষুধ বিক্রি হয়। যা স্বচিকিৎসাকে উৎসাহিত করে এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে। ২০২৩ সালে ওটিসি ওষুধ ৮.৯ বিলিয়ন ডলার বিক্রি হয়েছিল। ২০২৯ সালে ২৮.৬৯ বিলিয়ন ডলার বিক্রি হবে ধারণা করা হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে দেশের ওষুধ শিল্পের জিডিপি -র ক্ষেত্রে অবদান ১.৭২%। দেশের সকল শিল্পের মধ্যে ওষুধ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মুনাফা করে থাকে। পরিতাপের বিষয়, আউটসোর্সিং ফার্মা ২০১২ সালে জানাচ্ছে, সারা বিশ্বে যে নকল বা ভেজাল ওষুধ ছড়িয়ে পড়ে, তার অন্যতম উৎস ভারত (৭৫%), তারপর ইজিপ্ট (৭%) এবং চিন (৬%)।

দেশে বিশালাকার ওষুধ শিল্প গত ৭৭ বছরে তৈরি হয়েছিল, বড় বড় সরকারি ওষুধ সংস্থা, ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইন, সময়ে সময়ে বিভিন্ন কমিটি রিপোর্ট ও কাজ এবং দেশের শিক্ষিত কর্মক্ষম মেহনতি মানুষের পরিশ্রমের ফলে। ১৯৯১ সালের নয়া শিল্পনীতি, ২০০৫ সালে পেটেন্ট আইন পরিবর্তন, ১৯৭০ সালের 'ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার' (DPCO) প্রায় অকার্যকর করে দেওয়া, এম আর টি পি (MRTP) ও ফেরা (FERA) আইন লঘু করে দিয়ে বহুজাতিক ও দেশীয় বড় পুঁজির বিনিয়োগ ও মুনাফার পথ মসৃণ করে বিপরীত যাত্রা চলছে। সুযোগ বুঝে লগ্নি বা ফাটকা পুঁজি ওষুধের ময়দানে চলে এসেছে। সব কিছু বাজারের নিয়মে চলবে। বাজার বিনা বাধায় সব নিয়ন্ত্রণ করবে।

আমাদের দেশে কারো চিকিৎসার জন্য যদি ১০০ টাকা খরচ হয় তার মধ্যে ৭০ টাকার বেশি (গ্রামে ৭৭ টাকা, শহরে ৭০টাকা) খরচ হয় শুধু ওষুধ কিনতে। ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'সার ও রসায়ন মন্ত্রকের' অধীন ''ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি'' (NPPA)। দেশের সকল ওষুধের প্রায় ৮৫%, পাইকারি মূল্য বৃদ্ধি সূচকের সাথে প্রতি বছর নূন্যতম ১০% দাম বাড়ে। বাকি ১৫% ওষুধের ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে, অত্যাবশ্যক ওষুধের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। ''ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন'' (NLEM) এর তালিকায় থাকা ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এই লিস্ট মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। যদিও দেশি-বিদেশি ওষুধ কোম্পানির মালিক পক্ষ চায় ওষুধের ওপর সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ উঠে যাক। ওষুধ তৈরির কাঁচামাল, মানে ''অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস'' (API), দেশের বৃহৎ সরকারি ওষুধ কোম্পানিগুলো তৈরি করত এবং সরকার নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত দামে বাজারে বিক্রি

করত। পরিকল্পনা করে ওষুধ তৈরির সরকারি সংস্থাগুলো কে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দেওয়া হয়েছে। এখন 'এপিআই' এর জন্য আমাদের দেশ মূলত চিনের উপর নির্ভরশীল। অ্যান্টিবায়োটিকসের প্রায় ৯০% এবং অন্যান্য ওষুধের ৭০% 'এপিআই' চিন থেকে আমদানি করা হয়।

রসায়ন ও সার বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মতে গত পাঁচ বছরে ওষুধের দাম বৃদ্ধি সে ভাবে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। কমিটির সুপারিশ, ২০১৩ সালের 'ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার' (DPCO) আইন সংশোধন করে তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ''ট্রেড মার্জিন র‍্যাশনালাইজেশন'' (TMR) ফ্রেমওয়ার্ক। ওষুধের উৎপাদন থেকে শুরু করে পাইকারি ও খুচরো বিক্রি থেকে ওষুধ বণ্টনের প্রতিটি স্তরে ঊর্ধ্বসীমা বসানো প্রয়োজন। অন্য কোনো ভাবেই ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী লাগাম দেওয়া অসম্ভব। এই কমিটির মতে, এই নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অনেক ওষুধের ক্ষেত্রে উৎপাদন মূল্যের তুলনায় খুচরো বাজারে দাম ৬০০ থেকে ১,১০০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে। যাঁদের টানা ও নিয়মিত ওষুধ খেতে হয় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বাজারে নজরদারি ও মূল্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা কে শক্তিশালী করতে নির্দেশ দিয়েছে এই কমিটি। নিয়ম না মানলে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। রোগীর উপর আর্থিক বোঝা কমানোই এই নীতির মূল লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক গড়িমসি বা শিল্প স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনোও অবকাশ নেই।

গণ-আন্দোলনের চাপে ওষুধের ওপর থেকে জিএসটি (GST) কমিয়ে ৫% হলেও, সাধারণ মানুষ তার সুফল পাচ্ছেন না। নতুন ৫% জিএসটি ধরে, নতুন দাম যুক্ত, বহুজাতিক কোম্পানির হেল্থ ড্রিঙ্কস বাজারে এসেছে। তার দাম (Maximum Retail Price বা MRP) ১০০ টাকা আগের দামের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে এবং ওজন ৪০০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৩৭৫ গ্রাম করা হয়েছে। বাজারে চালু ট্যাবলেট ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এম আর পি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব চলছে প্রকাশ্যে কিন্তু নিঃশব্দে। সামান্য সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা না থাকায় বা কার্যকর ভূমিকা পালন না করায় ঠকে চলেছেন রুগীরা। পকেট ভারী হচ্ছে ওষুধ কোম্পানির মালিক পক্ষের।

'স্বাস্থ্য আমার অধিকার' ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষজনদের। কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প' বা রাজ্য সরকারের 'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প' আসলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার ব্যবস্থা। ইনসিওরেন্সের বাঁধা ছকের মধ্যে সুরাহা দেখানো হচ্ছে, কর্পোরেট মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্য। ১১ ই জুন ২০২৪ 'দি ওয়ার', নীতি আয়োগের (Niti Aayog) রিপোর্ট উল্লেখ করে লিখেছে, শুধু চিকিৎসা করাতে গিয়ে ভারতের ৭% মানুষ অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে তলিয়ে গেছে।

উন্নয়নের নামে যে অপউন্নয়ন চলছে তাতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রাণ-প্রকৃতি। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর সাথে অতিরিক্ত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বছরে ১২.৬ মিলিয়ন।

অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন সম্প্রতি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁর বক্তব্যে বলেন, ''দুনিয়া জুড়ে ক্রমবর্ধমান অসাম্যের মধ্যে আরও খারাপ অবস্থায় আছেন শ্রমিকরা। দেখা যাচ্ছে মোট আয়ে শ্রমের ভাগ ক্রমেই নিম্নমুখী, অর্থাৎ শ্রমের মূল্য কমেছে। দুনিয়া জুড়েই আর্থিক পুঁজি কুক্ষিগত হচ্ছে মাত্র কয়েকটি সংস্থার হাতে। একটি গবেষণাপত্রের উল্লেখ করে অধ্যাপক বর্ধন বলেন, ২০১৬ থেকে ২০২১ এর মধ্যে ভারতে মাত্র পাঁচটি সংস্থার হাতে বাজারের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেশি কুক্ষিগত হয়েছে। পাশাপাশি, বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা এমন প্রযুক্তি বেছে নিচ্ছে, যাতে শ্রমিকের প্রয়োজন কম, যন্ত্রই কাজ করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা উল্লেখ করে প্রণববাবু বলেন, ''এই প্রযুক্তিকে আরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার মতো কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা, বৈশ্বিক পুঁজি সে কথা না ভেবে তাকে ব্যবহার করছে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে আনার কাজে। ভারতের ক্ষেত্রে সমস্যা যে অন্যরকম, সে কথাও মনে করিয়ে দিলেন তিনি। এ দেশের প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৯ জনই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, ফলে কোনও শ্রম আইন বা সামাজিক সুরক্ষাই তাঁদের জন্য প্রযোজ্য হয় না। গিগ অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত এই শ্রমিকদের ঠেলে দিচ্ছে আরও বিপদের মধ্যে''। ভারত সহ বিশ্বের পচাগলা আর্থিক তথা সামাজিক ব্যবস্থা বদলাতে না পারলে এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)

অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

অটিজমের ইতিহাস ও দৃশ্যমান বিবর্তন

অটিজম নিয়ে আধুনিক গবেষণার সূচনা বিংশ শতকের শুরুতে হলেও ১৯৪৩ সালে লিও কানার (Leo Kanner) প্রথম এই রোগকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে চিহ্নিত করেন। তিনি কিছু শিশুদের আচরণগত বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ভাষাগত ভিন্নতা এবং আচরণের পুনরাবৃত্ত বৈশিষ্ট্য দেখে তিনিই প্রথম একে "Early Infantile Autism" নামে চিহ্নিত করেন।

এরপরে ১৯৪৪ সালে হান্স অ্যাসপার্গার (Hans Asperger) নামে এক অস্ট্রিয়ান চিকিৎসক, অটিজম আক্রান্ত কিছু শিশুদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক উচ্চ ভাষাগত দক্ষতা ও বিশেষ আগ্রহের প্রবণতা

দেখে, তাদের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করেন, অর্থাৎ ''Asperger's Syndrome'' নামকরণ করেন।

বর্তমানে, প্রথা মেনে, DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition) অনুসারে এই সমস্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অটিজম সংক্রান্ত উপসর্গযুক্ত রোগীকে এক ছাতার তলায় এনে, তাকে Autism Spectrum Disorder (ASD) নামের একটিমাত্র রোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভূমিকা

অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার বা ASD হল একটি স্নায়ুবিকাশজনিত (neurodevelopmental) অবস্থা, যেখানে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সামাজিক সম্পর্ক, বোঝাপড়া, আচরণ এবং সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এটি কোনো রোগ নয়; বরং বলা যায় মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশের একটি অস্বাভাবিক বৈচিত্র্য যা মানুষের প্রচলিত সামাজিক যোগাযোগ, মিথস্ক্রিয়া এবং আচরণের উপর প্রভাব ফেলে। তাদের পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ, পারিপার্শিকতার প্রতি অনাগ্রহ এবং কর্মপ্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা- তাদের সামাজিকভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গোত্রীভূত করে তোলে।

সহজভাবে বলতে গেলে, অটিজম হলো এমন একটি বিকৃতি, যেখানে একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কে-তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। যার ফলে তাদের কথা বলা, পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা এবং অভ্যস্ত কাজগুলি বারবার করার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা দেখা যায়।

অটিজমকে ''স্পেক্ট্রাম'' বলা হয় কারণ এই বিকৃতির উপসর্গ একেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেক রকম মাত্রায় প্রকাশ পায়। কেউ খুব কম স্বল্প উপসর্গে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, কারওর আবার দৈনন্দিন কাজে নিয়মিত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।

রোগের হার

যদিও এই রোগের হার নির্ণয় নির্ভর করে বিভিন্নরকম গবেষণার পদ্ধতি এবং জনগোষ্ঠীর উপর। সাধারণভাবে এর হার প্রতি ৫০০ জনের মধ্যে ১ জন থেকে শুরু করে ৩১ জনের মধ্যে ১ জন পর্যন্ত হতে পারে।

উল্লেখ্য- ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিক থেকে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের (ASD) প্রাদুর্ভাব, এবং সময়ের সাথে সাথে এই রোগের হারও যেন বেড়ে চলেছে। হাল্কাভাবে বললে, এর সাম্ভাব্য কারণ গুলি হলো: রোগ নির্ণয়ের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আসা এবং অবশ্যই এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া।

মার্কিন মুলুকের জাতীয় তথ্যানুসারে, এই প্রাদুর্ভাবের হার বর্তমানে মোটামুটি প্রতি ৪০ জন থেকে ৬০ জনের মধ্যে প্রায় ১ জন। ভারতীয় শিশুদের মধ্যে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD)-এর আনুমানিক হার হল প্রতি ৬৮ জনের মধ্যে ১ জন। আরেকটি পরিসংখ্যান বলছে, ২-৯ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ১.১২% থেকে ১.৫%।

লিঙ্গভেদে এই আনুপাতিক হার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি। আক্রান্ত পুরুষ-নারীর অনুপাত হল আনুমানিক ৩:১। বিশ্বব্যাপী এই রোগের ব্যাপকতা বাড়লেও, ভারতে স্ক্রিনিং-এর অভাব এবং উপযুক্ত শনাক্তকরণের অভাবে বহু রুগীরই সময়কালে রোগ নির্ণয় করা এবং চিকিৎসা-প্রদান সম্ভব হয় না।

পরিবারে যদি একটি শিশুর অটিজম থাকে, তাহলে তার ভাই বা বোনের অটিজম হওয়ার ঝুঁকি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের তুলনায় বেশি। শতকরা হিসেবে এই সংখ্যাটি প্রায় ১০ থেকে ২০। ছেলে শিশুদের ঝুঁকি বেশি, বিশেষ করে যদি তারা ASD আক্রান্ত শিশুর ছোট ভাই হয়। যদি পরিবারের প্রথম যে শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত সে মেয়ে হয়, তাহলে পরবর্তী সন্তানের অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি হয়।

অটিজম রোগটাকে ঠিক একটি রোগের নিরিখে বিশ্লেষণ করা মুশকিল। আগেই বলা হয়েছে, এটি বিভিন্ন উপসর্গের সমাহার। সেই উপসর্গগুলি আবার অন্য কোনও মানসিক বা জিনগত রোগেরও বার্তা বহন করে। প্রতি ১০ জন অটিজম আক্রান্ত মানুষের মধ্যে প্রায় ৩ থেকে ৪ জনের বুদ্ধিবৃত্তি ও বোঝার ক্ষমতা কম (Intellectual disability) হতে পারে। প্রায় অর্ধেক শিশুর মনোযোগের সমস্যা ও অতিরিক্ত চঞ্চলতা (ADHD) থাকতে পারে। ৩০ শতাংশ রুগীর খিঁচুনি বা মৃগী রোগ দেখা যেতে পারে। যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম থাকে, তাদের খিঁচুনি হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। গর্ভাবস্থায় মায়ের মদ্যপানে আসক্তি থাকলে, তার থেকে শিশুটি অটিজম রোগে আক্রান্ত হতে পারে কিনা, তা এখনো গবেষণার বিষয়।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)-এর ভুগতে থাকা প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শিশুর কোনো না কোনো নির্দিষ্ট জিনগত বা বংশগত কারণ জড়িয়ে থাকে। এইসব নির্দিষ্ট জিনগত রোগের অনেকগুলোরই সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত উপসর্গমালা রয়েছে। তার মধ্যে হয়তো অটিজমও একটি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় টিউবারাস স্ক্লেরোসিস কমপ্লেক্স (Tuberous Sclerosis Complex, TSC), ভ্যালপ্রোয়েট এমব্রায়োপ্যাথি এবং ১৫৭ ক্রোমোজোম ডুপ্লিকেশন ইত্যাদি।

এই ধরনের সহ-সম্পর্কিত জিনগত রোগ সাধারণত তাদের মধ্যেই বেশি পরিলক্ষিত হয়, যাদের সামগ্রিক বিকাশে বিলম্ব (Global Developmental Delay) অথবা বুদ্ধিবিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা (Intellectual Disability) রয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, যেসব জিনগত রোগের সঙ্গে বুদ্ধিবিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা যুক্ত থাকে, সেগুলোর সঙ্গেও অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার সহাবস্থান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ডাউন সিন্ড্রোমের কথা, যেখানে ASD-এর উপসর্গ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দেখা যায়।

পারকিনসন রোগ ও অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে করা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)-এ আক্রান্ত মানুষদের পারকিনসনিজম বা পারকিনসন রোগ (Parkinson's Disease, PD)-হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

একটি কেস-কন্ট্রোল গবেষণায় ৬-১২ বছর বয়সী ৯৩ জন শিশু এবং ১৩-২৬ বছর বয়সী তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে দেখা যায়, ASD আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারকিনসনিজমের প্রাথমিক লক্ষণ-যেমন ধীর গতি (bradykinesia) ও পেশির শক্তভাব (rigidity) -ASD নেই এমন ব্যক্তিদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। শিশুদের অটিজমের ক্ষেত্রে এই হার ৫৫ শতাংশ বনাম স্বভাবিকদর ৫ শতাংশ, এবং তরুণদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৪ শতাংশ বনাম ১২ শতাংশ।

পরবর্তী একটি বৃহৎ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায়, যেখানে ২২ লক্ষেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক (বয়স ২৯-৪২ বছর) মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, সেখানেও দেখা যায় যে ASD আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারকিনসন রোগের ঝুঁকি- ASD নেই এমন ব্যক্তিদের তুলনায় বেশি (০.০৫ শতাংশ বনাম ০.০২ শতাংশ)। আপেক্ষিক ঝুঁকি ছিল ৪.৪৩ গুণ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই যে ঝুঁকি বৃদ্ধি-তা কিন্তু ASD নির্ণয়ের বয়স, অকাল জন্ম, কিংবা পরিবারে পারকিনসন রোগের ইতিহাস-এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এমনকি এটি অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দিয়েও সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলে গবেষকরা মনে করছেন, ASD এবং পারকিনসন রোগের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জৈবিক বা স্নায়বিক যোগসূত্র থাকতেও পারে।

জেনেটিক কারণসমূহ

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)-এর রোগসৃষ্টির প্রক্রিয়া (pathogenesis) এখনো সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট নয়। তবে সাধারণভাবে গবেষকদের মধ্যে এই বিষয়ে ঐকমত রয়েছে যে, ASD মূলত জিন সম্বন্ধিত রোগ, যা মস্তিষ্কের বিকাশকে প্রভাবিত করে। বিশেষত এসব জেনেটিক পরিবর্তনের ফলে স্নায়ু সংযোগ (neural connectivity) অস্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে, যার পরিণতিতে সামাজিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক আচরণের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পারিপার্শিক পরিবেশ সম্বন্ধে অনাগ্রহ ও পুনরাবৃত্ত আচরণ প্রকাশ পায়।

এই ধারণার পক্ষে সমর্থন প্রদান করে তথাকথিত ''এপিজেনেটিক তত্ত্ব'', যেখানে ধারণা করা হয় যে ভ্রূণ অবস্থায় মস্তিষ্কের প্রাথমিক বিকাশের সময় কোনো অস্বাভাবিক জিন সক্রিয় ("অন") হয়ে যায় এবং মূল DNA অনুক্রম অপরিবর্তিত রেখেই অন্যান্য জিনের প্রকাশকে প্রভাবিত করে। এর ফলে স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে।

একটি বহুজাতিক, জনসংখ্যাভিত্তিক কোহর্ট গবেষণায়-যেখানে ২০ লক্ষেরও বেশি শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে ছিল এবং যাদের মধ্যে প্রায় ১ শতাংশের ক্ষেত্রে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে ASD নির্ণিত হয়েছিল, তাদের বংশগতিয়তার (heritability) হার আনুমানিক ৮১ শতাংশ (৯৫% নির্ভরযোগ্যতা সীমা: ৭৩-৮৬ শতাংশ)। এই ফলাফল ASD-এর ক্ষেত্রে জেনেটিক প্রভাবের শক্তিশালী ভূমিকা নির্দেশ করে।

কেন হয়?

জিনগত কারণ

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারের (ASD) জটিল প্রকৃতি এবং এর বহুমাত্রিক উপসর্গের সমাহারের কথা ভাবলে বোঝা যায় যে, একাধিক জিন বা জিনসমষ্টির পারস্পরিক ক্রিয়া রোগটির জন্য আংশিকভাবে দায়ী। এর সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশগত উপাদান এবং এপিজেনেটিক উপাদান যুক্ত হয়ে রোগের লক্ষণের বৈচিত্র ও তীব্রতার তারতম্য ঘটায়।

ASD বিকাশে শক্তিশালী জেনেটিক অবদানের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে-যেমন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অসম বণ্টন, ভাই-বোনদের মধ্যে রোগের উচ্চতর হার, সমযোজী যমজদের (monozygotic twins) মধ্যে বেশি হওয়া, এবং আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা যত বাড়ে তত ASD হওয়ার ঝুঁকির বৃদ্ধি।

এ এস ডির উপসর্গগত বৈশিষ্ট্য ও নির্দিষ্ট জিনগত প্রোফাইলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে। যদিও লিঙ্কেজ স্টাডি ও হোল এক্সোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে ASD-এর ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বহু জিন শনাক্ত করা গেছে, তবুও কোনো একক জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট ASD-এর ১ শতাংশের বেশি কার্যকারণের জন্য দায়ী নয়, এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট মিউটেশন শুধুমাত্র ASD রোগের জন্য দায়ী নয়।

স্নায়ুবৈজ্ঞানিক (নিউরোবায়োলজিক) কারণসমূহ

নিউরোইমেজিং, ইলেক্ট্রোফিজিওলজি এবং ময়নাতদন্তভিত্তিক (autopsy) গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতাজনিত অস্বাভাবিকতা বিশেষ করে স্নায়ু সংযোগের (neural connectivity) ব্যতিক্রমী বিন্যাস-অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে ASD আক্রান্ত অনেক শিশুর ক্ষেত্রে শৈশবের প্রথম দিকে মাথার আকার অস্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্কের আকার তুলনামূলকভাবে বড় হতে পারে। ASD নেই এমন ব্যক্তিদের তুলনায় ASD আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ধূসর পদার্থ (gray matter) এবং সাদা পদার্থের (white matter) আয়তনে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মস্তিষ্কের ভাঁজ (sulci ও gyri)-এর গঠন, মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদানের ঘনত্ব, স্নায়বিক নেটওয়ার্ক, কর্টিকাল গঠন ও সংগঠন, এবং মস্তিষ্কের পার্শ্বীয়করণ

(lateralization)-এর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

পিতামাতার বয়স

গবেষণায় দেখা গেছে যে পিতামাতার অধিক বয়স-অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD) আক্রান্ত সন্তান জন্মের ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিভিন্ন গবেষণায় বয়সের তুলনামূলক মানদণ্ড কিছুটা ভিন্ন হলেও সাধারণত মায়েদের ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ বছর বা তার বেশি বয়স এবং পিতার ক্ষেত্রে ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে তুলনামূলক কম বয়স হিসেবে ধরা হয়েছে ৩০ বছরের নিচে।

পরিবেশগত ও প্রসবকালীন (Perinatal) কারণসমূহ

পরিবেশগত কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শ, টেরাটোজেন বা ভ্রূণের ক্ষতি করে এমন রাসায়নিক, প্রসবকালীন ক্ষতিকারক ঘটনা (perinatal insults) এবং গর্ভকালীন সংক্রমণ। যদিও এইসব কারণ অনেক ক্ষেত্রে একটি "দ্বিতীয় আঘাত" (second hit) হিসেবে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ যার আগে থেকেই জেনেটিক প্রবণতা রয়েছে, তাকে আরও ত্বরান্বিত করে তুলতে পারে।

পরিবেশগত উপাদানের প্রভাব মূলত নির্ভর করে সংস্পর্শের সময়কাল ও স্থায়িত্ব, বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা, কর্মপ্রক্রিয়া (mechanism of action) এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এর বিস্তারের ধরন-এর ওপর।

একটি মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে অকাল জন্মগ্রহণকারী (preterm) শিশুদের মধ্যে ASD হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে গর্ভাবস্থায় মায়ের কিছু শারীরিক অবস্থা যেমন ডায়াবেটিস, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, প্রি-এক্ল্যাম্পসিয়া, এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস-সন্তানের ASD হওয়ার ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

√ টিকা (vaccine) অটিজম সৃষ্টি করে না।

√ অভিভাবকের লালন-পালন ভুল হলে অটিজম হয় না।

√ এটি "নিরাময়যোগ্য রোগ" নয়, তবে দক্ষতা বাড়ানো সম্পূর্ণ সম্ভব।

উপসর্গ

ASD-এর লক্ষণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জীবনের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই বয়সে সাধারণত ভাষা ও বাচন-প্রকাশে বিলম্বই প্রথম পরিলক্ষিত হয়। তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক ক্ষেত্রে চোখে চোখ রেখে যোগাযোগের অভাব এবং সামাজিক মেলামেশার প্রতি আগ্রহের ঘাটতি প্রথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। এছাড়াও, Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT)-এর মতো স্বীকৃত স্ক্রিনিং টেস্টে ব্যর্থ হওয়াও ASD সম্পর্কে প্রাথমিক সন্দেহ উত্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রায় এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ শিশুর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স্বাভাবিক বাচন প্রকাশ ও সামাজিক বিকাশ পরিলক্ষিত হলেও ১৫ থেকে ২৪ মাস বয়সের মধ্যে ভাষা, যোগাযোগ এবং সামাজিক আদবকায়দার বিকাশের ক্ষেত্রে স্থবিরতা বা পশ্চাৎগমন (regression) দেখা দিতে পারে। এই পশ্চাৎগমন ধীরে ধীরে বা হঠাৎ,যে কোনওভাবেই ঘটতে পারে।

একটু বড় শিশু অর্থাৎ কিনা যারা প্রাক-স্কুল বয়সী, তাদের মধ্যে ASD সাধারণত সামাজিক যোগাযোগে আগ্রহের অভাব, ভাষা চয়নের ইচ্ছা বা প্রকাশে অনীহা, দৈনন্দিন জীবনের রুটিন পরিবর্তনের প্রতি তীব্র অনিচ্ছা এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত কম বা মৃদু উপসর্গবিশিষ্ট শিশুদের ক্ষেত্রে ASD-এর লক্ষণ বিদ্যালয় জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে বা তার পরবর্তী পর্যায়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এই শিশুরা প্রাথমিকভাবে আচরণগত সমস্যা নিয়ে ডাক্তারবাবুদের কাছে হাজির হয়। যেমন নির্দেশ বা উপদেশ অনুসরণে অনীহা বা নিজস্ব জগতে অতিরিক্ত মনোনিবেশ এবং নিজের নিজেকে এক সামাজিকভাবে অদৃশ্য, অলীক এক মনোজগতের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রাখা। অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে সহাবস্থান করে কিছু সহ-বিদ্যমান (co-morbid) ব্যারাম-যেমন attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) যেখানে শিশুটি অস্বাভাবিকরকম চঞ্চল এবং কোনও কাজেই মনোনিবেশ করতে পারে না, বা উদ্বেগজনিত ব্যাধি বা Anxiety disorder। সার্বিকভাবে, অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডার একটি বিচিত্র, বিস্তৃত উপসর্গ বিশিষ্ট ব্যাধি, যার প্রথম প্রকাশ, বিস্তার এবং ফেনোটাইপিক বৈচিত্রও অনেক। এই বৈচিত্র্য এ এস ডির রোগ নির্ণয়, ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নির্ধারণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

সামাজিক যোগাযোগ ও মেলামেশায় সমস্যা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)-এ আক্রান্তদের সামাজিক যোগাযোগ ও অন্যদের সঙ্গে মেলামেশায় সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যাগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন-

- আবেগ ও অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার সমস্যা
  অন্য মানুষের সঙ্গে আনন্দ, আগ্রহ বা সাফল্যের ভাগীদার হওয়ার অনাগ্রহ। কারও সঙ্গে কথা বলার সময় বা মেলামেশায় আগ্রহ দেখানো কিংবা অন্যের আগ্রহের জবাব দিতে অনীহা।
- চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গি ঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা কথা বলার সময় চোখে চোখ রাখা, মুখের অভিব্যক্তি বা হাতের ইশারা ব্যবহার করতে সমস্যা হতে পারে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী কথার অর্থ বোঝা কঠিন হয় এবং রসিকতা বা ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়।
- সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে অসুবিধা

নিজের বয়সের অন্য শিশু বা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং সেই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতার অভাব।

সীমিত ও পুনরাবৃত্ত আচরণ, আগ্রহ ও কর্মকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা ও পৌনঃপুনিকতা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)-এ আক্রান্ত অনেক মানুষের আচরণ, আগ্রহ ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সীমিত কর্মপরিধি ও পুনরাবৃত্তি এর বৈশিষ্ট। যেমন-

- একই ধরনের কাজ বা নড়াচড়া বারবার করা। হাত নাড়ানো, শরীর দোলানো, ঘুরে ঘুরে হাঁটা বা একই কাজ বারবার করার প্রবণতা।
- একই নিয়ম বা অভ্যাসে খুব বেশি আঁকড়ে থাকা। দৈনন্দিন কাজ নির্দিষ্ট নিয়মে রুটিনমাফিক না হলে অস্বস্তি বা বিরক্তি দেখা দিতে পারে। অকারণে কিছু রুটিন বা আচরণ মেনে চলার প্রবণতা থাকতে পারে।
- খুব সীমিত বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ। কোনো একটি বিষয় যেমন খেলনা বা কাজের প্রতি অস্বাভাবিকভাবে বেশি আগ্রহ দেখা যেতে পারে এবং অন্য বিষয়ে অনাগ্রহ।
- ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার প্রতি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আলো, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা স্বাদের প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা বা কখনো অস্বাভাবিকরকমের কম সংবেদনশীলতা থাকতে পারে। যেমন- উচ্চগ্রাম শব্দে খুব বিরক্ত হওয়া বা ব্যথা ঠিকমতো অনুভব না করা ইত্যাদি।

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD) রোগ নির্ণয় ও তৎপরবর্তী চিকিৎসার ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক চিকিৎসক (যেমন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁরা যা করতে পারেন তার একটা সাম্ভাব্য খসড়া এইভাবে তৈরি করা যেতে পারে -

- সন্দেহজনক আচরণের শিশুদের শনাক্ত করা: শিশুর আচরণ, সময়ে কথা বলা, সামাজিক যোগাযোগ ও মানসিক বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে যেসব শিশুর ASD হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করা।
- প্রাথমিক মূল্যায়ন শুরু করা: ASD ও এর সাথে থাকা অন্যান্য সমস্যা (যেমন দেরিতে কথা বলা, বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা, ADHD ইত্যাদি) যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা। অভিজ্ঞ প্রাথমিক চিকিৎসক অনেক সময় রোগ নির্ণয় করতে পারেন, তবে নিশ্চিতকরণ বা জটিল সমস্যা যাচাইয়ের জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে।
- সঠিক চিকিৎসাকেন্দ্রে ও সহায়তামূলক কেন্দ্রে রেফার করা; শিশুর বিকাশ ও আচরণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় থেরাপি ও সহায়ক কেন্দ্রে (যেমন স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, বিহেভিয়রাল থেরাপি) পাঠানো।
- পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় কিছু পদ্ধতির পরামর্শ দেওয়া: বিশেষজ্ঞের কাছে দেখা বা অন্যান্য সেবা শুরু হওয়ার আগেই পরিবার ঘরে বসে যেসব সহজ সহায়ক কার্যক্রম করতে পারে, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া।

সংক্ষেপে, প্রাথমিক চিকিৎসকরা শুরুতেই- রোগ নির্ণয়, রুগীর প্রাথমিক মূল্যায়ন, সঠিক জায়গায় রেফারাল এবং পরিবারকে দিকনির্দেশ করা-এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেই পারেন।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD) সন্দেহ হলে যে সম্পূর্ণ বা সমন্বিত মূল্যায়ন (comprehensive evaluation) করা হয়, তার মূল লক্ষ্যগুলো হলো-

- শিশুর উপসর্গ ASD- রোগ নির্ণয়ের নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে কি না তা নির্ধারণ করা। শিশুর আচরণ, সামাজিক যোগাযোগ ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে নিশ্চিত হওয়া যে সেগুলো রোগ নির্ণয়ের প্রতিষ্ঠিত যে সব মানদন্ড আছে, সেই অনুযায়ী ASD রোগ শনাক্তকরণের-মধ্যে পড়ছে কি না।
- শিশুর কার্যক্ষমতা ও মানসিক বিকাশের অবস্থান বোঝা: শিশুর ইতিবাচক জায়গা (যেমন ভালো স্মৃতি, নির্দিষ্ট কাজে দক্ষতা) এবং দুর্বলতার জায়গা (যেমন ভাষা, সামাজিক দক্ষতা, শেখার সমস্যা) কী-তা মূল্যায়ন করা, এবং সমস্যার তীব্রতা কতটা তা নির্ধারণ করা।
- সঠিক রোগ নির্ণয় করা: শিশুর ASD আছে কি না, নাকি অন্য কোনো মানসিক বিকাশগত বা আচরণগত সমস্যা আছে, অথবা ASD-এর সাথে সাথে অন্য কোনো সমস্যা (যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা বা ভাষাগত সমস্যা) একসঙ্গে রয়েছে কি না-তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা।

সংক্ষেপে, এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো সঠিক রোগ নির্ণয়, শিশুর সামগ্রিক সক্ষমতা বোঝা, এবং ভবিষ্যৎ চিকিৎসা ও সহায়তার পরিকল্পনা নির্ভুলভাবে করা।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD) নির্ণয়ের জন্য যে সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়, তার প্রধান অংশগুলো নিচে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হলো-

প্রাথমিক বাছাই বা স্ক্রিনিং করার প্রয়োজন কেন?

স্ক্রিনিং টুল বা বাছাই পরীক্ষা এমন একটি উপায়, যার মাধ্যমে যেসব সমস্যা বা উদ্বেগ চোখে সহজে ধরা পড়ে না, সেগুলো আগেভাগেই শনাক্ত করা যায়।

অনেক সময় শিশুর আচরণ বা বিকাশে সূক্ষ্ম পরিবর্তন থাকে, যা-বাবা-মা, শিক্ষক, বা চিকিৎসকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। স্ক্রিনিং এই লুকানো সমস্যাগুলো ধরে ফেলতে সাহায্য করে।

বাছাইয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো

- শিশুর মধ্যে কোনো বিকাশজনিত বা আচরণগত সমস্যা আছে কি না, তা বোঝা

- এবং আরও বিস্তারিত পরীক্ষা বা মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি না, তা নির্ধারণ করা

অর্থাৎ, স্ক্রিনিং নিজে কোনো চূড়ান্ত রোগনির্ণয় নয়, বরং এটি বলে দেয়-আরও পরীক্ষা দরকার আছে কি না।

স্তরভিত্তিক স্ক্রিনিং মডেল

১. প্রথম স্তরের স্ক্রিনিং (First-tier screening)

এই স্ক্রিনিং করা হয় সাধারণ শিশু জনসংখ্যার মধ্যে, অর্থাৎ- যেসব শিশুর ক্ষেত্রে আগে থেকে বড় কোনো সমস্যা ধরা পড়েনি।

উদ্দেশ্য:

- কোন কোন শিশু অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারের ঝুঁকিতে আছে, তা চিহ্নিত করা। এটি একটি প্রাথমিক ছাঁকনি হিসাবে ধরা যেতে পারে সব শিশুর মধ্যে থেকে ঝুঁকিপূর্ণদের আলাদা করা।

২. দ্বিতীয় স্তরের স্ক্রিনিং (Second-tier screening)

এই স্ক্রিনিং করা হয় তাদের ক্ষেত্রে-

- যাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিকাশজনিত সমস্যা বা উদ্বেগ দেখা গেছে

উদ্দেশ্য:

- ASD এবং আনুষঙ্গিক অন্য বিকাশজনিত সমস্যার (যেমন ভাষাগত বিলম্ব, বুদ্ধিবিকাশের সমস্যা) মধ্যে পার্থক্য করা

স্ক্রিনিং টুলের কার্যকারিতা

যে স্ক্রিনিং টুল ব্যবহার করা হবে, সেটি কতটা ভালো কাজ করে তা জানা জরুরি।

এর মধ্যে রয়েছে—

- Sensitivity: সমস্যা থাকলে কতজনকে ঠিকভাবে ধরতে পারে
- Specificity: সমস্যা না থাকলে কতজনকে ঠিকভাবে বাদ দিতে পারে
- Positive predictive value: পজিটিভ হলে সত্যিই সমস্যা থাকার সম্ভাবনা কতটা?

স্ক্রিনিং টুল বাছাই

স্ক্রিনিং টুল বাছাই নির্ভর করে-

- শিশুর বয়স
- প্রথমবার স্ক্রিনিং হচ্ছে কিনা
- আগেই কোনো বিকাশগত ঝুঁকি চিহ্নিত হয়েছে কিনা

এছাড়াও বাছাই পর্বে কিছু অন্যান্য জিনিসও মাথায় রাখতে হয় যেমন ভাষা, সংস্কৃতি, বাস্তবিক সুযোগ-সুবিধা (logistics) ইত্যাদি

বাছাইপর্বে সন্দেহ হলে কী করা উচিৎ?

যে শিশু ASD স্ক্রিনিংয়ে পজিটিভ হয়-

- তার বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা উচিত
- এবং চূড়ান্ত রোগনির্ণয়ের আগেই প্রয়োজনীয় বিকাশমূলক পরিসেবার আওতায় নিয়ে আসা উচিত

বাছাইপর্বে কিছু না পেলে কী করা উচিৎ?

স্ক্রিনিং নেগেটিভ মানে এই নয় যে ভবিষ্যতে সমস্যা হবেই না। তাই-

- নিয়মিত বিকাশ পর্যবেক্ষণ
- নির্দিষ্ট বয়সে আবার স্ক্রিনিং চালিয়ে যেতে হবে।

১. রুগীর উপসর্গের বিস্তারিত বিবরণ

সাধারণত বাবা-মা বা বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়। পাশাপাশি শিক্ষক, থেরাপিস্ট বা অন্য পেশাজীবীর তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এখানে মূলত দেখা হয়-

- বর্তমান শিশুর ASD-এর লক্ষণ কী এবং শৈশবের শুরুতে কী ধরনের লক্ষণ ছিল
- ASD-এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা বা উপসর্গ (যেমন ভাষাগত বিলম্ব, আচরণগত সমস্যা)
- পারিবারিক ইতিহাস: পরিবারে ASD বা অনুরূপ কোনো সমস্যা আছে কি না
- মনোসামাজিক ইতিহাস: শিশুর পারিবারিক পরিবেশ, স্কুল, সামাজিক পরিস্থিতি ইত্যাদি

২. শারীরিক পরীক্ষা (Physical examination)

শিশুর শারীরিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়, বিশেষ করে-

- সীমিত বা একঘেয়ে খাবারের অভ্যাসের ফলে কোনো পুষ্টিগত সমস্যা হয়েছে কি না
- ওজন, উচ্চতা বা মাথার পরিধিতে অস্বাভাবিকতা
- স্নায়বিক লক্ষণ, ত্বকের বিশেষ চিহ্ন, বা জন্মগত গঠনগত বৈশিষ্ট্য (dysmorphic features)

৩. রোগ নির্ণয়ের অন্যান্য উপকরণ (Diagnostic tools)

রোগের বিবরণ ও শারীরিক পরীক্ষার সাথে মিলিয়ে কিছু বিশেষ মূল্যায়ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়-

- এই উপকরণগুলি একা ব্যবহার করে, দলগত মূল্যায়ন করলে ভালো হয়।
- সাধারণত এই জাতীয় উপকরণ বিশেষজ্ঞরা ব্যবহার করেন, তবে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকলে প্রাথমিক চিকিৎসকরাও ব্যবহার করতে পারেন।

৪. সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক সমস্যার বিচার (Evaluation for associated conditions)

রোগ নির্ণয়ের প্রেক্ষিতে এটি জরুরি কারণ—

- ASD রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা
- ASD-এর মতো সমউপসর্গের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে এর পার্থক্য করা
- ASD-এর সাথে থাকা অতিরিক্ত সমস্যাগুলো (যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা) শনাক্ত করা

এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—

- বিকাশগত ও কার্যক্ষমতার মূল্যায়ন
- জেনেটিক পরীক্ষা ও রক্তে সিসা (lead) পরীক্ষা
- প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য পরীক্ষা (যেমন মেটাবলিক বা নিউরোইমেজিং)

৫. রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

- শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ ও বিস্তারিত ইতিহাসের ভিত্তিতে ক্লিনিক্যালভাবে ASD নির্ণয় করা হয়
  - দুটি প্রধান আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়—
    - DSM-5-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
    - ICD-11 (International Classification of Diseases)

- **উভয় ক্ষেত্রেই মূল গুরুত্ব দেওয়া হয়—**
  - সামাজিক যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের অসুবিধা
  - সীমিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ, আগ্রহ ও ইন্দ্রিয়গত প্রতিক্রিয়া

৬. রোগের গভীরতা ও সহায়তার প্রয়োজন নির্ধারণ

- প্রতিটি ক্ষেত্রে (সামাজিক যোগাযোগ, আচরণ ইত্যাদি) সমস্যার গভীরতা আলাদা করে মূল্যায়ন করা হয়
- শিশুর কতটা সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়
- মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে ASD অনেক সময় কম শনাক্ত হয় এ বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি

সংক্ষেপে, সার্বিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ রোগ নির্ণয়, শিশুর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা বোঝা, এবং উপযুক্ত চিকিৎসা ও সহায়তার পরিকল্পনা করা।

Autism Spectrum Disorder (ASD): চিকিৎসার কিছু রূপরেখা—

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD) একটি সমস্যা যেটির চিকিৎসা হয়তো সারাজীবনই চালাতে হয়। তাই এর চিকিৎসা বা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত ও ধারাবাহিক পদ্ধতি প্রয়োজন।

ASD-এর চিকিৎসা-পরিকল্পনা কখনোই সবার জন্য একরকম নয়। এটি অবশ্যই শিশুর বয়স, বিকাশের স্তর, সমস্যা কতটা গুরুতর, মানসিক শক্তির দিক, দুর্বলতা এবং পরিবারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিভেদে আলাদা করে পরিকল্পনা করতে হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে—

- ছোট বয়সে জোর দেওয়া হয় আর্লি ইন্টারভেনশন, কথা বলা, সামাজিক যোগাযোগ ও দৈনন্দিন দক্ষতা গড়ে তোলার ওপর
- বড় বয়সে গুরুত্ব পায় শিক্ষা, আচরণ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দক্ষতা, এবং আত্মনির্ভরতা
- প্রয়োজন অনুযায়ী স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, বিহেভিয়রাল থেরাপি, শিক্ষা সহায়তা ও পরিবারকে পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়

সংক্ষেপে, ASD আজীবন থাকতে পারে, তবে সঠিক বয়সে সঠিক ও সমন্বিত সহায়তা দিলে শিশুর কার্যক্ষমতা ও জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা সম্ভব।

Autism Spectrum Disorder (ASD): চিকিৎসা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সহজ ব্যাখ্যা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের কোনো সম্পূর্ণ নিরাময় (cure) নেই। তবে যত তাড়াতাড়ি রোগ শনাক্ত করা যায় এবং যত আগে ও নিয়মিতভাবে চিকিৎসা/থেরাপি শুরু করা যায়, ততই শিশুর ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে। একে বলা হয় Early Intervention।

চিকিৎসার লক্ষ্য (Goals of treatment)

ASD-এর চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হলো—

- শিশুর সর্বোচ্চ সক্ষমতা বিকাশ করা
- ধীরে ধীরে শিশুকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়া
- শিশুর ও পরিবারের জীবনের মান (quality of life) উন্নত করা

চিকিৎসার ধরন (Treatment approach)

- ASD-এর চিকিৎসা মূলত আচরণগত ও শিক্ষামূলক থেরাপির ওপর নির্ভরশীল
  - যেমন: বিহেভিয়রাল থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, বিশেষ শিক্ষা
- ওষুধ সাধারণত মূল ASD চিকিৎসা নয়
  - তবে আনুষঙ্গিক সমস্যা (যেমন অতিরিক্ত উত্তেজনা, ঘুমের সমস্যা, খিঁচুনি, ADHD, উদ্বেগ বা বিষণ্ণতা) থাকলে সহায়ক হিসেবে ওষুধ ব্যবহার করা হতে পারে
- চিকিৎসা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা জরুরি
  - শিশুর বয়স ও প্রয়োজন বদলালে চিকিৎসার পরিকল্পনাও পরিবর্তন করতে হয়

প্রাথমিক চিকিৎসকের ভূমিকা (Role of primary care provider)

প্রাথমিক চিকিৎসক (শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ/ফ্যামিলি ডাক্তার) যেসব কাজ করেন-

- শিশুর চিকিৎসা সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা
- পরিবারকে ধারাবাহিক শিক্ষা ও মানসিক সহায়তা দেওয়া
- ASD-এর সাথে থাকা অন্যান্য শারীরিক বা মানসিক সমস্যা আছে কি না তা পরীক্ষা করা

- প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো

ASD আক্রান্ত শিশুদের অনেক সময় চিকিৎসা সেবায় পৌঁছাতে সমস্যা হয়, তাই প্রাথমিক চিকিৎসকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Prognosis)

- ASD-এর ফলাফল একেক শিশুর ক্ষেত্রে একেক রকম
- এটি নির্ভর করে—
  - উপসর্গ কতটা গুরুতর
  - কত তাড়াতাড়ি রোগ শনাক্ত হয়েছে
  - কত দ্রুত ও নিয়মিত থেরাপি শুরু হয়েছে
- অনেক ক্ষেত্রে কিশোর বা প্রাপ্তবয়স্ক বয়সে
  - সামাজিক দক্ষতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি
  - এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যঝুঁকি কিছুটা বেশি থাকতে পারে

অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজর্ডার চিকিৎসায় ওষুধপত্রের ভূমিকা =

১. ওষুধ ছাড়া চিকিৎসাই (Non-pharmacologic services) হল মূল স্তম্ভ

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)-এর ক্ষেত্রে চিকিৎসার মূল ভিত্তি হলো—

- শিক্ষামূলক সহায়তা
- আচরণগত থেরাপি
- বিশেষ লক্ষ্যভিত্তিক থেরাপি (যেমন: স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি)

এই পরিষেবাগুলো সাধারণত দেওয়া হয়—

- Early Intervention প্রোগ্রামের মাধ্যমে
- স্কুলভিত্তিক বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে
- অথবা ব্যক্তিগত (private) থেরাপির মাধ্যমে

ওষুধ শুরু করার আগে অবশ্যই এসব শিক্ষামূলক ও আচরণগত থেরাপি যথাসম্ভব প্রয়োগ করে দেখতে হবে।

যদি এগুলো যথেষ্ট কাজ না করে, তখনই কেবল ওষুধের কথা ভাবা উচিত।

এমনকি যদি ওষুধ দেওয়া হয়, তবুও ওষুধ ছাড়া থেরাপিগুলো বন্ধ করা যাবে না-সেগুলো সব সময় চলতে থাকবে।

২. ওষুধের ভূমিকা (Role of pharmacotherapy)

ASD-এর মূল সমস্যাগুলো (যেমন সামাজিক যোগাযোগের ঘাটতি) সরাসরি ঠিক করার জন্য কিছু ওষুধ নিয়ে গবেষণা হয়েছে।

কিন্তু—

- এই গবেষণাগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে
- অনেক ওষুধ বাস্তবে চিকিৎসায় সহজলভ্য নয়

তাই ওষুধের প্রধান ব্যবহার হয় অন্য সহ-বিদ্যমান সমস্যার জন্য, যেমন-

- উদ্বেগ (anxiety)
- অতিরিক্ত রাগ বা বিরক্তি
- মনোযোগের সমস্যা
- আচরণগত সমস্যা
- অন্য মানসিক বা স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যা

৩. নির্দিষ্ট লক্ষণ চিহ্নিত করা জরুরি

ওষুধ কখনোই “সাধারণভাবে” দেওয়া উচিত নয়।

ওষুধ দিতে হবে নির্দিষ্ট সমস্যাকে লক্ষ্য করে, যেমন—

- অতিরিক্ত উদ্বেগ
- হঠাৎ হঠকারি আচরণ
- রাগ ও বিরক্তি
- মনোযোগের অভাব
- মুডের সমস্যা

কিন্তু অনেক সময় বোঝা কঠিন হয়—

কোন সমস্যাটি শিশুর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর।

তাই প্রয়োজন—

- বিস্তারিত ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন
- বাবা-মা, কেয়ারগিভার, শিক্ষক ও থেরাপিস্টদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

এই সমন্বিত মূল্যায়নের পরই ওষুধ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র :

1. Autism spectrum disorder (ASD) in children and adolescents: Terminology, epidemiology, and pathogenesis- AUTHOR: Marilyn Augustyn, MD SECTION EDITOR: Robert G Voigt, MD, FAAP DEPUTY EDITOR: Niloufar Tehrani, MD:Uptodate
2. Autism spectrum disorder in children and adolescents: Behavioral and educational interventions- AUTHORS: Laura Weissman Hale, MD Cynthia Martin, PsyD SECTION EDITOR Marilyn Augustyn, MD DEPUTY EDITOR: Niloufar Tehrani, MD, Uptodate
3. Autism spectrum disorder in children and adolescents: Clinical features: AUTHORS: Marilyn Augustyn, MD Erik von Hahn, MD SECTION EDITOR: Robert G Voigt, MD. FAAP DEPUTY EDITOR. Niloufar Tehrani, MD Uptodate
4. Autism spectrum disorder in children and adolescents: Evaluation and diagnosis-AUTHORS: Marilyn Augustyn, MD. Erik von Hahn, MD SECTION EDITOR Robert G Voigt, MD, FAAP DEPUTY EDITOR: Niloufar Tehrani, MD: Uptodate
5. Autism: WHO

আধুনিকতার অসুখ ক্যান্সার—আমেরিকান আধিপত্য এবং সর্বগ্রাসী যুদ্ধেরও

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

১৯৭৬ সালে বিশ্ববাসীকে প্রথম জানানো হল আমেরিকার ২০০ বছর উদযাপনকে সামনে রেখে ক্যানসারকে নির্মূল করার অভিযান চালানো হচ্ছে। পরে বুঝলাম ক্যানসার একটি blanket term অর্থাৎ কম্বলের মতো একটি আচ্ছাদন যার নিচে অন্তত কয়েকশ ধরনের ক্যানসারের সন্তান-সন্ততি শুয়ে আছে। ১৯৭১ সালেই আমেরিকার ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (War on Cancer) সমগ্র পৃথিবীর ক্যানসার-সংক্রান্ত গাইডলাইন এবং গবেষণার অভিমুখ নির্ধারণ করেছে।

মেরি লাস্কার "সিটিজেন'স কমিটি ফর দ্য কনকোয়েস্ট অব ক্যান্সার"-এর ওয়াশিংটন পোস্ট এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় তরফে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দিলেন। আমরা কনকোয়েস্ট শব্দটি নজরে রাখবো। একদিকে যুদ্ধ (war on cancer) অন্যদিকে যুদ্ধজয় করে দখল করা (conquest) এরকম সামরিক শব্দসম্ভার দিয়ে গড়ে উঠতে লাগলো "ক্যান্সার"-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্যোতনা। সত্যিই কি কোন অসুখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়? তাহলে তো যে মানুষটি রোগ বহন করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়! বাস্তবেও সেটাই হয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় থেকে ক্যান্সারকে নিয়ে একটি শত্রু/একটি রোগ (USSR/cancer)-এর মডেল ব্যর্থ হলে দেখা গেলো কোন নির্দিষ্ট উৎস অধরা থাকছে, অধরা থাকছে পেছনে কোন রাষ্ট্রের ভূমিকা। মজার ব্যাপার হল, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সোভিয়েত প্রভাবকে তুলনা করা হচ্ছিল ক্যান্সারের মেটাস্টেসিসের সাথে। যদিও বিশ্বব্যাপী মুক্ত পুঁজির ফেরিওয়ালা আমেরিকার প্রভুত্বের কিংবা দেশে দেশে অন্তর্ঘাতের প্রসঙ্গের জন্য কোন মেটাফর ব্যবহার করা হয়নি। (প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক – এলেন লিওপোল্ড, "আণ্ডার দ্য রাডারঃ ক্যান্সার অ্যান্ড দ্য কোল্ড ওয়ার)

কয়েক বছর আগেকার হিসেবে ক্যানসার ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসা প্রতি বছরে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের (এর মধ্যে ক্যান্সারের ওষুধের ব্যবসা ১৮২ বিলিয়ন ডলার, ক্যান্সার চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ২৪০ বিলিয়ন ডলার এবং বাকিটা আনুষঙ্গিক খরচ)। এর সাথে জড়িয়ে আছে অতিবৃহৎ দৈত্যসদৃশ কোম্পানির মুনাফা, এবং সেই মুনাফার মৃগয়াক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। ফলে ক্যানসার শুধুমাত্র একটি আধুনিকতার অসুখ হয়ে থাকলো না, এর সাথে জড়িয়ে গেলো বৃহৎ পুঁজি, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য রাজনীতি এবং অত্যন্ত দামী নিত্য-নতুন প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক বাজারের বিস্তারের প্রসঙ্গ।

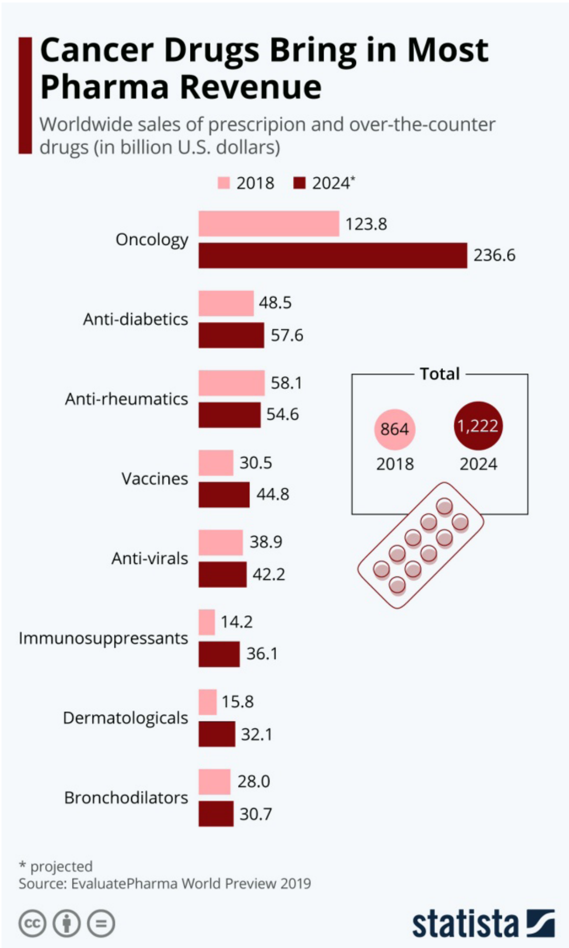

এ প্রসঙ্গে বিস্তারে যাবার আগে ক্যানসারের বায়োলজি নিয়ে অল্প কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এটুকু বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হবার কোন প্রয়োজন নেই। একটু খোলা চোখে ভালো করে দেখতে হবে, মন দিয়ে বুঝতে হবে শুধু।

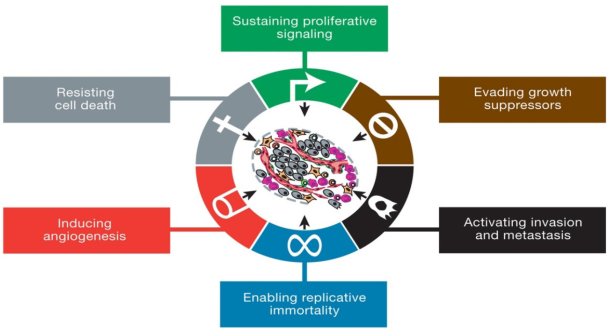

(Douglas A. Hanahan and Robert A. Weinberg, "Hallmarks of Cancer: The Next Generation", *Cell*, 4 March 2011, pp. 646-674)

উপরের ছবিতে একটি স্বাভাবিক কোষ কিভাবে ক্যানসার কোষে পরিণত হয় সেটা বুঝিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কার্যত একটি স্বাভাবিক কোষের নিয়মকানুন অনুযায়ী ক্যানসার কোষ এর কার্যকলাপ চালায়, যদিও সমস্ত কার্যকলাপকে নিজের মতো করে পরিবর্তিত করে নিয়ে। স্বাধীন সম্রাটের মতো এর বেঁচে থাকা। মোটের ওপরে ৬টি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে একটি ক্যানসার কোষে – (১) নিজেই নিজের বিভাজনের জন্য সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, স্বাভাবিক কোষের মতো বাইরের সিগন্যালের ওপরে নির্ভর করে না; (২) স্বাভাবিক কোষে যেমন বাইরের থেকে বৃদ্ধি আটকে দেবার সিগন্যাল এসে কাজ করতে পারে এক্ষেত্রে তা পারে না; (৩) সীমাহীনভাবে নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে যা একটি স্বাভাবিক কোষ পারে না; (৪) স্বাভাবিক কোষে programmed cell death বা বিধি-নিয়ন্ত্রিতভাবে মৃত্যু ঘটে (apoptosis), ক্যানসার কোষ একে নিখুঁতভাবে এড়িয়ে যেতে পারে; (৫) ধারাবাহিকভাবে নতুন রক্ত-সংবাহী নালী তৈরি করে চলে (angiogenesis), যা স্বাভাবিক কোষে প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত; এবং (৬) উৎপত্তিস্থল থেকে অনেক দূরে এর উপনিবেশ তৈরি করতে পারে যে ক্ষমতা স্বাভাবিক কোষের নেই। একে আমরা চিকিৎসার পরিভাষায় metastasis বলে থাকি। এবং এসব পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাঝে ঘটে, ঘটার পরে প্যাথলজি হয়।

এবার আমার পরের ছবিটি দেখে নিই।

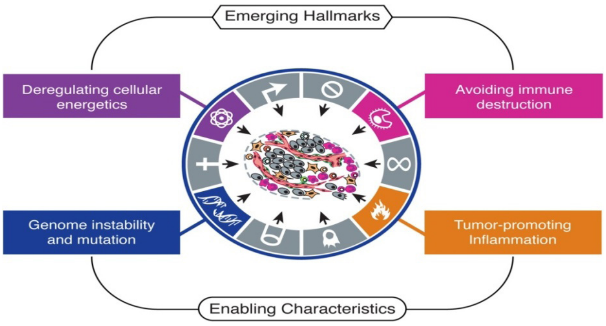

(Douglas A. Hanahan and Robert A. Weinberg, পূর্বোদ্ধৃত)

এখনো অবধি আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে স্তরে রয়েছে তাতে আমরা এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট অনুধাবন করতে পারিনি। বরঞ্চ বলা ভালো খুব-ই সামান্য একটি অংশকে বুঝে উঠতে পেরেছি, বা অদূর ভবিষ্যতে কতোদূর বুঝে উঠতে পারবো এ নিয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। এখনো অবধি আমরা প্রায় একেবারেই বুঝে উঠতে পারি নি যে মেটাস্টেসিস কিভাবে ঘটে, কখন বা কোন পর্যায়ে ঘটে এবং একে বোঝার মতো কোন মার্কার আছে কি না।

2 January, 2015 একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞানী মহলে মান্য পত্রিকা Science-এ। প্রবন্ধের শিরোনাম – "Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions"।

তর্কযোগ্যভাবে, প্রবন্ধের লেখকদ্বয় ক্রিস্টিয়ান তোমাসেত্তি এবং বার্ট ভোগেলস্টেইন দাবি করেছেন – "এসমস্ত দেখায় যে কোষে ক্যান্সার 'রিস্কের' মাত্র ১/৩ ভাগ আরোপ করা যায় পরিবেশগত প্রভাব বা জিনগত উত্তরাধিকার। অধিকাংশই "ব্যাড লাক"-এর জন্য – অর্থাৎ স্বাভাবিক ডিএনএ-র রেপ্লিকেশনের সময় জিনের এলোপাথারি মিউটেশনের জন্য। এ বিষয়টি কেবলমাত্র রোগটিকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নতুন স্ট্র্যাটেজি তৈরির জন্যও প্রয়োজনীয়।"

এখানে শেষ নয়। আরো সাম্প্রতিক সময়ে, ২৪শে মার্চ, ২০১৭, সায়ান্স পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল Genes, environment, and "bad luck" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ। গবেষকদের নাম Martin A. Nowak এবং Bartlomiej Waclaw। এ নিয়ে ২৪শে মার্চই *সায়েন্টিফিক আমেরিকান* পত্রিকায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হল - Most Cancer Cases Arise from "Bad Luck"। এ প্রবন্ধে জানানো হল, এতোদিন গবেষকেরা যে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ এবং জিনের গুরুত্ব ভেবেছেন ঘটনা সম্ভবত সেরকম নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জিনের মিউটেশন ক্যান্সারের জন্য দায়ী। তবে কার ক্ষেত্রে কিভাবে হবে তা আগাম বলা যাবেনা।

আমাদের এই বিশেষ রোগটি সম্পর্কে এত অসম্পূর্ণ বোধ সত্ত্বেও কোন কিছুর পরোয়া না করে তৈরি হয়েছে একটি পরিপূর্ণ বাণিজ্য জগৎ, ক্যানসারের জন্য একটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রভুত্বকারী বয়ান ও ভাষ্য, এক ভিন্ন ধরনের রাজনীতি – ক্যানসারের রাজনীতি।

অদ্ভুত ব্যাপার হল যে এতো কম জানা আর কোন রোগ নিয়ে এতো বেশি টাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর কোন রোগ নিয়ে হয় নি। এবং এ বাণিজ্যে শুধু অতি বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানি শুধু নয়, রাষ্ট্র-ও পূর্ণত জড়িয়ে পড়ে। ক্যানসার-এর চিকিৎসা, অভিমুখ ও নিত্য-নতুন বয়ান নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা বিভাজন বিভিন্ন সময়েই সুস্পষ্ট চেহারা নেয়।

কিন্তু ক্যানসার, আমরা পরে বারে বারে দেখবো, আমেরিকার নতুন মেডিক্যাল-ইন্ডাস্ট্রিয়াল hegemony তথা বিজ্ঞানের ও চিকিৎসার hegemony তৈরির একটি উৎপাদন যন্ত্রও বটে। মাইকেল কোলম্যান তাঁর "The war on cancer and the influence of the medical-industrial complex" (জার্নাল অব ক্যান্সার পলিসি, ২০১৩-তে প্রকাশিত) গবেষণাপত্রে ৭৭ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট (**A pan-European comparison regarding patient access to cancer drugs**) দেখিয়েছেন – "রিপোর্টটি সারভাইভাল বা জীবৎকালের হিসেবের ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং ভুল পদ্ধতি নিয়েছে। এর মধ্যে ১২টি দেশ রয়েছে যেগুলোতে কোন তথ্যেরই অস্তিত্ব নেই। এরপরে ১৯৯০ সালে ডায়াগনোসিস হওয়া জাতীয়ক্ষেত্রে রোগীর "সারভাইভাল"-কে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ২০০২ সালে যেসব ওষুধ পাওয়া যায় তার ফলাফলের সাথে (এ ওষুধগুলোর মধ্যে বেশ কিছুর লাইসেন্স ১৯৯০-এর দশকের পরে আর রিনিউ করাই হয়নি)।"

ইউরোপ ঘুরে আসার পরে এবং ওখানে ক্যানসার চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে দেখার পরে কার্ল ভেগতলিন (Carl Voegtlin) ১৯৩৭ সালের ৮-ই অক্টোবর এক চিঠিতে "comprehensive attack on the cancer problem which today does not exist anywhere in the world" অর্থাৎ "আজকের পৃথিবীতে কোথাও বিরাজ করে না ক্যানসারের বিরুদ্ধে এমন একটি সর্বাঙ্গীন আক্রমণ"-এর জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ফলে, বিশেষত ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে, আমেরিকা হয়ে উঠবে নেতা এবং "was to assume the world leadership in the field." (James T. Patterson, *The Dread Disease: Cancer and Modern American Culture*)

প্রসঙ্গত, প্রায় চার দশক আগে অসুস্থতা তথা ক্যানসার নিয়ে বলতে গিয়ে সুসান সনট্যাগ বলেছিলেন – অসুস্থতা জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক, ক্লেশদায়ী নাগরিকত্ব। যে মানুষই জন্মেছে সে দুধরনের নাগরিকত্ব রক্ষা করে – একটি সুস্থতার রাজত্ব, আরেকটি অসুস্থতার। (*Illness as Metaphor*, p. 3)

নাগরিকত্বের এই দ্বিত্বতা ভেবে দেখতে আমরা প্রায়শই ভুল করি। এবং, লক্ষণীয়ভাবে, ভুলে যাবার এ ছিদ্রপথ দিয়ে অনেক স্বাভাবিক ঘটনা (সে দেহ বা সমাজ যাই হোক না কেন) আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির যাদুদণ্ডে অ-স্বাভাবিক হয়ে ওঠে – ক্যানসার যার একটি প্রজ্জ্বলন্ত উদাহরণ। আরেকটি বিষয়ও আমরা ভেবে দেখবো – ক্যানসার একেবারে আধুনিক সময়ের রোগ, "আধুনিকতা"-র রোগ। এজন্য ক্যানসারের "citizenship"-এর ভাবনার সাথে লিঙ্গ-সম্পর্কের ভাবনা, নাগরিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ, রাষ্ট্র-NGO-প্রশাসন-বহুজাতিক কোম্পানি যোগসূত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অন্বিত হয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে প্রধানত রাষ্ট্রপন্থী একটি অবস্থান থেকে লেখা হলেও সিদ্ধার্থ মুখার্জির The Emperor of All Maladies গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রেখেছে। রাষ্ট্র-NGO-প্রশাসন যোগসূত্রের একটি পরিচিত আমেরিকান উদ্যোগ হল Jimmy Fund। ১৯৪৮ সালে Jimmy Fund ২৩১,০০০ ডলার তুলেছিলো লিউকেমিয়ার চিকিৎসা ও গবেষণার লক্ষে। ১৯৪৪-এ ম্যানহাট্টান প্রজেক্ট-এর শুধুমাত্র Oak Ridge কেন্দ্রে প্রতি মাসে খরচ করা হত ১০০ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৪৮ সালে কোকা কোলা খাবার জন্য আমেরিকানরা খরচ করেছে ১২৬ মিলিয়ন ডলার। এ প্রেক্ষিতে, সিদ্ধার্থ মুখার্জি জানাচ্ছেন, "the $231,000 raised by the Jimmy Fund was an impressive, but still modest sum." অর্থাৎ, ক্যানসারের বিরুদ্ধে "যুদ্ধে" ফ্রন্ট-লাইন ক্যাপ্টেন হয়ে ঐতিহাসিক আবির্ভাব ঘটতে শুরু করলো আমেরিকার রাষ্ট্র, প্রশাসন ও জনমতকে সাথী করে।

আমরা এবার ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৭১ সাল ও তার পরবর্তী সময়ের ক্যানসার গবেষণা ও এর ভৌগলিক বিস্তৃতি নিয়ে কথা বলবো। ১৯৪৫ সাল হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু আমেরিকার বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ১৯৪৫ সালের আরেকটি ভিন্ন গুরুত্ব আছে। আমাদের আলোচনার জন্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের চেয়েও বেশি জরুরি কিভাবে আমেরিকার বিজ্ঞান চর্চার নতুন অভিমুখ নির্ধারিত হল এসময়ে সেটা বোঝা। এখানে প্রসঙ্গত বলা যায়, আমেরিকান সার্জন হ্যালস্টেড-এর রোগীর পক্ষে ভয়াবহ radical mastectomy প্রায় ৭০ বছর ধরে ব্রেস্ট ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রায় একমাত্র চিকিৎসা হিসেবে রাজকীয়ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। এর একটা সম্ভাব্য বোধগম্য কারণ হতে পারে, ইউরোপের হাতে তত্ত্ব থাকলেও আমেরিকার আছে নিখুঁত টেকনিক বা সার্জারি – একে প্রতিষ্ঠা করা। ফলে ক্যানসার গবেষণার তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ইউরোপ এগিয়ে আছে এ ধরনের বোধকে প্রতিহত করা যেতে পারে। ১৯৮৩ সালে, একটি গবেষণা পত্রে হ্যালস্টেড-এর radical mastectomy নিয়ে আলোচনা হয়েছে (William A. Maddox et al, "A randomized prospective trial of radical (Halsted) mastectomy versus modified radical mastectomy in 311 breast cancer patients", *Annals of Surgery* 1983 Aug; 198 (2): 207-12)।

এই গবেষণা পত্রে ৩১১টি সার্জিকাল কেস বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে radical mastectomy-র ফলে ক্যানসারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে আদৌ কোন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, radical mastectomy কিংবা ভিন্নতর কোন সার্জিকাল চিকিৎসার মাঝে ফলাফলের দিক থেকে কার্যত কোন পার্থক্য নেই। ১৯৮৫-র এক গবেষণাপত্রে জন কেয়ার্ন্স জানিয়েছিলেন সার্জারিতে সাফল্যের হার ৫০%-এরও কম।

(John Cairns, "The Treatment of Diseases and the War against Cancer", *Science* Nov. 1985, 253 (5): 51-59)

১৯৪৫ সালে আমেরিকার অফিস অব দ্য রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর অধিকর্তা ভ্যানেভার বুশ (Vannevar Bush) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি রিপোর্ট জমা দিলেন – **Science: The Endless Frontier**—এই রিপোর্টে তিনি জানালেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধবাজ সৈনিকদের মৃত্যু হার ছিলো প্রতি হাজারে ১৪.১, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে হার কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ০.৬ জন। ফলে বুশের মতে ১৯৪৫ সাল হচ্ছে সে সময় যখন "The War Against Disease" ঘোষণা করতে হবে। বুশের বয়ানে, "যুদ্ধের সময়ে মেডিসিনের নজরকাড়া অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে কারণ বিজ্ঞানের অসংখ্য জগতে বিপুল পরিমাণে মৌলিক গবেষণাকর্ম যুদ্ধের আগেই ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে আমাদের কাছে ছিল।" (*Science: The Endless Frontier*, p. 13. নজরটান আমার)

এই রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য অংশটি হল, ২য় বিশ্বযুদ্ধের আগে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জগতে যে জ্ঞান ও তথ্য পুঞ্জীভূত হয়েছে তার ফসল মিলেছে যুদ্ধবাজ সৈনিকদের মৃত্যুহার কমার মধ্যে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা বায়োলজির জগতে প্রায় সমস্ত মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছিলো ইউরোপীয় ভূখন্ডে। একের পরে এক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমে *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*-এর ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে বিশেষ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিলো – Two Hundred Years of Cancer Research – সেখান থেকে উল্লেখ করি, তথ্য হিসেবে একটু ওজনদার হবে। ১৮৬৩ সালে জার্মান বিজ্ঞানী Rudolf Virchow আবিষ্কার করলেন ক্যানসার কোন "ব্ল্যাক হিউমার" বা "কালো পিত্ত" থেকে হয় না, হয় কোষ থেকে (cellular origin of cancer);

১৮৬৯ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ও প্যাথলজিস্ট স্টিফেন প্যাজেট প্রথম সূত্রায়িত করলেন "seed and soil" তত্ত্ব অর্থাৎ এক জায়গার ক্যানসারের বীজ আমাদের চিকিৎসার তোয়াক্কা না করে ছড়িয়ে পড়ে দূরের মাটিতে তথা অন্য কোন দেহাংশে এবং এর ফলে রোগটির মেটাস্টেসিস ঘটে;

১৮৯৫ সালে জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী রন্টজেন আবিষ্কার করলেন এক্স-রে;

১৯১৪ সালে আরেকজন জার্মান জীববিজ্ঞানী থিওডর বোভেরি আবিষ্কার করলেন যে ক্যানসারের উদ্ভবের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের মিউটেশন বা বিশেষ ধরণের রূপান্তর ঘটে। থিওডোর বোভেরির ৮৪ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ গবেষণা পত্রের শিরোনাম ছিলো – **Concerning the Origin of Malignant Tumour**. এছাড়াও এখন যাকে কেমোথেরাপি বলে তারও প্রাথমিক প্রয়োগ এবং সুত্রায়ন হয়েছিলো জার্মানিতে পল আরলিখ (Paul Ehrlich)-এর হাত ধরে।

১৯৩০-এর দশকের পর থেকে ইউরোপে একদিকে বিরাট মন্দা বা Great Depression ও হিটলারের অভ্যুত্থান, অন্য দিকে ২য় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সামাজিক অভিঘাতের ফলে ইউরোপের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ মেধারা আমেরিকার আপাতঃ-শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও ল্যাবরেটরি গবেষণার জগতে প্রবেশ করলেন। আমেরিকার New Deal অর্থনীতিও এসময়ের রাষ্ট্রিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে। এবং এসময় দিয়েই আমেরিকায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিলো, যদিও মৌলিক পরমাণু বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিলো ইউরোপের মাটিতে।

এ প্রেক্ষিতে ঠান্ডা মাথায় ভাবলে ঐতিহাসিক হিসেব-নিকেশ কি দাঁড়াবে? আমেরিকার কাছে রইলো মেধার নক্ষত্রপুঞ্জ, অপরিমেয় অর্থ, নিজের ভূখন্ডে একটিও যুদ্ধ ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় হয় নি বলে সামাজিকভাবে অনেক বেশি সুস্থিত অবস্থা, সাম্রাজ্যবাদের নতুন অধীশ্বর হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে হিটলারের গণতান্ত্রিক মুখ এবং রেপ্লিকা হিসেবে সাম্রাজ্য বিস্তার করা, এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের নতুন ধরন যত না সামরিক তার চাইতে বেশি অর্থনৈতিক। বিজ্ঞানের দিক থেকে ভাবলে এদের কাছে থাকলো উন্নত প্রযুক্তি, কিন্তু নতুন তত্ত্ব প্রায় নেই বললেই চলে।

অথচ ক্যানসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অসুখ হিসেবে উঠে এসেছে ১৯৩০-এর দশক থেকেই। খোদ প্রেসিডেন্টের (ফোর্ড) স্ত্রী আক্রান্ত হচ্ছেন ব্রেস্ট ক্যানসারে। ১৯৩৭-এ তৈরি হয়েছে National Cancer Institute (NCI)। আমরা আগে যে বিষয়টি বলেছি – আমেরিকা কিভাবে বিশেষত ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই-এ আন্তর্জাতিকভাবে নেতৃত্বে এলো – সেটা আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা সেসময়ের সংবাদপত্রগুলোর দিকে একটু চোখ বোলাই।

তিনটি তৎকালীন বিখ্যাত সংবাদপত্র ছিলো *Time*, *Life* এবং *Fortune*। *Time*-এর সার্কুলেশন ছিলো ৬,১৬,০০০; *Life*-এর ৮০০,০০০ এবং Fortune-এর ১,৪৮,০০০। সবমিলিয়ে প্রায় ১৬ লক্ষ সংখ্যা বিভিন্ন স্বরে ও ভঙ্গীতে একটিমাত্র বিষয় নিয়ে লিখতে ও জনমত তৈরি করতে শুরু করলো। *Fortune* (মার্চ ১৯৩৭) লিখলো – "Cancer: The Great Darkness", *Life* (মার্চ ১, ১৯৩৭) লিখলো – U.S. Science Wars Against An Unknown Enemy: Cancer", Time (মার্চ ২৩, ১৯৩৭) লিখলো – "Medicine: Millions for Cancer"। *Fortune* পত্রিকার প্রবন্ধেটিতে ("Cancer: The Great Darkness") নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিলো ক্যানসার যতোটা মেডিসিনের ততোটাই রাজনীতির।

অর্থাৎ সবমিলিয়ে এটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমেরিকার নেতৃত্বে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা অসুখ ক্যানসার নিয়ে collective consciousness তথা সামগ্রিক সচেতনতা তৈরির চেষ্টা পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়ে গেলো। উল্লেখযোগ্য হল, এ ক্ষেত্রে সংবাদ ও অন্যান্য মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করলো। ২০০৪ সালের একটি হিসেব বলে, আমেরিকার ওপরের দিকের ৫টি নিউজ নেটওয়ার্ক বিজ্ঞাপনের জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বছরে ৫.১ বিলিয়ন ডলার পায়

(Sharon Batt, "Limits on Autonomy: Political Meta-Narratives and Health Stories in the Media", *American Journal of Bioethics*, 16 August 2007)।

এবার বলুন, এ সমস্ত সংবাদপত্র ও অন্যান্য মিডিয়া ওষুধ সংক্রান্ত বিষয়ে কাদের পক্ষে এবং কিভাবে লিখতে পারে?

এর সাথে যুক্ত করতে হবে বিপুল পারমাণবিক কর্মকান্ডের অনুসারী হিসেবে যে সমস্ত ভয়ংকর ব্যয়-সাপেক্ষ অতি উন্নত প্রযুক্তি (যেমন সাইক্লোট্রোন, সি টি স্ক্যানার বা নিউক্লিয়ার অ্যাক্সিলারেটর) আমেরিকার হাতে এসে পড়েছে সেগুলোকে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করা না যায় তাহলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ধনে প্রাণে মারা পড়বে। এজন্য এমন একটি "হাই-টেক" রোগের সন্ধান ও বিপণন ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো যা এ সমস্ত চাহিদাগুলোকে একসাথে মেটাতে পারে।

এবং ক্যানসার হল সেই বিশেষ রোগ যার সঙ্গে আমেরিকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্তা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। আবার এ রোগকে দেহের মাঝে দেহের গোড়ার নিয়ম মেনে চলা "অপর" হিসেবে দেখলেও চলবে না, যেমনটা চলে না গুয়ান্তানামো বে-র বন্দীদের ক্ষেত্রে। দেহের "অপর"কে মানিয়ে নেবার কোন প্রশ্ন উচ্চারণ করা অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ, এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ই ঘোষণা (War Against Cancer) করতে হবে। এমন কি ক্যানসার গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক সমাজ নিয়ে লেখা বিজ্ঞানীদের লেখা প্রবন্ধেও "Making better rifles and bullets"-এর মতো প্রসঙ্গ ক্রমাগত স্থান পেতে থাকলো (Seymour S. Cohen, "Cancer Research and the Scientific Community", *Science*, 18 June 1971)

বায়োলজির জগতে আক্রমণ ও যুদ্ধের মেটাফর উৎপাদন করা তো শুরুই হয়ে গিয়েছিলো ১৯শ শতকের শেষভাগ থেকে (দ্রষ্টব্যঃ Laura Otis, *Membranes: Metaphors of Invasion in Nineteenth-Century literature, Science and Politics*) এখানে আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে ২য় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ভয়ঙ্কর মাস্টার্ড গ্যাস বাচ্চাদের লিউকেমিয়ার এবং লিম্ফোমার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করেছিলেন দুজন বিজ্ঞানী, যাঁদের লেখা ফার্মাকোলজির পাঠ্যপুস্তক ডাক্তারি ছাত্রমাত্রেই জানে – গুডম্যান এবং গিলম্যান। এ বিষয়ে ১৯৪৮ সালে নেচার পত্রিকায় গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল – Effects upon tumours of Various Haloalkylarylamines। ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রযুক্তি হল কোবাল্ট-৬০ রেডিওথেরাপি – একেবারেই পারমাণবিক প্রযুক্তির উপজাত।

কৌতুকপ্রদ হল ইউনিভের্সিটি অব টরোন্টো ম্যাগাজিনের ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭-তে প্রকাশিত একটি মূল প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল – "This "Bomber" Actually Saved Countless Lives"। কানাডার নামী চিকিৎসক হ্যারল্ড জোনস প্রথম কোবাল্ট দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। লেখা হল – "কোবাল্ট বোমা"-র (যা একটি নিউক্লীয় তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহারের প্রযুক্তি) আবিষ্কারক ডঃ জোনস জরায়ু মুখ, মূত্রথলি এবং প্রোস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটালেন। পৃথিবী জুড়ে কোবাল্ট-৬০ থেরাপির সাহায্যে লক্ষকোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'' আরো মজার যে কোবাল্ট থেরাপি দেবার সময় ডঃ জোনসের নিজের মনে হত যেন ইউ-২ বোমারু বিমানের ককপিটে বসে আছেন। ক্যান্সার নিয়ে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন মেটাফরই বুঝি তৈরি হয়নি!

এ পটভূমিতে ২২শে জানুয়ারি ১৯৭১ সালে ক্যানসারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের সে ঐতিহাসিক ঘোষণা করলেন নিক্সন – "The time has come when the same kind of concentrated *effort* that *split* the atom and took man to the moon should be turned towards *conquering* this dread disease. Let us make a total national commitment to achieve this goal." অর্থাৎ "সে পরম মুহূর্ত সমাগত যখন যে ধরনের সংহত প্রচেষ্টা পরমাণুর কেন্দ্রের বিভাজন ঘটিয়েছে বা মানুষকে চাঁদে পাঠিয়েছে সে সমস্ত প্রচেষ্টার গতিমুখ এবার নির্দিষ্ট করতে হবে এই ভয়ঙ্কর রোগের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্য। চলুন, এ লক্ষ্যে সফল হবার জন্য সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীন জাতীয় অঙ্গীকার করি আমরা।" (নজরটান আমার)। এবং এর জন্য প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছিলো ১০০ মিলিয়ন ডলার।

এর আগে Science: The Endless Frontier-এর ১৯৬০ সালের সংস্করণে অ্যালান ওয়াটারম্যান জানিয়েছিলেন আমেরিকার বিজ্ঞান চর্চা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে কোরিয়ার যুদ্ধ, "ঠান্ডা যুদ্ধ", মিসাইল ও উপগ্রহের প্রতিযোগিতা, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ এবং দ্রুত ধাবমান মহাকাশ গবেষণা-র দ্বারা। অত্যন্ত প্রাঞ্জল স্বীকারোক্তি। আমেরিকার বিজ্ঞান চর্চার leit motif খুব স্পষ্ট হয়ে যায়। এটা নয় যে আগের থেকে সামগ্রিক চিত্রের খুব কিছু উন্নতি হয়েছিলো এরকম উল্লসিত অবস্থার দিকে মোড় ঘুরলো, বরঞ্চ এটা বলা ভালো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকার মনোভাব অনেক বেশি আশাবাদী ছিলো।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ব্যাপারে জনতার চালু বিশ্বাস এতটাই গভীর ছিলো যে চিন্তা-সমৃদ্ধ বিরুদ্ধ মতামত বা সংশয়বার্তা কিংবা সতর্কবাণী পূর্ণত নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিলো। "The turn to cheer was not because the picture was improving. Rather, the mood of post-war America was optimistic. Popular belief in technology and scientific progress overwhelmed thoughtful counter-messages based in scepticism and caution." (Sharon Batt, *Patient No More: The Politics of Braest Cancer*, 1994)

এ মানসিকতার একটি নমুনা হল যখন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ১,২৫০,০০০ ভোল্টের এক্স-রে মেশিন বসেছে, পূর্বোক্ত *Life* পত্রিকা জানালো এটা ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে "biggest gun in the war"। সাইক্লোট্রন-এর আবিষ্কর্তা আর্নেস্ট লরেন্স জানালেন যে ক্যানসার কোষের ওপরে বোমা মারার ক্ষেত্রে সাইক্লোট্রন দিয়ে পাঠানো তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু অনেক ভালো কাজ করবে।

(Fitzhugh Mullan, *Vital Signs: A Young Doctor's Struggle with Cancer*, 1983)

যে কোন সাধারণ শিক্ষিত মানুষের ভয় লাগবে! সেল বায়োলজির এখনো অব্দি সামান্য বুঝে ক্রমাগত দেহের অভ্যন্তরকে তালিবানি কায়দায় অথবা ইরাকি বা গাজার মানুষদের মতো নির্বিচারে আক্রমণ করে যাওয়া ক্যানসার মেডিসিন বা অঙ্কোলজি-র একমাত্র লক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। ১৯৭৫ সাল নাগাদ ভিয়েতনাম যুদ্ধের মেটাফর প্রবেশ করতে শুরু করলো ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোঝাতে গিয়ে – the war in cancer is a medical Vietnam (Patterson, *The Dread Disease*, p. 252).

"Hallmarks of Cancer" গবেষণা পত্রের লেখক বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডগলাস হানাহান (যাঁকে আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই উদ্ধৃত করেছি) ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জানাচ্ছেন – "অধিকাংশ লক্ষ্য–নির্দিষ্ট চিকিৎসা নিতান্ত সাময়িকভাবে কার্যকরী; প্রাথমিক কিছু ক্ষয়-ক্ষতি সামলে নিয়ে ক্যানসার নিজেকে নতুন চিকিৎসার সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিংবা চিকিৎসাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারে। ফলে নতুন জীবনীশক্তি নিয়ে রোগের অগ্রগতি পুনরুজ্জীবিত হয়"। সুইৎজারল্যান্ড-এর লুগানো-তে ২০১২-র শেষভাগে World Oncology Forum-এর সম্মেলন হয়েছিলো। সে সম্মেলনে ৪০ বছর ধরে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লাগাতার যুদ্ধ ঘোষণার পরে প্রশ্ন উঠেছিলো "Are we winning"? সাধারণভাবে সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত জবাব ছিলো – **NO**. (Hanahan, "Rethinking the war on cancer", Lancet, 2014)।

এরকমটাই হবার কথা ছিলো। আমেরিকার দম্ভ, আধুনিক হিটলারের ধরনে অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, চেতনায় ও social psyche-র জগতে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তকে দখল করার উদগ্র বাসনা ও ইতিহাসের একমাত্র চালিকা শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অত্যুগ্র বাসনা অনিবার্যভাবে এ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। ১৯৭৯ সালেই আমেরিকার NCI-এর একদল প্রথম সারির বিজ্ঞানী পরম খেদ নিয়ে বলেছিলেন – আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিজের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারে অতি-আত্মবিশ্বাসী একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামরিক এবং চিকিৎসার জগতে আপন নেতৃত্ব হারানোর ভয় ও হতাশাবোধ একটি লাগামহীন খরচের যুগের জন্ম দিল। এ যুগ হয়ে উঠলো ক্যানসারের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত চিন্তার দৈন্য এবং চিন্তাহীন পরিকল্পনার একটি যুগ। (The era of lavish spending, born out of the affluence of a society overconfident of its economic power and spurred by the sheer desperation and fear of losing political, military, and medical world leadership, has been an era bare of rational thinking and planning in matters of human cancer.) (Patterson, *The Dread Disease*, 1987, p. 253, নজরটান আমার।)

আরেকটা তথ্য এখানে প্রাসঙ্গিক। ১৯৮০-র দশকে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের ক্যানসারকে আগাম নির্ণয় ও চিকিৎসা করার জন্য যত সংখ্যক কেন্দ্র ছিলো, রাশিয়ায় তার চেয়ে অনেক বেশি ক্যানসার কেন্দ্র ছিলো। রোজ কুশনার আমেরিকায় ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাডভাইসরি সেন্টার-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বই Breast Cancer: A Personal History and Investigative Report এবং তিনি নিজেও ব্রেস্ট ক্যানসারের রোগী ছিলেন, যেমন ছিলেন Silent Spring-এর সুবিদিত লেখিকা র‍্যাচেল কারসন। রোজ কুশনার তাঁর আমেরিকান চিকিৎসকের কাছে রাশিয়ার প্রতিতুলনায় আমেরিকার অবস্থা নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন। চিকিৎসক ছেলেটি প্রত্যুত্তরে অট্টহাস্যে জানিয়েছিলো অন্য দেশের বিশেষত্ব নিয়ে সে আদৌ ভাবিত নয়। তার সংক্ষিপ্ত জবাব ছিলো – আমাদের আমেরিকায় যা আছে সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই (What we have in the United States is the best. No question)। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই হল এলেন লিওপোল্ড-এর *A Darker Ribbon: Breast Cancer, Women, and the Doctors in the Twentieth Century*।

আমেরিকান দম্ভের এর চেয়ে ভালো প্রকাশ আর কি হতে পারে! কুশনার মন্তব্য করছেন – "Perhaps we do not have enough oncologists in the United States to handle all our cancer patients." (Ibid, p. 335)

"সে বড়ো সুখের দিন" নয়

১৯৭৫ সালেই মেডিক্যাল সাংবাদিক ড্যানিয়েল গ্রীনবার্গ জানালেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতোই ক্যানসারের যুদ্ধে হেরে যাওয়াকে ক্রমাগত আড়াল করা চলছে – It's like Vietnam. Only when the public realized that things were going badly did pressure build to get out. তিনি আরো জানালেন, ১৯৭৩ সালে বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানী লাইনাস পাওলিং (Linus Pauling) NCI-এর কাছে প্রস্তাব রাখেন যে ক্যানসার গবেষণার জন্য বরাদ্দ টাকার একটি ছোট অংশ যেন "unconventional research"-এর জন্য বরাদ্দ রাখা। তাঁর প্রস্তাবে কেউ কর্ণপাত করে নি।

আরেকটি মনোযোগ দেবার মতো ঘটনা হল, সে সময়ে ক্যালিফরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের James Enstrom জানিয়েছিলেন খ্রীস্টানদের এক বিশেষ সম্প্রদায় "Mormon"-দের মাঝে নিজস্ব ধর্মীয় রীতি অনুসারী জীবনযাত্রার জন্য ক্যানসার-জনিত মৃত্যু হার লক্ষণীয়ভাবে কম। এ নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য এন্স্ট্রম কিছু অর্থ সংস্থান চেয়েছিলেন। সে প্রস্তাবও তৎক্ষণাৎ নাকচ হয়। গ্রীনবার্গ-এর মনে হয়েছিলো যে এর কারণ হল গোঁড়ামো এবং "The Closed Mind of Medicine". (Daniel S. Greenberg, "Cancer: Now, the Bad News", Outlook, *Washington Post*, January 19, 1975)

১৯৭৬ সালে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি প্রকাশ করলো – The Hopeful Side of Cancer। এর প্রথম বাক্যটি ছিলো –

Cancer is one of the most curable diseases in this country। অথচ এর এক বছর আগে গ্রীনবার্গ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন ৭৮% ক্যানসারের ক্ষেত্রে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, এবং সর্বোপরি, National Cancer Act, 1971 একটি এক-মাত্রিক আমলাতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। এদের ভিন্নতর কোন ভাবনা নেই, এরা ক্যানসারের সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। (Greenberg, "Progress" in Cancer Research – Don't Say It Isn't So", *New England Journal of Medicine*, March 27, 1975)

ক্যানসারের চিকিৎসার নতুন নতুন ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নিয়ে হাড় হিম করা সব তথ্য আছে গবেষকদের সংগ্রহে। Non-small-cell lung cancer-এর জন্য "আবিষ্কৃত" ওষুধ Geftinib (ব্র্যান্ড নাম Iressa) হল অতি বৃহৎ ওষুধ কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকা (AstraZeneca)-র আবিষ্কার। কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয় এ ওষুধ দিয়ে। কিন্তু অসহায় রোগীর অর্থ ধ্বংস ছাড়া শেষ অব্দি আর কিছু হয় কি এ ওষুধে? হয়তো দেখা গেলো ৬ মাস বেঁচেছে। এ ওষুধটি ছাড়া বাঁচতো না, একথা কে জোর দিয়ে বলবে? চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান স্তরে একথা দায়িত্ব নিয়ে বলার মতো সময় আসে নি এখনো। সেরকম কোন নির্ভরযোগ্য trial report নেই। এ ওষুধটির Phase I Trial-এ আমেরিকায় যেসব মানুষ অর্থহীন, ইন্সিউরেন্স-এর সমস্ত সুযোগ-সুবিধে শূন্য এবং চালচুলোহীন, বিশেষ করে মেক্সিকো ও লাতিন আমেরিকার, বুভুক্ষু মানুষকে "paid volunteers" হিসেবে নেওয়া হয়। এদের দৈনিক রোজগার ২০০ থেকে ৪০০ ডলার। এরা এতেই পরম খুশি। অতি বৃহৎ ওষুধ কোম্পানিও খুশি এতো কম পয়সায় কাজটি করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, Ben Goldacre, **Bad Pharma** এবং Jill Fisher, **Medical Research for Hire**.

নতুন ওষুধ নিয়ে যেসব গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় তার মধ্যে মাত্র ১৫%-কে পাথুরে প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়। বাকিরা ভুষি মাল। (Richard Smith, "Where is the wisdom … ? The poverty of medical evidence", British Medical Journal, 5 October 1981) স্মিথ প্রশ্ন করছেন – What could be worse than two millennia spent making life and death decisions with inadequate information? এতো অপর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় করার চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে?

আমাদের কাছে কোন উত্তর নেই! Reuters-এর খবর অনুযায়ী, এ তথ্যটুকু আছে যে এরকম অসম্পূর্ণ তথ্য নিয়েও ২০০4 সালে ৭২ বিলিয়ন ডলারের আন্তর্জাতিক ব্যবসা করা যায় (Sharon Bigley, "Is high spending on cancer care 'worth it'?, *Reuters*, April 9 2012)

১৯৮৬ সালে জন বালিয়ার দেখিয়েছিলেন মিডিয়া এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচুর আওয়াজ সত্ত্বেও ক্যানসারে মৃত্যুর হার না কমে বরঞ্চ ১৯৬২ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে বেড়েছে। (John C. Baliar III and Elaine M. Smith, "Progress Against Cancer?", *New England Journal of Medicine*, May 8, 1986)

১৯৯৭ সালে একই গবেষক আরেকটি গবেষণা পত্র লিখলেন – "Cancer Undefeated" (New England Journal of Medicine, May 29, 1997) এক কথায় জানালেন – এটা পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যা দীর্ঘ ৪০ বছরের চিকিৎসা-কেন্দ্রিক ক্যান্সার রিসার্চের পরেও দীর্ঘকালীন এবং ধীরে অগ্রসরমান মৃত্যুহারকে বিপরীত দিকে নিতে পারেনি।" অস্যার্থ, দুঃখজনকভাবে, অন্যান্য চিকিৎসার সাথে তুলনা করলে ক্যানসার চিকিৎসার গবেষণায় ব্যর্থতার হার সবচেয়ে বেশি। এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে কম-বেশি ৪০ বছর ধরে ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ চিকিৎসা-কেন্দ্রিক গবেষণা মৃত্যুর পরিসংখ্যানে সুদীর্ঘ অথচ ধীর বৃদ্ধিকে বিপরীতমুখী করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এরকম স্বল্প সাফল্যের হার গ্রহণযোগ্য নয় এবং হালেও পানি পায় না। উল্লেখযোগ্য হল এ গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে ক্লিনিকাল মেডিসিনের জগতে অতি মান্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ।

Nature-এর মতো পত্রিকায় ক্লিনিকাল ট্রায়াল নিয়ে মন্তব্য করা হচ্ছে - "Sadly, clinical trials in oncology have the highest failure rate compared with other therapeutic areas … However, this low success rate is not sustainable or acceptable…" গবেষকেরা দেখেছেন – There must be more opportunities to present negative data. এ রকম হলে ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলো আদৌ কতোটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে তার একটা অনুমান করা যায়। ওষুধ কোম্পানিগুলো কেবলমাত্র এদের প্রয়োজনে positive data হাজির করে। এর কারণ হল – যে কোন চিকিৎসার কেন্দ্রে থাকে মানুষ। (**patients are at the centre of all these efforts**.) মানুষ না থাকলে মেডিসিনের কোন প্রয়োজন পড়তো না। (C. Glenn Begley and Lee M. Ellis, "Raise standards for preclinical cancer research", *Nature*, 29 March 2012)

British Medical Journal-এর গবেষণাপত্রে দেখানো হচ্ছে কিভাবে কর্তিত (truncated) ট্রায়ালকে FDA-র কাছ থেকে লাইসেন্স বের করার কাজে লাগানো হচ্ছে। একটি নতুন ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি Bevacizumab-এর ব্যবসার পরিমাণ বছরে ২৭০ কোটি ডলার। এ জন্য FDA-র নিয়মকানুন কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করাও হয়েছে। (J P A Ioannidis et al, "The need to consider the wider agenda in systematic reviews and meta analyses", *BMJ*, 13 September 2010) এমন কি ২,০৪৭টি গবেষণাপত্রকে ছাপা হয়ে যাবার পরে তুলে নেওয়া হয়েছে। খুব খোলাখুলি এ প্রশ্নও উঠে আসছে ("Stopping a trial early in oncology: for patients or for industry?", F. Toria et al, *Annals of Oncology*, 27 February 2008)

যে কোন চিকিৎসার কেন্দ্রের মতো যে কোন মুনাফার কেন্দ্রে, যে কোন আধিপত্যের কেন্দ্রে এবং যে কোন অর্থপূর্ণ সম্পর্কের কেন্দ্রে

আছে মানুষ। প্রতিটি সংস্কৃতিতে তার নিজস্ব ধরনে রোগের যন্ত্রণা, বেদনা এবং, পরবর্তীতে, মৃত্যুকে সওয়ার ও ধারণ করার ক্ষমতা আছে। বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিস্তীর্ণ জনজীবনে এটা বাস্তব ও সত্যি, এটাই resilience of society – সমাজের প্রতিঘাত সহ্য করার ক্ষমতা। এরকম এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও চেতনার জীবনসম্ভারে বহু ক্ষেত্রেই রোগী ও চিকিৎসকের মাঝে একটি inter-subjective ঐক্য জন্ম নেয়। আর্থার ক্লিনম্যান দেখেন – একটি অর্থনৈতিক লেনদেনের বিষয় হিসেবে চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ককে পণ্যায়িত করে তোলা এ সম্পর্কের কোন পরিমাণগত বৃদ্ধি বোঝায় না। এ সম্পর্কের একদিকে আছে চিকিৎসকের মানবী দান, আর অন্যদিকে রোগীর। (The commodization of the healer-sick relationship as an economic transaction cannot quantify this aspect of relationship … It is rather healer's gift as well as that of the patient. – Arthur Kleinman, *The Illness Narrative*)

বিশেষ করে ক্যানসারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চিকিৎসার আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যে ও অবাধ মুক্তপুঁজির দুনিয়ায় এই ব্যক্তি-ব্যক্তি ঐক্য ক্রমাগত ভেঙ্গে পড়তে থাকে। স্তন ক্যানসারে মৃত্যুর কিছুদিন আগে কুশনার লিখেছিলেন যে ক্যানসারে গুরুতর জীবন-সংকট উপস্থিত না হলে আমেরিকাতে খুব কম চিকিৎসক-ই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামান। এখন এটা ভারত বা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্যি। এর পেছনের একটি বোধগম্য কারণ হল গত ২০-২৫ বছরে আমাদের নিজস্ব পড়শি-নির্ভরতার সামাজিক জীবনে একটি anamorphic *(অস্তিত্বের মূল থেকে পরিবর্তনের মতো)* রূপান্তর ঘটেছে।

রোগি হিসেবে কুশনারের উপলব্ধি ছিলো – Most of the time, oncologists do not even see their patients during regular, routine appointments. In the United States, baldness, nausea and vomiting, diarrhea, clogged veins, financial problems, broken marriages, disturbed children, loss of libido, loss of self-esteem, and body image are nurses' turf. (Kushner, "Is the aggressive Adjuvant Chemotherapy the Halsted Radical of '80s?". Cancer Journal of Clinicians, November 1984)

সমস্ত চিকিৎসার পরে ধনে-প্রাণে সর্বস্বান্ত, বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফার উদগ্র বাসনা ও আমাদের ডাক্তারির সার্জারি-কেমোথেরাপি-রেডিওথেরাপির ফলে zombie বা প্রায় প্রেতাত্মার মতো চেহারা নেওয়া একজন মানুষকে দেখে যে কোন বিবেকী চিকিৎসকের মনে প্রশ্ন উঠবে – এ পরিণতি কি এতো আবশ্যিক ছিলো? প্রায় কোন গবেষণাপত্রেই এখনো অবধি নিশ্চিতভাবে ক্যানসার চিকিৎসায় নিরাময়ের কথা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় নি। অথচ ক্ষমতার দম্ভে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ৪৩ বছর হয়ে গেলো।

আনন্দের কথা cell biology এবং জিন গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। যেমন recombinant DNA technology, অনেক নতুন বায়ো-মার্কার, transducer ও signaling pathway সম্পর্কে অজস্র নতুন পথ খুলে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে মানুষের বেঁচে থাকাকে অনেক স্বাভাবিক করে তুলবে। কিন্তু ক্যানসার একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত – আমাদের দেহে বাস করা আমাদের "অপর"। গোলাগুলি ছুঁড়ে, যুদ্ধ ঘোষণা করে একে থামানো যাবে না।

১৪ নভেম্বর, ২০১৩ সালে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ Dead Man Walking-এ টমি ডেভিস নামে এক ক্যান্সার রোগীর বর্ণনা আছে। ইন্সিউরেন্সহীন এই মানুষটি তার সর্বস্ব খুইয়েছে ক্যান্সারের অর্ধসমাপ্ত চিকিৎসার জন্য। শেষ অব্দি একটি zombie বা জীবন্ত লাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার চিকিৎসকদের প্রতিক্রিয়া – "After hearing this story, we were neither shocked nor saddened nor disheartened. We were simply appalled."

আমার প্রবন্ধে বেশি জোর দিয়েছি ক্যান্সারের রাজনীতি, গড়ে-তোলা সংস্কৃতি এবং ক্যান্সার নিয়ে কর্পোরেট পুঁজির আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং একে নিয়ে গড়ে ওঠা মেডিক্যাল-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ওপরে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যে বিজ্ঞানীরা নিরলস পরিশ্রম করে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির জন্ম দিচ্ছেন এবং যার ফলে বহু ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব কিংবা আয়ুষ্কাল বাস্তবিক অর্থেই বাড়িয়ে তোলা যায় তাঁরা মানুষের অনিঃশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যদি বাইরের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যদি আগাম বোঝা যায়, যদি মানুষকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে না দেখে চিকিৎসা করা যায় তাহলে ক্যান্সার-আক্রান্ত হবার পরেও একটি পরিসর তৈরি হতে পারে যেখানে রোগটিকে শান্তভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং মেনে নেওয়া যায়। তাহলে আমাদের জীবন অনেক সহনীয় হয়ে উঠবে। আমরা প্রাণী বলেই মারা যাবো, কিন্তু বর্তমান চিকিৎসার জগত থেকে হারিয়ে যাওয়া sufferings ও pain-কে বোঝার মানসিক জগতকে আমাদের চিকিৎসকদের নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে – অনেকটা "আরোগ্য-নিকেতন"-এর জীবন মশাই (কবিরাজ জীবনবন্ধু দত্ত)-এর মতো।

১৯৮৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ডঃ বার্নার্ড লোন (Bernard Lown) একটি প্রবন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন – Doctor as scientist, healer, magician, business entrepreneur, small shopkeeper, or assembly line worker — which is it? (Doctor as scientist, healer, magician, business entrepreneur, small shopkeeper, or assembly line worker — which is it? – Essay 30)

আমাদের এ উত্তর দিতে হবে। কাজটি শক্ত, কিন্তু পারতে হবে একজন মানুষ ও চিকিৎসক হিসেবে একজন রোগীর জীবনে ও অস্তিত্বে প্রভাতী হাসি দেখার জন্য! এ পথে একদিন পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে যে!

সমাজে নারী : চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

নারী-পুরুষের তীব্র সামাজিক বৈষম্য; দীর্ঘকাল ধরে মেয়েদের দাবিয়ে রাখার নানা পারিবারিক বা কর্মক্ষেত্র-কেন্দ্রিক ফন্দি-ফিকির—এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে। বঞ্চনার সেইসব চেনা-জানা গলি ঘুঁজিগুলোকেই খুঁজে কিছু পরিচিত টুকরো ছবি তুলে আনি এখানে। শুধু দেখার ভঙ্গিটি কিঞ্চিৎ অন্য—চিকিৎসকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ। কেতাব ঘেঁটে সমাধান বাতলানোর কোনও চেষ্টাই করিনি। কারণ তার জন্য যোগ্য তাত্ত্বিক পন্ডিতরা রয়েছেন। আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিই। ডাক্তার হিসেবে শহর ও গ্রাম উভয় বাতাবরণে একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়তো আমার সহায় হবে।

শুরু করি একেবারে মেয়েদের জন্মক্ষণ থেকেই।

প্রসব ঘরের কান্না

এ আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। বারবার দেখে দেখে আর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। গ্রাম-শহরে এ-অভিজ্ঞতার হেরফেরও হয় না বড় একটা। প্রসবের ঠিক পরই মাকে তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে দেখানোর একটা প্রথা আছে। ঘটনাটা ঘটে তখনই।

মা যদি দেখেন তাঁর পুত্রসন্তান হয়েছে, কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। প্রসবোত্তর তাৎক্ষনিক পরিচর্যার অনিবার্য বেদনাও অনেক সহজে সহ্য করতে পারেন।

আর ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটে কন্যাসন্তান জন্মালে। মায়ের মুখে আশাভঙ্গের কালো মেঘ। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পরিজনদের মুখে অতৃপ্তি।

সবাই পুত্রসন্তান চায়। তারাই নাকি বংশে বাতি দেবে। কথিত আছে ঋষি নারদ মহারাজ হরিশচন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ছেলেকে দিয়ে পিতৃঋণ শোধ হয়। পুত্রে যে আনন্দ তার তুলনা নেই। ছেলে হল সাজানো-গোছানো নৌকো, যাতে করে পিতা জীবনের সীমান্তে সুখে পাড়ি দেন। রাজন, পুত্রের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকে মানুষ। পুত্রের পুত্র, তার পুত্র- এইভাবে অনন্তকালে ব্যক্তির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রইল।'

অনেক দিনের এ-সংস্কার। তাছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পুত্রের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ থাকবেই। তাকে এড়ানো বড় কঠিন।

দুই কন্যাসন্তানের জননীকে পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ দিতে গিয়ে তাই স্বাস্থ্যকর্মী বাড়ির লোকদের দ্বারা অপমানিত হন। সেই জননীও তাই কেমন এক ভিত্তিহীন অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে পরিবারে সঙ্কুচিত থাকেন। কিংবা প্রসূতি যখন জানতে পারেন তাঁর মৃত সন্তান মেয়ে ছিল, ২৮০ দিনের ব্যর্থতার শোক তিনি তাই অনেক সহজে সামলে নিতে পারেন। বাড়ির বড়রা সান্ত্বনা দেন, 'তা একরকম ভালোই হল।'

বাড়িতে একটি বা দুটি মেয়ে আছে যে প্রসূতির, তাঁর এবং তাঁর বাড়ির লোকের মুখে-চোখে কেমন এক আশঙ্কার ছাপ থাকে। নার্স দিদিমণিকে আপনজন ঠাউরে মনের কথা বলেন, 'ছেলের মুখ দেখব বলে এত কষ্ট করা, কে জানে কপালে কী নাচছে।' দিদিমণির এসব কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে। তিনি মস্করা করেন বা উপেক্ষায় এড়িয়ে যান।

এই মাকে আবার আর এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতে দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের সবার। বার বার। এখনও।

বলতে পারেন, এসব অল্প শিক্ষিত গ্রাম্য পরিবারের চিত্র। অস্বীকার করব না। কিন্তু শিক্ষিত, অগ্রসর, শহুরে পরিবারের মনস্কতাও এতটুকু অন্যরকম নয়। এই একই পরিস্থিতিতে সদ্য মা হওয়া মেয়েটির ক্লান্ত মুখের ম্লানতা, সদ্য বাবা হওয়া ছেলেটির পিঠে হাত বুলিয়ে পিসি-স্থানীয় কারোর 'তাতে কী হয়েছে' বলা সান্ত্বনা সব নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেয় এঁরা অন্যরকম চেয়েছিলেন। সামাজিক অবস্থান এঁদের প্রতিক্রিয়াকে অনেক ভব্য করেছে, কিন্তু এরাও ব্যর্থতাবোধে আক্রান্ত।

বাজি ধরে বলতে পারি, বাছবার সুযোগ পেলে তাঁরা এই সন্তান আনতেন না।

আর আধুনিক প্রযুক্তি তাঁদের কাছে এনে দিয়েছে এই 'বাছবার সুযোগ'।

১৯৫৮ সাল নাগাদ বিজ্ঞানী ডোনাল্ড যখন গ্লাসগোয় প্রথম ধাত্রীবিদ্যায় আলট্রাসোনোগ্রাফির প্রচলন করলেন, তখন চিকিৎসক মহলে এক স্বস্তির হাওয়া বয়েছিল। গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা করে গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে কত গুরুতর তথ্য জানা যাচ্ছিল কত সহজে। এবং মা বাচ্চার কোনো ক্ষতি না করেই। অথচ এই উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার হতে লাগল গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের কাজে। এবং ফেঁপে উঠল অনভিপ্রেত কন্যা-ভ্রুণ হত্যার এক ফলাও ব্যবসা।

আরও সুবিধে হল, অ্যামনিওসেন্টেসিস প্রচলিত হওয়ার পর মাত্র ১৪ থেকে ১৬ সপ্তাহের গর্ভাবস্থাতেই এই পদ্ধতিতে জরায়ুর ভেতরের সামান্য কিছু তরল পদার্থ বার করে ভ্রূণের ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা হয়। ফলে আসন্ন সন্তানের জিনঘটিত কোনো জন্মগত ত্রুটি অত আগে থেকেই নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। অথচ ক্রোমোজোম পরীক্ষার তুমুল অপপ্রয়োগ সাধারণ মানুষের কাছে অ্যামনিওসেন্টেসিস পদ্ধতিকে কন্যা-ভ্রূণ হত্যার সমার্থক করে তুলেছে। নারীবাদী সমাজকর্মীরা এখন তাই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা-পদ্ধতিটির বিরুদ্ধে সোচ্চার।

কোনো সন্দেহ নেই, শুধু পরিবার-পরিজনের ওপর দোষ দিলে চলবে না। চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা সক্রিয়ভাবে হাত না বাড়ালে

কিছুতেই এই ব্যবস্থা চলতে পারত না। হাজার হোক, তাঁরাও তো এই সমাজেরই উৎপাদন।

Prenatal Diagnostic Technique (Regulation & Prevention of Misuse) নামে এক আইন আমাদের দেশে বলবৎ হয়েছে ১৯৯৬-এর জানুয়ারি থেকে। কিন্তু মানুষের চেতনা না এলে আইন কতটা করবে?

আলট্রাসোনোগ্রাফি সেন্টারের চিকিৎসকরা এখনও প্রতিদিন কাতর অনুরোধ শোনেন, 'ডাক্তারবাবু ছেলে না মেয়ে? লিখতে হবে না, অন্তত মুখে বলে দিন।' এই আকুতিই জন্ম দিচ্ছে অশুভ নানা ব্যবসা-চক্রের। সে বিষয়ে এখানে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন দেখছি না।

মোদ্দা কথাটি হল, তবু মেয়েরা জন্মায়। বড় হয়। আর সেই বড় হয়ে ওঠার মধ্যে অনেক সময়ই প্রচ্ছন্ন থাকে অমোঘ সত্যি মেয়ে ওরা চায়নি-ওর বাবা-মা আত্মীয়স্বজন।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে

ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতেই। ১৯২৯ সালে এই উদ্দেশ্যে বলবৎ করা হয়েছিল Sarada Act। ১৯৭৮ সালের Child Marriage Restraint Act ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের বয়সের নুনতাম সীমা বেঁধে দেয় যথাক্রমে ২১ এবং ১৮ বছরে। এই আইন এবং জনচেতনার যুগ্ম ফলে ভারতীয় মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৯৫১ সালের ১৩ বছর থেকে বর্তমানে ১৯ বছরে উঠেছে।

কিন্তু গড় হিসেবে অনেক খুঁতই ঢাকা পড়ে যায়। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের গ্রামে এখনও মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৫ বছরের এধার ওধারে ঘোরাফেরা করে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেও খুব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আর উপায় নেই।

বিশেষত করোনা পর্ব থেকেই পশ্চিমবঙ্গে নাবালিকা বিবাহ উর্ধ্বমুখী। উপহার পাওয়া মোবাইল/ ট্যাবে সমাজ মাধ্যমে যোগাযোগের অনিয়ন্ত্রিত সুযোগ অথবা দূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণে অক্ষমতা বা অনীহা এই পরিস্থিতির জন্য সম্ভবত দায়ী। অন্য জেলার কথা বাদই দিই, হাওড়া-হুগলি-বর্ধমানের মতো তথাকথিত 'শিক্ষিত' গ্রামাঞ্চলেও ১৫-১৬ বছরের প্রসূতি দেখে দেখে এই কয়েক বছরে স্বাস্থ্যকর্মীদের অভ্যেস হয়ে গেছে; দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পরে ১৮-১৯ বছরের কয়েকজন মা প্রতি মাসেই আসছে লাইগেশন করাতে। তাদের একান্তে বোঝানো দরকার, অপরিণতমনস্ক এই বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট প্রবল। সেক্ষেত্রে স্বামী দ্বিতীয় সংসার পাততে হয়তো দ্বিধা করবে না। কিন্তু স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ অপারেশন করা মেয়েটির পক্ষে দ্বিতীয় বিয়ে করা প্রায় অসম্ভব।

অতি সম্প্রতি হাসপাতালে একটি মেয়েকে দেখলাম। তার মা বলছিলেন, ১৬ বছর বয়স। দেখে মনে হয় আরও কম। বিয়ের পর একটি সন্তান জন্মায়। তারপর তার বর পালিয়েছে অন্য মেয়ের সঙ্গে। আপাতত বুক-ভরা যক্ষার ক্ষত নিয়ে এই অশিক্ষিত, অশক্ত মেয়েটি বিব্রত করছে তাঁর গরিব, বিধবা মাকে। আর তার সমাজকেও।

শুধু টাটকা স্মৃতি বলেই উল্লেখ করলাম। গ্রামবাংলায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে যেসব চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর, তাঁরা প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত এমন কত মেয়ের দেখা পান।

অপরিণত শরীর আর অপরিণত মন নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসার প্রত্যক্ষ কুফল দুটি। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক এবং সামাজিক।

মায়ের বয়স ১৬ বছরের কম হওয়া শিশু-মৃত্যুর এক স্বীকৃত কারণ। তাছাড়া কমবয়সী মায়ের স্বাস্থ্যহানি, বাচ্চা সামলানোর অপটুতা তো আছেই।

সামাজিক কারণটি দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিছু ভারতীয় জনসংখ্যাবিদ হিসেব কষে দেখিয়েছেন, মেয়েদের বিয়ের বয়স কোনো এলাকায় ১৬ বছর থেকে বাড়িয়ে ২০-২১ বছর হয়ে গেলেই সেখানে শিশু-জন্মের সংখ্যা ২০-৩০ শতাংশ কমে যায়।

কিন্তু আইন আর কতটুকু করতে পারে। আর বাড়ির মানুষদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় কতটুকুই বা করতে পারে কমবয়সী মেয়েটি!

বিবাহোত্তর এলোমেলো

শুধু বিবাহোত্তর 'অত্যাচার' নয়, আমরা বরং বিস্তৃত অর্থে বিবাহোত্তর 'সমস্যা' বলি। তাহলে সামগ্রিকভাবে বিষয়টির মূল শেকড়টা ধরার সুবিধে হবে। আর বিয়ের পরে মেয়েদের সমস্যা শুধু শারীরিক নয়, মানসিকও। বস্তুত মানসিক সমস্যাই বেশি ব্যাপক। প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে সর্বজনীন।

সেটাই খুব স্বাভাবিক। বাল্যবিবাহের আলোচনা থেকে সরে আসি অন্য প্রান্তে। মেয়েদের বিয়ের বয়স যত বাড়ছে, লেখাপড়ার চল যত বাড়ছে, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মানিয়ে নেওয়ার সমস্যাও সমানুপাতে ততই বাড়ছে।

কারণ এখন মেয়েরা বিয়ের আগেই, শুধু শরীর নয়, মনের দিক থেকেও অনেকটা পরিণত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের রুচি, বিচার, ভালো লাগা, মন্দ লাগা সব একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা হয়ে যায়। আগের মতো কমবয়সী বউটি যত সহজে শ্বশুরবাড়ির হালচালের সঙ্গে খাপ খেতে পারত, এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, বড় বড় বিষয় বাদই দিলাম; রান্নার ঝাল, পর্দার রং, সাবানের ব্র্যান্ড-এমন ছোটখাটো ব্যাপারেও তার এতকালের পছন্দের বা অভ্যাসের সঙ্গে সমঝোতা করা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। মানসিকতার এই গরমিল বাড়ির পরিবেশে প্রভাব ফেলবেই।

শাশুড়ি-বউয়ের খটামটির জেরে শাশুড়ির হাইপ্রেসার বা বউয়ের গ্যাসট্রাইটিস ডাক্তারদের পক্ষে এখন আর কোনো নতুন অভিজ্ঞতাই নয়। উভয়ের ক্ষেত্রেই মানসিক টেনশান কমানোর ওষুধ বা একটু অন্য পরিবেশে কিছু দিনের জন্য যাওয়া খুব ফলপ্রসূ চিকিৎসা।

অথচ প্রায় প্রত্যেকেই 'মায়ের মত মনে করি' বা 'মেয়ের মতো দেখি' ইত্যাদি বলে নিজেদের হয়ে সাফাই গান এবং শাশুড়ি বউয়ের

ঘাড়ে আর বউ শাশুড়ির ঘাড়ে দোষ চাপান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের 'মতো' সম্পর্কের সঙ্গে একটা মিথ্যাচার চিটচিটে হয়ে জড়িয়ে থাকবেই। প্রতিবেশী মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে 'বোনের মতো' বললে সকলে যেমন মুখ টিপে হাসে, এও অনেকটা সেরকম। বাস্তবিক বর্তমান কর্ত্রীর সঙ্গে আগামী কর্ত্রীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হওয়া সম্ভবও নয়। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে বড় করে তোলা ছেলের অন্য এক 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' মেয়ের হস্তগত হওয়াও মানসিকভাবে মায়েরা মেনে নিতে পারেন না।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, পরিবার ভেঙে ছোট হয়ে গেলেই সুখের বন্যা বইবে। বরং 'শুধু তুমি আর আমি' মার্কা সংসারে মুশকিল অন্য চেহারায়। আর সেখানে মেয়েটি রোজগেরে হোক আর না-হোক গেরস্থালির যাবতীয় দায়-দায়িত্বের খুঁটিনাটি বইতে বইতে তার অবস্থা সঙ্গীন।

এছাড়া, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষিত গৃহবধূর মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক হতাশাবোধ। হয়তো খবর আসছে তার কোনো সহপাঠিনী কর্মক্ষেত্রে খুব উন্নতি করছেন, অমনি 'আমি কী করলাম' গোছের এক তীব্র হতাশায় আক্রান্ত হচ্ছে গৃহিণী মেয়েটি। এবং সেই ব্যক্তিগত হতাশার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাড়ির পরিবেশ।

'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' সম্পর্কে মানুষ ইদানীং কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু এব্যাপারে সচেতনতা এখনও অনেক বাড়া প্রয়োজন।

তা না হলে বিবাহোত্তর অনেক সমস্যাই, যত দিন যাবে আরও বাড়তে থাকবে। হয়তো আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

তোমার দায়, ওদের সিদ্ধান্ত

যৌথ পরিবার কখনওই স্বামী-স্ত্রীর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতাকে বরদাস্ত করে না।

এবং সেটা খুব স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় সরকার চায় না কয়েকটি রাজ্য সরকার মিলে জোট বাঁধুক, ম্যানেজার চান না তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে খুব ভালো বোঝাপড়া হোক, হাই কম্যান্ড চায় না প্রদেশ নেতৃত্ব সুষ্ঠভাবে চলুক। চায় না, কারণ তাহলে তাঁদের কর্তৃত্ব করার সুযোগ ফুরোবে।

পরিবার যেহেতু মানব সভ্যতার এক আদি প্রতিষ্ঠান তাই তার কর্মপ্রণালীর মাধ্যও এই একই মানসিকতা কাজ করবে। তা না হলে তার অস্তিত্বের সঙ্কট।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে দিই। যৌথ পরিবার মানেই কিন্তু তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জনের সঙ্গে একসঙ্গে কাটানো, দাদু-কাকা-জ্যাঠা-তুতো-তস্য তুতোর হইহল্লা বা ঘন্টা বাজিয়ে খেতে ডাকা নয়। আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ একাধিক দম্পতি একসঙ্গে পাকাপাকিভাবে রান্না-খাওয়া করলেই তাকে যৌথ পরিবার বলে। তাই বাবা-মা-ছেলে বউ বা দু'ভাই সস্ত্রীক বাস করলেও তা যৌথ পরিবার হিসেবেই গণ্য হবে।

আর এই যৌথ পরিবার নববিবাহিত ছেলে-বউয়ের ঘনিষ্ঠতায় নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বাড়ির বাচ্চাটিকে তার 'নতুন কাকিমা'র অতিরিক্ত ন্যাওটা করে তোলা হয়। যে ছেলে আগে রোজ বেলা করে ঘুম থেকে উঠত, বিয়ের পর সকালে তার ঘরের দরজা কিছু বেশিক্ষণ বন্ধ থাকলে কাজের 'মাসি' অবধি মস্করা করছে। গেরস্থালির কোনো তুচ্ছ ব্যাপারেও নতুন বউয়ের সঙ্গে ছেলের মতের মিল হলে তাকে 'স্ত্রৈণ' প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

এসব কিছু যে খুব ভেবেচিন্তে পরিকল্পনামাফিক করা হচ্ছে তা নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পারিবারিক রীতিনীতি আদতে এই কূটনৈতিক লক্ষ্যকেই চরিতার্থ করে।

আর এই মনস্কতা থেকেই আসে নববিবাহিতা বধূকে সন্তানধারণের জন্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চাপ দেওয়া। বিয়ের দু'-আড়াই বছরের মধ্যেও বাচ্চা না এলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, যাঁরা বন্ধ্যাত্বের জন্য চিকিৎসকের কাছে আসেন, অনেক সময়েই দেখা যায় তাঁদের চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন নেই। নেহাত বাড়ির গুরুজনদের চাপে পড়ে তাঁরা ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হন।

শারীরবিজ্ঞান বলে, জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো পদ্ধতি ব্যবহার না করে চেষ্টা চালিয়ে গেলে ৯০ শতাংশ মহিলা ১৮ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হন। তাই ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে চেষ্টা শুরু করার দু'বছরের আগে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা করার কোনো প্রয়োজন নেই। ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মহিলাদের জন্য এই সীমা এক বছর। লক্ষ্যণীয়, বিয়ের পর থেকেই সময় গুনতে আরম্ভ করলে কিন্তু চলবে না, জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ব্যবহার বন্ধ করার পর থেকে এই সময়কাল শুরু হবে।

আজকাল অনেক দম্পতিই বিয়ের তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাচ্চা চান না। কিন্তু বাড়ির অভিভাবকদের ক্রমাগত চাপ তাঁদের দিশেহারা করে তোলে। অন্তত একটি বাচ্চা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই তাজা দুটি মনকে ভিজে কাঁথা, ভারি তলপেট, মাঝরাতে দুধ খাওয়ানোর গড্ডলিকাপ্রবাহে বেঁধে ফেলা যায়। বাচ্চা সামলানোর বাস্তব প্রয়োজনেই তাদের ডানা অনেকটাই ছেঁটে যায় এবং পরিবারের অন্যদের প্রতি অনেকটা নির্ভরশীল হতে হয়। সুরক্ষিত হয় যৌথ পরিবারের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব।

বাচ্চা হওয়ার পর জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি গ্রহণের বেলায় মেয়েদের সমস্যাটা অন্য রকম। তখনও সব দায় যেন তার। এবং এই ধারা প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়েই। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অধিকাংশ গবেষণাও হচ্ছে স্ত্রীকে লক্ষ্য রেখে, স্বামীকে লক্ষ্য রেখে নয়। ভারতবর্ষে যেসব দম্পতি স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে ৫ শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে স্বামীরা ভ্যাসেক্টমি করাচ্ছেন, বাকি সব ক্ষেত্রে স্ত্রীরাই এই দায় বহন করে চলেছেন। অথচ পুরুষদের অপারেশনটাই অনেক বেশি সহজ ও নিরাপদ। পৌরুষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভিত্তিহীন ভয়ে ভীত হয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কাপুরুষ মাথারা এগিয়ে দিচ্ছে তাদের ঘরণীদের।

আবার নিঃসন্তান দম্পতিদের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে আঙুল উঠছে শুধু স্ত্রীর দিকেই। অথচ সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব বলছে, বন্ধ্যাত্বের

ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে দায় একা মহিলার, ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে দায় একা পুরুষের, ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা যায় না, এবং বাকি ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে উভয়েরই কিছু কিছু গোলযোগ থাকে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের রীতি অনুসারে নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসা করতে প্রথমে পুরুষদেরই পরীক্ষা করা বিধেয়। আর এখানে এক কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুরুষ পুঙ্গবটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা নানা অছিলায় এড়িয়ে যেতে চান। তাঁর মতে, বন্ধ্যাত্বের জন্য তাঁর স্ত্রীর 'চিকিৎসা' করালেই যথেষ্ট। তিনি যেন জেনেই গেছেন, গোলমালটা তাঁর স্ত্রীর শরীরেই, তাঁর শরীরে কখনওই নয়।

সত্যিই তো, কোন শাসনকর্তাই বা নিজেরা নিজেদের দোষ স্বীকার করতে চান।

ওদের জন্য সাজো

আজকাল রোগা হওয়ার এক হিড়িক উঠেছে। ফিগার সচেতনতার নামে কমবয়সী মেয়েরা পাতলা ফিনিফিনে চেহারার আঁটো পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটাই আধুনিক স্টাইল। সিনেমায় বা টিভি'র পর্দায় চোখ রাখলে বোঝা যাচ্ছে, এটাই এই সময়ের চাহিদা।

সুযোগ বুঝে শুরু হয়ে গেছে রোগা করার ব্যবসা। কোনো মেয়েদের পত্রিকা নিদান দিচ্ছে দিন-রাত শুধু আনারস খেয়ে থাকো। কোনো কবিরাজি সংস্থা এমন ওষুধ বার করেছে যা খেলে নাকি শরীরের যাবতীয় ফ্যাট গলে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। দশাসই চেহারার মহিলা কসমেটিক সার্জেনকে চাপ দিচ্ছেন শরীর থেকে চর্বি কেটে বাদ দেওয়ার জন্য।

এ এক অদ্ভুত পাগলামি শুরু হয়েছে। কলেজ-পড়ুয়া কত মেয়ে আসছে গ্যাসট্রাইটিস নিয়ে। জিজ্ঞেস করে জানা যাচ্ছে, তারা দিনের পর দিন ছ'ঘন্টা, আট ঘণ্টা বা এমনকী টানা দশ ঘন্টাও না খেয়ে কাটাচ্ছে। ঘি, মাখন খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় ভিটামিন A, D. E. K-র মতো স্নেহ-দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাব ঘটছে। ক্যালরির অভাব ঘটায় বাড়ছে দুর্বলতা, মাথা ধরা, খিটখিটে মেজাজ।

এ তো গেল প্রত্যক্ষ শারীরিক কুফল। কিন্তু এর পেছনে আছে যুগ-প্রাচীন এক মানসিক বৈকল্য। আজকের আধুনিকা, শিক্ষিতা মেয়েরাও যার শিকার। তা হল, নিজেকে পুরুষ সমাজের কাছে 'সুন্দরী' প্রতিপন্ন করার আকুতি।

গয়না পরে ঠোঁট ক্ষত-বিক্ষত করা বা ঘাড় লম্বা করাকে আমরা সভ্যতার আলো না পাওয়া আদিবাসী রীতি হিসেবে অবজ্ঞা করি। অথচ ভুরু প্লাক করার বেদনাদায়ক প্রায়-সর্বজনীন রেওয়াজ নিয়ে কোনো নারীবাদীর আপত্তি নেই। কেউ তলিয়ে ভাবছেন না, উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে খাপ খেতে মেয়েটিকে দৈহিক কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে এবং কিছুটা আঙ্গিক বিকৃতিও। চীনে মেয়েদের বেঁধে রেখে পা বাড়তে না দেওয়া নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি, অথচ আমাদের মেয়েরা স্টাইলিস্ট আধুনিকা হওয়ার তাগিদে উঁচু হিলের জুতো পরে কোমরের ডিস্ক-প্রোল্যাপসে ভুগছে। এই দ্বিচারিতায় আমরা অভ্যস্ত।

রঙ ফর্সা হওয়ার ক্রিম লাগিয়ে রুক্ষ, লাবণ্যহীন চামড়ায় মুখভর্তি র‍্যাশ নিয়ে যে মেয়েটি এসেছে, বৃথাই তাকে বা তার মাকে বকাবকি করি। তাঁদের তো আসলে কোনো দোষ নেই। তাঁরা ছেলেবেলা থেকে জেনে এসেছেন তাঁদের 'সুন্দর' থাকতে হবে। তফাতের মধ্যে তার মায়ের নাক ফুটিয়ে দিয়েছিলেন পাড়ার মাসি ঝাঁটার কাঠি দিয়ে। আর মেয়ের বেলায় জীবাণুমুক্ত সুচ, ট্রিগার। কিন্তু মূল ব্যাপারটা একই। সৌন্দর্য বা সাজগোজ সম্পর্কে সমাজে তদানীন্তন যে মাপকাঠি তার কাছাকাছি থাকতে হবে।

শুধু বড় হয়ে ওঠা, লেখাপড়া, সন্তানধারণের মতো বড় বড় পারিবারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই নয়, মেয়েদের একান্ত নিজস্ব সাজগোজ-রূপচর্চাও আসলে পুরুষসমাজের নিয়ন্ত্রণে। পুরুষ তাকে যখন যেভাবে দেখতে চায়, মেয়েরাও কখনও চেতনে কখনও অসচেতনে সেই চাহিদাকেই শিরোধার্য করতে বাধ্য হয়। আলো-বাতাস আটকানো কালো বোরখাই হোক আর ভি-চ্যানেলের দু'টুকরো কুচি কাপড়ই হোক, দুটোই আসলে পুরুষকে তৃপ্তি দিতে, পুরুষের চাহিদা মেটাতে।

এই চাহিদার কাছে নত হয়েই রূপালি পর্দার নায়িকা কসমেটিক সার্জারির মাধ্যমে তাঁর নাক নিখুঁত করেন, বিশ্বজয়ী সুন্দরী বুকে সিলিকনে অস্বস্তি বয়ে বেড়ান।

আন্দোলন বৃথা যায় না

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

'National Institute for Locomotar Disabilities (N.I.L.D.) দিব্যাঙ্গ হসপিটাল স্থানান্তরকরণের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন: সময় থেমে থাকার নয়।' তাই হঠাৎ কাগজে একটা খবর দেখে অন্যের দুঃখে দুঃখী দেবপ্রিয়বাবু চারিদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন।

প্রথমেই সৌম্যর বাড়ি। সৌম্য বাড়ি থেকে একে একে সবাইকে ডেকে নিলেন। বাণীদি, রেবাদি, অঞ্জলিদি, নিবেদিতাদি, সঞ্জিৎ (বড়), সঞ্জিৎ (ছোট) থেকে শুরু করে দেবাঞ্জনকেও।

প্রতিদিন এখানে কত মানুষ পরিষেবা পায়। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই গরিব। কত দূর দূরান্ত থেকে কত রোগী আসে,

তার ইয়ত্তা নেই। এই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে তো আসেই, আবার আসাম, বিহার, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা এমনকী বাংলাদেশ থেকেও বহু রোগী আসে। যে উড়িষ্যায় এরা এটা নিতে যেতে চাইছে, সেখান থেকেও বহু রোগী এখানে আসে। আসলে উড়িষ্যায় যেটা আছে, সেটা নিতান্ত ছোট একটা হসপিটাল। সেখানে না আছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, না আছে কোন ভালো ব্যবস্থা।

প্রথমে আমাদের উচিত যেখানে যত দিব্যাঙ্গ সংস্থা আছে, তাদেরকে খবর দেওয়া, ডাক্তারবাবুদের এইরকম বেশ কিছু সংস্থা আছে, যারা শারীরিক ও মানসিক অক্ষম এবং দুর্বল শ্রেণি তাদের জন্য ওনারা অনেক কিছু করে থাকেন, তাঁদেরকে খবর দেওয়া এবং সংঘটিত করা আজ একান্ত প্রয়োজন। আর যে সকল সংস্থা আমাদের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছুক, তাদেরকেও খবর দিতে হবে। আমরা কী করতে চাই এবং আমাদের কী কী কর্তব্য হওয়া উচিত তাও জানাতে হবে।

যেহেতু ব্যাপারটি কেন্দ্রের, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থাৎ পার্লামেন্ট পর্যন্ত বিষয়টি পৌঁছানোর জন্য সাংসদকে, তার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি তোলার জন্য আমাদের বিধায়ককেও জানানো দরকার।

N.I.L.D. বাঁচাও কমিটি তৈরি হোক।

সকলে মিলে আগামী রবিবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে সিঁথির মোড়ের সার্কাস ময়দানে জড়ো হব। সেখানে বি. টি. রোড ধরে N.I.L.D. পর্যন্ত স্লোগান দিতে দিতে যাব। আমরা যতজন আছি ততজন তো থাকবই, আর বেশি হলে আরও ভালো। এছাড়া বিষয়টি জানানোর জন্য যে লিফলেট ছাপান হবে, সবার মধ্যে সেটা বিলোতে থাকব। দেখা যাবে এতেই সবার মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেছে।

প্রথম দিনে খুব একটা সাড়া না পেলেও অর্থাৎ লোকে পা না মেলালেও অনেকের সমর্থন পেয়ে বেশ কিছুটা মনোবল ফিরে পেল দেবপ্রিয়বাবুরা। তবে একটা ভালো কাজ হল গেটে ওরা যখন খুব স্লোগান দিচ্ছিল তখন ঐ হসপিটালের অনেকে গোপনে আন্দেলনকারীদেরকে সমর্থন জানিয়ে গেল। ফলে ভিতরে কী হচ্ছে, কী হবে এইসব খবরগুলি খুব সহজে জানা সম্ভব ছিল।

ডাক্তারবাবুদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকলে তাঁরাও সমর্থন জানিয়ে একদিন হসপিটালের গেটে এসে মিলিত হন। বিশিষ্ট শিক্ষক নরেশবাবু প্রমুখরা যুক্ত হলেন।

দ্বিতীয় দিনের মিছিল এসে পৌঁছল। N.I.L.D. এর প্রায় গেটের কাছে। লোকে লোকারণ্য। বহু মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সরব। ডাক্তারবাবুদের M.S.C. নামক সংগঠনটি ও বরানগর নাগরিক কমিটির একটা শাখা সংগঠন N.I.L.D. বাঁচাও কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। প্রায় গেটের কাছে একটা মুক্তমঞ্চও স্থাপন করা হয়েছে। মঞ্চের পিছনে একটা বিরাট বড় ফ্লেক্স। মঞ্চের চারিপাশে বহু চেয়ার পাতা। বাণীদি একে একে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য ব্যক্তিবর্গের নাম ঘোষণা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শ্রী গৌতম চক্রবর্তী, ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্টজন উপস্থিত হয়েছে।

প্রত্যেকেই তাঁদের সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করলেন এবং বিষয়টি যে খুব অন্যায়, সে কথাও প্রত্যেকে নানা যুক্তিতে তুলে ধরলেন। এই N.I.L.D. প্রতিষ্ঠানটি দিব্যাঙ্গদের জন্য ভারতবর্ষে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সাল থেকে এটি মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকৃত হচ্ছে। এখানে বহু বিষয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

যেমন-Physio Therapy, Occupational Therapy, Orthostists এবং Prosthetists, Employment ও Placement Officers এবং Vocational counsellor ইত্যাদি।

দিব্যাঙ্গদের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসও এখানে তৈরি হয়। এখানে অনেকগুলি ফ্যাকাল্টি আছে যেমন-(i) Department of Medical Rehabilitation, (ii) Department of Rehabilitation Nursing, (iii) Department of Physiotherapy।

শেষে দেবপ্রিয়বাবু বললেন, এবার বলুন এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে যদি এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তুলে নিয়ে গিয়ে এটাকে ছোট একটা হসপিটালের রূপ দিতে চায়, তাহলে আমরা বিশেষত বরানগরবাসী তথা বাঙলার জনগণের কাছে কী কৈফিয়ত দেব। আর কী বা কৈফিয়ত দেবো আগামী প্রজন্মের কাছে। ওরা নিশ্চয় আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। তাই আমাদের বক্তব্য, শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই N.I.L.D. তে বিভাগীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের আধিকারিকরা আসছেন ভিতর থেকে এই খবর দেবপ্রিয়বাবুর কাছে এল। উনি যথার্থ দিনটা ভালো করে জেনে নিয়ে বাকি সবাইকে খবর দিলেন। মাস্টারমশাইকে নিজে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন। সেদিন বহু সংস্থার মানুষ এসেছিলেন। এখানকার সাংসদ, বিধায়করাও গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী বরানগরে আর আসেননি। কলকাতায় কোন এক স্থানে ছিলেন। সবাই ব্যর্থ হয়ে মুখ শুকিয়ে চলে এলেও দেবপ্রিয়বাবু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি ডাইরেক্টর ইন চার্জের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে মন্ত্রীর কথামতো সব কিছু মেল করে পাঠান।

এই ঘটনার দিন দশ পরও যখন কোন আশাব্যঞ্জক সংবাদ শোনা যাচ্ছিল না, তখন দেবুবাবু আবার সবাইকে ডাক দিলেন N.I.L.D. গেটে হাজির হবার জন্য। সেদিন কিন্তু আন্দোলনকারীরা শুধু গেটে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তারা ক্যাম্পাসে ঢুকে রীতিমতো স্লোগান দিতে দিতে গোটা ক্যাম্পাস মাতিয়ে তুলেছিল। বিষয় যখন জীবন পণের জায়গায় পৌঁছে গেছে তখন কর্তৃপক্ষ চুপ থাকে কী করে। তাই ডিরেকটর সাহেব আমাদের একটা প্রতিনিধি দলকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে পাঁচজন দেবপ্রিয়বাবু, মাস্টারমশাই, বাণীদি, ডাক্তারবাবু ও গৌতমবাবুরা উপস্থিত হলেন।

দেবপ্রিয় বললেন, বর্তমান ভারতবর্ষের সরকারের নীতি তো দেখতে পাচ্ছেন। চারিদিকে সব কিছুকে তারা প্রাইভেট করতে ব্যস্ত। সব দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে শুধু মুনাফা দেখতে চাইছে। কিন্তু গরিব মানুষেরা যাবে কোথায় বলুন। প্রাইভেট মানেই তো শুধু কয়েকজন ব্যক্তির মুনাফা। এই ব্যবস্থায় শুধু বিত্তবান ছাড়া আর কাদের ভালো

হয় বলুন। আজ চাকরির কোন স্থিরতা নেই, পেনশন নেই। চুক্তি ভিত্তিক/অস্থায়ী কাজে মাইনে গড়ে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজারের মধ্যে হয়। কারণ সরকার সিকিউরিটি থেকে শুরু করে, সুইপার ইত্যাদি সব কিছুতে প্রাইভেট সংস্থা থেকে লোক নিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। দেশে স্থায়ী চাকুরি উঠেই গেছে বলতেই পারেন। সেই চিন্তায় আমরা আপনার শুধু টনক নড়াতে এই কাজ করলাম।

ডিরেকটর সাহেব কিছু কথা না বলে চুপ করে মাস্টারমশাই-এর মুখের দিকে হতবাক নয়নে তাকিয়ে ছিলেন। আলাপ পর্ব শেষ করে অনেকে চলে গেলেও কয়েকজন একটা চায়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। গৌতমবাবু সবাইকে চা খাওয়ালেন। এটাই এই সংগঠনের নিয়ম। টাকা নেই, পয়সা নেই তবু সবার সঙ্গে সবার কী অপূর্ব মিল। যে যেদিন ইচ্ছা চা খাওয়ায়, কেউ খায়, কেউ খায় না। এরপর মাষ্টারমশায় সুন্দরভাবে এখানকার মানুষের দাবিগুলি জানালেন। দাবিপত্র পেশও করা হল।

এ ঘটনার দিন দশের মধ্যে ওপর থেকে অর্ডার এল, কেন্দ্রীয় সরকার এই হসপিটালের (N.I.L.D.) ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না। এটা যেমন স্বাধীনভাবে চলছিল, সেইভাবেই চলবে। কাগজে এই খবরটা বের হওয়ার সাথে সাথে দলবদ্ধভাবে সবাই ডিরেকটরকে ধন্যবাদ জানাতে গেলে ডিরেকটর সাহেব মাস্টারমশাই-এর হাত দুটো ধরে অভিনন্দন জানালেন এবং সবাইকে চা-বিস্কুট অফার করলেন। এর কিছুদিন পর দেবপ্রিয়বাবু খবর পেলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আসার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন ডিরেকটরের অনুমতি নিয়ে। দেখা করে জানালেন দয়া করে একটা নোটিশ জারি করতে যাতে লেখা থাকবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে স্থানান্তরিত করছেন না।

বিষয়: ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের (ISI) স্বাধীকার হরণ:

এখনকার কেন্দ্রীয় সরকার আইএসআই বিল ২০২৫ (খসড়া) নিয়ে এসেছে। যা কার্যকর হলে 'আইএসআই আইন, ১৯৫৯' সম্পূর্ণ বাতিল হবে। এই খসড়া বিল আইনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত করার বদলে, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বদলে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত আমলাদের মাধ্যমে আইএসআই পরিচালিত হবে। এর ফলে আইএসআই তার স্বাধিকার হারাবে ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। এর প্রতিবাদে বরানগর নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে আইএসআইয়ের ভেতরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রথমে অধিকর্তা ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করলে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, ডেপুটেশন নিতে হবে নয়তো বিক্ষোভ চলবে। আন্দোলনের চাপে শেষে সাহিত্যিক দীনেশ ভট্টাচার্যর নেতৃত্বেও জন প্রতিনিধি দলকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। গেটের বাইরে বিক্ষোভ চলে। নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কার্তিক রায় বলেন, 'দেশজুড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার কেড়ে নিয়ে তার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি শেষ করে দেওয়ার পর বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নজর এখন প্রশান্ত মহলানবিশ প্রতিষ্ঠিত আইএসআইয়ের ওপর পড়েছে। বর্তমান খসড়া বিল চালু হলে আইএসআই স্বাধিকার হারাবে পাশাপাশি পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। কলকাতা কেন্দ্রের গুরুত্ব হ্রাস করা হবে। আমরা এই খসড়া আইনটি বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। এর ওয়েবসাইটে এই খসড়া আইনটিতে জনসাধারণের মতামত চাওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলাম জনসাধারণ সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দেওয়া আইনটির সংশোধনী ফরম্যাটে মতামত দিতে পারবে। এখানে জনগণের স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ করে সরকার তার অগণতান্ত্রিক চরিত্রকেই প্রকাশ করল।' শিক্ষিকা ঝুম্পা রায় বলেন, 'বিল-২০২৫ এর মাধ্যমে আইএসআইয়ের এখনকার কোর্সগুলিতে ফি বৃদ্ধি, বিশাল ফি এর কোর্স চালু করা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের নামে মৌলিক গবেষণার চরিত্র বদলের মাধ্যমে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিরণ করা হবে। গরিব মেধাবী পড়ুয়ারা বঞ্চিত হবেন। পি সি মহলানবিশের দান করা এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আমরা কিছুতেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দেব না, এর স্বাধিকার রক্ষায় আমাদের লড়াই চলবে।'

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) পরিচালনার নতুন খসড়া বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল বরানগর নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। আইএসআই পরিচালনা নিয়ে একটি খসড়া বিল এনেছে কেন্দ্র। অভিযোগ, যা লাগু হলে সংস্থার স্বাধীকার হরণ হবে। আন্দোলনগুলি প্রাথমিক অবস্থায় আছে। এগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অ্যাসিড হামলা, গার্হস্থ্য হিংসা ও নারী পাচারে শীর্ষে বাংলা

(সূত্রঃ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো)*

	২০২২	২০২৩
অ্যাসিড হামলা	৪৮	৫৭
গার্হস্থ্য হিংসা	১৯৫৯৮	২০৪৬২
নারী পাচার	২৮	৪২

* কেবলমাত্র যেগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে

প্রকৃতি ও পরিবেশ

প্রকৃতির নীরব দূত: ডায়ান ফসি, জানে গুডল এবং বিরুটে গালডিকুস

অজন্তা প্রবাহিতা

"The least I can do is speak out for those who cannot speak for themselves."—Jane Goodall

ইতিহাসে কখনও কখনও এমন মানুষ এসে যান, যাঁরা মানুষের সংজ্ঞাটাকেই নতুন করে লেখেন। তাঁদের হাতে ছিল না রাজমুকুট বা তলোয়ার, ছিল শুধু একখানা দূরবীন, নোটবুক আর অফুরন্ত মমতা।

তেমনই তিন নারী—ডায়ান ফসি, জানে গুডল এবং বিরুটে গালডিকুস। রক্তের নয়, বিশ্বাসের বন্ধনে গড়া তিন আত্মা; তিনজনই প্রকৃতির সন্তান, পৃথিবীর নিঃশব্দ প্রাণীদের কণ্ঠস্বর।

প্রকৃতি তিন দূত হিসেবে তাঁদের জন্ম যেন হয়েছিল—যেন মানবসভ্যতা ও অরণ্যের মাঝখানে এক সেতুবন্ধন তৈরি করার জন্য।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কেনিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানী লুইস লিকি বিশ্বাস করতেন—মানবজাতির শিকড় বুঝতে হলে তার নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।

তিনি তিন নারী গবেষককে পাঠালেন তিন দিকের জঙ্গলে—চিম্পাঞ্জি, গরিলা ও ওরাংওটানদের জীবন জানার জন্য।

এই তিন নারী—ডায়ান ফসি, জানে গুডল, এবং বিরুটে গালডিকুস-কে তিনি ভালোবেসে নাম দেন Trimates।

National Geographic তাঁদের বলেছিল "Leakey's Angels"—কারণ তাঁরা তিনজন প্রকৃতির জন্য লড়েছেন, যেন দেবদূতের মতো।

তাঁদের গবেষণা প্রমাণ করেছে—প্রায় ৫০-৬০ লক্ষ বছর আগে মানুষ ও এই বৃহৎ প্রাইমেটদের (Great Apes) ছিল এক অভিন্ন পূর্বপুরুষ।

তাঁদের কাজ মানব বিবর্তনের রহস্য উন্মোচনের পাশাপাশি, মানুষকে আবার প্রকৃতির দিকে ফিরিয়ে এনেছে।

ডায়ান ফসি—এক মার্কিন প্রাইমাটোলজিস্ট, যিনি ১৯৬৭ সালে রোয়ান্ডার ভিরুঙ্গা পর্বতশ্রেণিতে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর গবেষণা কেন্দ্র Karisoke Research Center।

সেই পাহাড়ি জঙ্গলেই জীবনের দুই দশক কাটান তিনি—যেখানে প্রতিদিন সকালে হাতে থাকত একটি মাচেত, আর বুকভরা সাহস।

মেঘে ঢাকা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে তাঁর ক্ষীণ ছায়া মিলিয়ে যেত ঘন অরণ্যে।

তিনি গরিলাদের মতো হাঁটতেন, গা চুলকাতেন, তাদের ডাক নকল করতেন—এভাবেই ধীরে ধীরে তিনি তাঁদের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

তার আগে তিনি ধার করে ১৯৬৩তে আফ্রিকার বিস্তৃত বনাঞ্চল ঘুরে দেখেন। ১৯৬৫তে কেনিয়া হয়ে ভিরুঙ্গা পর্বতের পশ্চিম ঢালে কঙ্গোর কিভু প্রদেশে পাহাড়ি গরিলাদের বাসভূমির কাছে অরণ্যের মধ্যে ক্যাম্প তৈরি করে তাদের নিরীক্ষণ শুরু করেন। গৃহযুদ্ধের অশান্তির মধ্যে একদল সেনা এসে তাঁর ক্যাম্প তছনছ করে দেয় এবং তাঁকে বন্দী করে রাখে। পরে সেখান থেকে কোনরকমে পালিয়ে উগান্ডা ও কেনিয়া হয়ে রোয়ান্ডার রুহেনগিরি জেলায় চলে আসেন।

সেখানে ভিরুঙ্গা পর্বতমালার মাউন্ট কারিসিম্বি ও মাউন্ট বিসোকের মাঝে কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ি গরিলাদের দেশে ৯,৮০০ ফুট উচ্চতায় ক্যাম্প তৈরি করে তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করেন।

স্থানীয়রা স্নেহে ডাকত Nyirmachabelli, অর্থাৎ "পাহাড়ের একা নারী।"

তিনি গরিলাদের নাম দিতেন—Digit, Uncle Bert, Pablo—তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁদের দুঃখে কাঁদতেন, মৃত্যুর পর ফুলে ঢেকে দিতেন তাঁদের দেহ।

Digit-এর মৃত্যু (১৯৭৭, শিকারিদের হাতে) তাঁকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়।

তিনি শুরু করেন Digit Fund—যা আজ বিশ্ববিখ্যাত Dian Fossey Gorilla Fund International। তাঁর লেখা Gorillas in the Mist (১৯৮৩) শুধুই বিজ্ঞান নয়, প্রকৃতি ও মমতার এক সুরভিত দিনলিপি। ১৯৮০তে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি.এইচ.ডি. প্রদান করে। কিন্তু প্রকৃতিকে রক্ষা করার পথ সবসময়ই বিপদে ঘেরা।

গরিলা শিকার ও অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে তাঁর সরব প্রতিবাদ অনেকের স্বার্থে আঘাত করেছিল। ১৯৮৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর, তাঁর কুটিরে পাওয়া যায় তাঁর নিথর দেহ। পাশে পড়ে ছিল সেই মাচেত—প্রতিরোধের নীরব প্রতীক হয়ে।

আজ তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই মাউন্টেন গরিলার সংখ্যা ১৯৮০-এর দশকের ২৫৪ থেকে বেড়ে প্রায় ৬০০-এর বেশি।

রুয়ান্ডার কুয়াশা যেন এখনও ফিসফিস করে বলে—''ডায়ান এখনও আমাদের মাঝে আছেন।''

অন্যদিকে জানে গুডল, ১৯৩৪ সালে ইংল্যান্ডের বর্নমাউথে জন্ম নেওয়া এক স্বপ্নবিলাসী কিশোরী, যার শৈশবে পিতা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন Jubilee—একটি খেলনা চিম্পাঞ্জি। সেই খেলনাই যেন তাঁর জীবনের দিকনির্দেশক হয়ে ওঠে।

১৯৬০ সালে তিনি দেখেন, এক চিম্প ঘাসের ডাঁটা দিয়ে টার্মাইট ধরছে—যা সেই সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।

তিনি চিম্পদের নাম দিয়েছিলেন—David Greybeart, Flo, Fifi—যাঁরা হয়ে ওঠেন তাঁর পরিবারের অংশ।

তাঁদের আচরণ, যুদ্ধ (Gombe War, ১৯৭৪-৭৭), মাতৃত্ব, ও সমাজ কাঠামো নিয়ে তাঁর গবেষণা শুধু প্রাণিবিদ্যার নয়, মানবতারও এক পাঠ।

১৯৬২ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পিএইচডি প্রদান করে—যেন তাঁর নিজের অধ্যবসায়ের প্রতি প্রকৃত স্বীকৃতি।

তাঁর বই In the Shadow of Man মানুষের ও প্রাণীর মধ্যে সেই সূক্ষ্ম সীমারেখাকে এক আত্মীয়তার সেতুতে রূপ দেয়।

১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত Jane Goodall Institute আজ ১০০টিরও বেশি দেশে সক্রিয়।

১৯৯১ সালে তাঁর শুরু করা Roots & Shoots Programme শিশু ও তরুণদের শেখায়—''একটি ছোট পদক্ষেপেও পৃথিবী বদলানো যায়।''

তিনি UN Messenger of Peace (২০০২) এবং Dame Commander of the Order of the British Empire (২০০৪) উপাধিতে সম্মানিত হন।

Trimates ত্রয়ীর তৃতীয় সদস্য বিরুটে গালডিকুস, লিথুনিয়ান শরণার্থী পরিবারের কন্যা, লিকির পরামর্শে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বোরনিও দ্বীপের ক্রান্তীয় অরণ্যে Camp Leaky গড়ে তোলেন।

সেখানেই শুরু হয় তাঁর ওরাংওটান নিয়ে দীর্ঘ ৫০ বছরের গবেষণা।

তিনি গড়ে তোলেন Orangutan Foundation International (OFI) এবং ২০২১ সালে Ancient Woods Foundation—যা আজও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতীক।

তাঁদের তিনজনের জীবন প্রমাণ করে, প্রকৃতিকে ভালোবাসা মানে কেবল রোমান্টিক আবেগ নয়—এটি এক বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

জানে, ডায়ান ও বিরুটে—তিনজন নারী, দুই মহাদেশে, তিন অরণ্যে।

একজন শিম্পাঞ্জিদের হাসি-খুশির মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, অন্যজন গরিলাদের নীরব চোখের ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব খুঁজেছেন। আরেকজন ওরাংওটানদের নিকটজন হয়েছেন। তবু তাঁদের পথের গন্তব্য এক—প্রকৃতির মর্যাদা রক্ষা।

জানে গুডলের কাজ মানুষকে শেখায় সহানুভূতি, ডায়ান ফসির জীবন শেখায় প্রতিরোধ, বিরুটের সহায়তা।

তাঁরা যেন তিনটি মহান উদ্যোগে—পৃথিবীটাকে আরও সবুজ, আরও সংবেদনশীল করে তোলার জন্য। এর মধ্যে ডায়ানকে ১৯৮৫তে হত্যা করা হয়েছে, জানে ২০২৫এ গত হলেন, বিরুটে একমাত্র জীবিত।

আজও পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে ২৭টি ফুটবল মাঠের সমান বনভূমি নষ্ট হচ্ছে।

আমাদের প্রিয় সুন্দরবনেও বাঘ কমছে—২০০৪ সালে যেখানে সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৪০ ২০১৮তে তা নেমে এসেছে ১১৪-এ।

জেন ও ডায়ানের মতো যদি আমরাও প্রতিটি প্রাণের নাম দিই, তাদের গল্প বলি, তবে হয়তো সংরক্ষণ আর শুধু প্রকল্প নয়—এক মানবিক প্রতিশ্রুতি হয়ে উঠবে।

জানে বলেছিলেন: ''What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.''

তাঁরা আমাদের শিখিয়ে গেছেন—বিজ্ঞান শুধু গবেষণা নয়, এটি সহানুভূতি, দায়বদ্ধতা ও সাহসের পথ।

প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণ, প্রতিটি পাতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের এক অদৃশ্য ছন্দ—যা আমরা ক্রমে ভুলে যাচ্ছি।

তবু যদি এক মুহূর্ত থামি, একটু শুনি জঙ্গলের ফিসফিস আওয়াজ, বৃষ্টির গন্ধ, বা গরিলা শিশুর নিঃশ্বাস—হয়তো আবার খুঁজে পাব নিজের হারানো মানবিকতা।

তাঁরা দেখিয়ে গেছেন—প্রকৃতিকে বোঝা মানে, আসলে মানুষকেই নতুন করে চিনে নেওয়া।

কাঁদছে পাহাড়, ফুঁসে উঠছে নদী:
উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি এখন বিপর্যস্ত

রাজা রাউত

প্রকৃতির ছন্দপতন: চা-বাগানের সবুজ ঢাল, কুয়াশায় ঢাকা পাহাড় আর শান্ত নদী—এই ছিল এক সময়ের উত্তরবঙ্গ। কিন্তু আজ সেই ছবির পটভূমি পাল্টে গেছে। গত কয়েক বছরে এই অঞ্চল—দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার পর্যন্ত—অভূতপূর্ব জলবায়ুগত বিপর্যয়ের মুখে। মেঘফাটল, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধস এখন প্রায় প্রতি বছরই ঘটছে, আর সাধারণ বর্ষা পরিণত হয়েছে ভয়ঙ্কর দুর্যোগে।

এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়। এটি দীর্ঘদিনের পরিবেশ অবহেলা, অবৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মিলিত ফল।

মেঘফাটল (Cloud Burst): আকাশের আকস্মিক ক্রোধ। যে বর্ষা একদিন জীবন দিত, এখন সেটিই মৃত্যু ডেকে আনে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে এখন প্রায় প্রতি বছরই মেঘফাটলের খবর পাওয়া যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শত শত মিলিমিটার বৃষ্টি নেমে আসে—নদী উপচে পড়ে, রাস্তা, সেতু, ঘরবাড়ি সব ভেসে যায়।

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে এমনই এক প্রবল বর্ষা পুরো এলাকা তছনছ করে দেয়। পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদামাটি ও জলধারা চা-বাগান, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার আগে এই অক্টোবর মাসেই ২০২৩ সালে তিস্তার ভয়াবহ রূপ দেখেছি আমরা। আবহাওয়া দফতরের তথ্য বলছে—গত এক দশকে উত্তরবঙ্গের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। ২০২৬ এও একই অবস্থা।

আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) ও ভূমিধস (Landslide): দ্বিমুখী দুর্যোগ প্রতিটি মেঘফাটলের সঙ্গে আসে এই দুই বিপদ—বন্যা ও ভূমিধস। এক সময় ঘন বনভূমি পাহাড়ের ঢালকে রক্ষা করত। কিন্তু আজ সেই পাহাড় কেটে রাস্তা, ঘরবাড়ি, রিসর্ট, তথাকথিত হোমস্টে তৈরির ফলে পাহাড়গুলো হয়ে উঠেছে অরক্ষিত।

তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, সংকোশ—এই নদীগুলো এখন প্রায়ই তীর উপচে বন্যা সৃষ্টি করে। নদীর বালু উত্তোলন, দখল করে চাষ, ঘরবাড়ি নির্মাণ এবং ব্রিজ, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণের ফলে এর প্রাকৃতিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত। ফলে প্রবল বৃষ্টির সময় নদীর জল ছাপিয়ে গ্রামাঞ্চল ও চা-বাগান প্লাবিত হয়।

পাহাড়ি জেলায় অবিরাম বৃষ্টিতে হঠাৎ ভূমিধস ঘটে। মিরিক, লাভা, কার্সিয়ংয়ের মতো পাহাড়ি শহরগুলো প্রায়ই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দার্জিলিংয়ের ঢালে আগের বছরের ভূমিধসের ক্ষত এখনো স্পষ্ট দেখা যায়।

মানবিক ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি: এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মানবিক মূল্য ভয়াবহ। প্রতি বছর শত শত পরিবার ঘরবাড়ি হারায়, জীবিকা হারায়। চা শিল্পে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়, শ্রমিকরা মাসের পর মাস বেকার থাকে।

বন্যপ্রাণীরাও রেহাই পাচ্ছে না। জলদাপাড়া ও গরুমারার মতো জাতীয় উদ্যানগুলোতে নদী ফুলে ওঠার সময় গণ্ডার, হাতি এমনকি হরিণও ডুবে মারা যায়। নদী ও বনভূমির পরিবেশগত ভারসাম্য ভয়ানকভাবে নষ্ট হচ্ছে।

জলমগ্ন স্কুলপথে হাঁটতে থাকা শিশুরা আর ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে ভেসে যাওয়া ফসল—এই দৃশ্য এখন উত্তরবঙ্গের নিত্যদিনের বাস্তবতা।

কেন ঘটছে এমন বিপর্যয়?

বিশেষজ্ঞদের মতে, একাধিক কারণ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সংকটকে ভয়ানক করে তুলছে—

জলবায়ু পরিবর্তন: তাপমাত্রা বাড়ায় বায়ুমণ্ডলে বেশি জলীয় বাষ্প জমছে, ফলে বৃষ্টিপাত হচ্ছে হঠাৎ ও তীব্রভাবে।

বন উজাড়: চা-বাগান, পর্যটন ও নগর সম্প্রসারণের জন্য পাহাড়ের ঢালে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন: রাস্তা, বাঁধ ও বহুতল ভবন নির্মাণে পাহাড়ের প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

নদী ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম: বালি খনন ও নদীদখলে নদীর ধারণক্ষমতা কমেছে, ফলে বন্যার সময় জল ছাপিয়ে পড়ে। তিস্তা সহ বিভিন্ন পাহাড়ি নদীকে জলবিদ্যুৎ তৈরির কারণে অসংখ্য বাঁধ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলা হয়েছে যে কারণে নদীর জল স্বাভাবিক গতিতে যেতে পারেনা। সেচের কারণে গজলডোবা ব্যারাজে নদীর গতি আবার রুদ্ধ হয়।

চীনের সঙ্গে সীমান্ত-সামরিক পরিকাঠামো প্রতিযোগিতা: এর কারণে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে বনভূমি উজাড় করে ডোকলাম অবধি সাঁজোয়া গাড়ি যাবার পথ এবং রংপো অবধি

রেলপথ নির্মাণের ফলে ভূমিধস বেড়ে গেছে।

এই সবকটি কারণ মিলেই আজ উত্তরবঙ্গকে বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়েছে। শোনা যাচ্ছে এনজেপি-নয়াদিল্লি বুলেট ট্রেন চলবে এবং শিলিগুড়ি করিডরের মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে রেল ও গাড়ি চলাচলের রাস্তা করা হবে।

সমাধানের পথ: প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান উত্তরবঙ্গের এই সংকট অমোচনীয় নয়, কিন্তু এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব—

পাহাড়ে বনায়ন ও ঢাল স্থিতিশীলকরণ করতে হবে স্থানীয় প্রজাতির গাছ দিয়ে।

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নির্মাণ ও বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ করতে হবে।

নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহ ও প্লাবনভূমি পুনরুদ্ধার করতে হবে।

আগাম সতর্কতা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে।

পরিবেশবান্ধব চা উৎপাদন ও পর্যটন নীতি গ্রহণ করতে হবে।

জনগণের মধ্যে জলবায়ু শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানো অপরিহার্য।

ভবিষ্যতের প্রহেলিকা: আজকের উত্তরবঙ্গ এক অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের দেশ হলেও তার ভবিষ্যৎ ভীষণ অনিশ্চিত। বুলবুলের গান অনেক সময় ঢেকে যায় বন্যার গর্জনে, মেঘে ঢাকা পাহাড় এখন ভয় লুকিয়ে রাখে। প্রতি বর্ষা শেষে প্রশ্নটা একই থেকে যায়—

"এই বছরও কি পাহাড় আবার ভাঙবে?"

যদি এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া হয়, উত্তরবঙ্গ একদিন প্রকৃতির নির্মম উদাহরণ হয়ে উঠবে—যেখানে মানুষ ও উন্নয়নের লালসা মিলেই স্বর্গকে পরিণত করেছে বিপদের রাজ্যে। একই অবস্থা সিকিম, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের।

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে আহ্বান

দক্ষিণবঙ্গে অতিবৃষ্টি, বন্যা, জল জমার পর উত্তরবঙ্গের অতিবৃষ্টি, হড়পা বান, ভূমিধ্বস, বন্যার ভয়াবহ চিত্র আমাদের শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে।

পরিবেশ দূষণ জনিত বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আছেই। পাশাপাশি সরকার এবং নাগরিকরা যেভাবে পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ ধ্বংসের প্রতিযোগিতা করে চলেছেন তাতে এই দুর্যোগ গুলি ত্বরান্বিত ও ব্যাপকতর হচ্ছে।

ভঙ্গুর হিমালয় পর্বতের সংকটময় Seismic IV zone এ অবস্থিত দার্জিলিং এ যেভাবে অরণ্য ধংস করে বেআইনি নির্মাণ, স্রোতস্বিনী সহ পাহাড়ি নদী, ঝোড়া ও নালাগুলির তিস্তার গতিরোধ করে একের পর এক বাঁধ, ব্রিজ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ; চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা না মিটিয়ে সীমান্তে সামরিক পরিকাঠামো বাড়াতে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ, আগ্রাসী অপরিকল্পিত পর্যটন ও ব্যাঙের ছাতার মত হোম স্টে নির্মাণ, নদী ও নিকাশি নালাগুলি সংস্কার না করা, শিলিগুড়ি দার্জিলিং কালিম্পং কার্সিয়াং প্রভৃতি শহরকে কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত করা, অনিয়ন্ত্রিত ও অত্যধিক যান চলাচল ও তাদের দূষণ, যথেচ্ছ প্লাস্টিক ব্যবহার ইত্যাদি দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে তার ফল আমাদের ভুগতে হচ্ছে।

অন্যদিকে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স সহ অবহেলিত উত্তরবঙ্গের নদী, বাঁধ, ব্যারাজ, জলাধার, ব্রিজ, রাস্তা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ না করে; পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গড়ে ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করে; দুর্যোগ মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে সরকারের উৎসব, মেলা, উপহার, পুরস্কার, ডোল, মন্দির নির্মাণ, প্রসাদ বিতরণ, হজ যাত্রা, দুর্গা পুজো, কার্নিভাল, মচ্ছব, নির্বাচন, রথযাত্রা, তারকেশ্বরে কপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি - কেবলমাত্র এই সব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া, কোষাগারের বিপুল অপচয় এবং নাগরিকদেরও তাতে মেতে ওঠা; সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কোন গঠনমূলক কাজে যুক্ত না থেকে কেবল মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করে মিটিং, মিছিল, উচ্চকিত মাইক বাজিয়ে বক্তৃতা, ভোট, পারস্পরিক দোষারোপ, মারামারি ও হিংসায় ব্যস্ত থাকা পরিস্থিতিকে খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর উপর দায়িত্বশীলদের নিম্ন মানের কাজ, দুর্নীতি, গাফিলতি, অবহেলা এবং নাগরিকদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও সব কিছু ভাগ্য ও নেতাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দুর্গতি আরও বাড়িয়ে তুলছে।

জানিনা আর কত ক্ষয়ক্ষতি ঘটার পর আমরা শিক্ষা নেবো। জানিনা এই দুর্যোগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে বেরিয়ে আসবে।

তবে এরই মধ্যে আমাদের পরস্পরের প্রতি হাত বাড়িয়ে প্রথমেই দুর্গত মানুষ ও পশুদের (পাঁচটি অভয়ারণ্য এই অঞ্চলে) দের উদ্ধার করে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে। তাঁদের সংগঠিত করে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত এবং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাতে হবে।

বজ্রপাত প্রতিরোধে

ইদানীং পরিবেশ দূষণের কারণে বজ্রপাত বৃদ্ধি এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি। বিশেষজ্ঞরা দুটি নিদান দিয়েছেন: (১) আলপথে বেশি সংখ্যায় তালগাছ রোপণ এবং (২) গ্রামাঞ্চলে কিছু দূরত্ব পরপর কংক্রিটের ছোট শেল্টার নির্মাণ।

পিকরিক অ্যাসিড নিয়ে যত কাণ্ড

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

সময়টা ১৯১৭ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মধ্যগগনে। ততদিনে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে যুদ্ধের আঁচ এসে পড়েছে মার্কিন মুলুকেও। নিজেদের ঘোষিত নিরপেক্ষ অবস্থানের আড়ালে মিত্রশক্তিকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে চলেছে আমেরিকা। হিম শীতল আবহাওয়ায় নিউইয়র্ক বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে সমরাস্ত্র বহনকারী ফরাসী জাহাজ এস এস মঁ-ব্লা। তাতে বোঝাই করা হয়েছে ৬২ টন গানকটন (নাইট্রোসেলুলোজ), ২৫০ টন টিএনটি (নাইট্রোটলুইন) এবং ২৩৬৬ টন পিকরিক অ্যাসিড (ট্রাইনাইট্রোফেনল)। সবগুলিই অতি দাহ্য পদার্থ। একেবারে শেষ মুহূর্তে ফ্রান্স থেকে আরেকটি রসায়নিক পদার্থের অর্ডার এসেছে। বেঞ্জল নামক এই পদার্থটিকে আলকাতরা থেকে নিষ্কাশন করা হয়। মিষ্টি গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন, অত্যন্ত উদ্বায়ী ও দাহ্য, পদার্থটির মুখ্য রাসায়নিক উপাদান বেঞ্জিন ও টলুইন। সাতপাঁচ চিন্তা না করেই বেঞ্জল পূর্ণ ব্যারেলগুলোকে খালাসিরা জাহাজের ডেকে তুলে দিল।

যথাসময়ে বন্দর ছেড়ে রওনা হল এস এস মঁ-ব্লা। উত্তরদিকে নোভা স্কসিয়ার হ্যালিফ্যাক্স বন্দর। কানাডার দক্ষিণপূর্ব দিকের এই অঞ্চল কৃষিকাজ ও মৎস শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে অশান্ত সমুদ্রে প্রায়ই বিশালাকার ঢেউ ওঠে। মিত্রশক্তির আরেকটি পণ্যবাহী জাহাজও আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুদ্ধবিদ্ধস্ত সময়ে নিরাপত্তার স্বার্থে পণ্য পরিবহণকারী বোঝাতে দুটো জাহাজেই উড়ছে লাল নিশান। কিন্তু জার্মান নৌসেনার সাবমেরিন (এগুলোকে ইউ-বোট বলা হতো) রক্তিম নিশানের জাহাজগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখে। পণ্য পরিবহনের আড়ালে কোনো সমরাস্ত্র পাচার হচ্ছে কিনা কে জানে? প্রতিকূল ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেই ৫ ডিসেম্বর ১৯১৭ হ্যালিফ্যাক্স বন্দরে এসে পৌঁছোয় মঁ-ব্লা। নাবিকরা জাহাজ নোঙ্গর করে অধীর আগ্রহে বন্দরে নেমে আসার অপেক্ষা করছেন। পণ্য বোঝাই হয়ে গেলেই রওনা হবেন ওরা।

অ্যান্টি সাবমেরিন নেট লাগানো হয়েছে জাহাজে। পরদিন সকালে বন্দরের একটি সরু অংশ দিয়ে জাহাজটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আচমকা নাবিকরা লক্ষ্য করলেন একটি ত্রাণবাহী জাহাজ (বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া ওই জাহাজটির নাম ইমো) দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। বন্দর থেকে সংকেত প্রেরণে কোনো গোলমাল হল নাতো? নইলে একই পথে আরেকটি জাহাজ আসছে কেন? মঁ-ব্লার চালক জাহাজ থেকে সতর্কতা মূলক বিস্ফোরণ ঘটালেন। প্রত্যুত্তরে অপর জাহাজটিতেও একইরকম বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল, অর্থাৎ ওরা পথ ছাড়বে না। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে উভয় জাহাজের চালকই পরস্পর সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ইমোর ধাক্কায় জাহাজের এক পাশের অংশ গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। ডেকে রাখা বেঞ্জলের অনেকগুলো ব্যারেল ভেঙে গিয়েছে। ইমো বেরিয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তেই সেখানে আগুনের ফুলকি দেখা গেল। পরক্ষণেই জ্বলে উঠলো লেলিহান শিখা। জাহাজের নাবিক এবং অন্যান্য সদস্যদের অনেকেই ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন যে ওরা এই মুহূর্তে প্রায় বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ ছেড়ে পালাতে হবে। যারা আগুন নেভাতে গিয়েছিলেন অন্যান্যরা চিৎকার করে তাদের সতর্ক করতে লাগলেন। জ্বলন্ত মঁ-ব্লা সৈকতের দিকে এগোতে লাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন পৌঁছে গেল পিকরিক অ্যাসিডে। এবার হল এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ। নোভা স্কসিয়ার ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত সিডনি শহর থেকেও শোনা গেল সেই শব্দ। আর সেই অভিঘাতে হ্যালিফ্যাক্স-এ থাকা মানুষজন ছিটকে পড়লেন কয়েক ফুট দূরে, প্রত্যেকটি বাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে চৌচির, বিস্ফোরণ স্থল থেকে নির্গত অগুন্তি অ্যাপনেল (ভাঙ্গা টুকরো) গুলির মতো বিদ্ধ করল স্থানীয় জনতাকে। চারদিকে আতঙ্ক ও হাহাকার। এর মধ্যেই প্রায় ৫২ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস বন্দর ছাড়িয়ে আছড়ে পড়লো শহরের উপর, ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিস্তীর্ণ অঞ্চল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল রিচমন্ড এলাকার জনবসতি। বিস্ফোরণ স্থল থেকে ১.৫ কিলোমিটার দুরত্বের মধ্যে যাকিছু ছিল সব প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। মুহূর্তে হারিয়ে গেলেন প্রায় ১৬০০ জন মানুষ, পরে এই সংখ্যাটা আরও ৩০০ বৃদ্ধি পায়। তথ্য অনুযায়ী মঁ-ব্লার বিস্ফোরণে ৯০০০ এর বেশি আহত হয়েছিলেন এবং শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ (সংখ্যাটা মোটামুটি ২৫০০০) গৃহহীন হয়েছিলেন। উইলিয়াম বার্টন নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিন হ্যালিফ্যাক্স-এর এক হোটেল থেকে তিনি দেখেছিলেন ধ্বংসস্তূপের ঠিক উপরে কালো ধোঁয়ার দৈত্যাকার মেঘ। যেন আচমকাই পৃথিবীতে প্রলয় নেমে এসেছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী "দশ সেকেন্ডের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেল"। হিরোশিমাতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসে মঁ-ব্লার বিস্ফোরণই ছিল সবচেয়ে বেশি ধ্বংসকারী।

অথচ পিকরিক অ্যাসিডের উৎপত্তির সঙ্গে কিন্তু এইরকম ধ্বংসাত্মক ঘটনার আশংকা কেউ কোনোদিন করেনি। হ্যালিফ্যাক্স বিস্ফোরণের ঠিক ১৯০ বছর আগে আয়ারল্যান্ডে জন্মেছিলেন পিটার উলফ। তখনকার বিজ্ঞানচর্চার নিরিখে যৌবনকালে যথারীতি অ্যালকেমি নিয়ে হাজারো পরীক্ষানিরীক্ষায় মেতে থাকতেন তিনি। স্পেন ও ফ্রান্সে অনেকটা সময় কাটিয়ে অবশেষে লন্ডনেই বিজ্ঞান গবেষণার কাজে থিতু হলেন তিনি। খনিজ পদার্থ এবং কাঁচের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য

হ্যালিফ্যাক্স বিস্ফোরণের পরে। ছবি সূত্র- Nova Scotia Archives & Records Management/Collections Canada/Wikimedia Commons

১৭৬৭ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন পিটার এবং পরের বছরই লাভ করেন সম্মানীয় কোপলে মেডেল। রসায়নাগারে ব্যবহৃত উলফ বোতলের ডিজাইন করেছিলেন তিনি এবং আজও বিশেষ আকৃতির কাঁচের সেই পাত্র তাঁর নাম বহন করে চলেছে।

ভারী অদ্ভুত মানুষ ছিলেন পিটার উলফ। একসঙ্গে প্রাতরাশের প্রত্যাশায় বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাতেন ঠিক ভোর ৪ টায় এবং অত্যন্ত গোপনে আসতে হতো তাঁদের। কখনও ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ করলে প্রতিকার হিসাবে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তাতে চেপে বসতেন এবং লন্ডন থেকে এডিনবার্গ দীর্ঘ চারশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতেন। তারপর গন্তব্যে পৌঁছে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে করার চেষ্টা করতেন তিনি; তাছাড়া এমন জীবনসুধা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করতেন যা খেলে সব অসুখ সেরে যায়, দূর হয় জড়া ও বার্ধক্য। অর্থাৎ অমৃত তৈরির চেষ্টা যাকে বলে। ধর্মে অগাধ আস্থার পাশাপাশি চূড়ান্ত ভাগ্যবিশ্বাসী ছিলেন উলফ। তাই প্রতিবার পরীক্ষানিরীক্ষার আগে যন্ত্রপাতিগুলিকে নিয়েও উপযুক্ত প্রার্থনা সেরে নিতেন যাতে সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এভাবেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আজব কাজকর্ম করতে করতে ১৭৭১ সাল নাগাদ একদিন তিনি দেখলেন নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ইন্ডিগোর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থটি দিয়ে সিল্কের সুতো বা কাপড়কে রাঙালে সেগুলো উজ্জ্বল হলদে বর্ণ ধারণ করে। ধাপে ধাপে যে বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয় তা

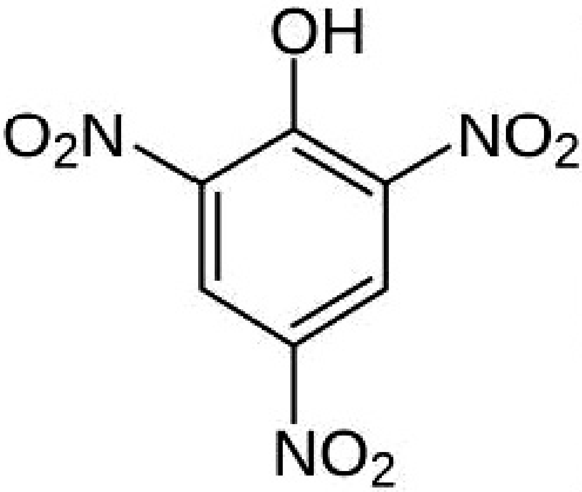

পিকরিক অ্যাসিড (রাসায়নিক নাম 2,4,6-ট্রাইনাইট্রোফেনল)

আবার একইভাবে ফিরে আসতেন। গবেষণাগারে হরেক কিসিমের পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ ধাতুগুলোকে সোনায় পরিণত পরিষ্কারভাবে ডায়রিতে নথিবদ্ধ করে ফেললেন উলফ। রসায়নাগারে উৎপন্ন হল প্রথম কৃত্রিম রঞ্জক। গ্রীক ভাষায় পিকরস শব্দের অর্থ

তেতো, পদার্থটি স্বাদে ভীষণরকম তেতো অথচ ধর্মে আম্লিক, তাই এর নাম রাখা হল পিকরিক অ্যাসিড। অবশ্য বিজ্ঞানীমহল তাঁকে এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি প্রদানের আগেই মারা গিয়েছিলেন উলফ। একবার প্রচণ্ড শীতে এডিনবার্গ থেকে ফিরে আরও বেশি করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ফুসফুসে মারাত্মক সংক্রমণ নিয়ে নিজেকে গৃহবন্দি করে রাখলেন সত্তরোর্ধ্ব উলফ এবং বদ্ধ ঘরে সবার অজান্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

উলফ-র মৃত্যুর চল্লিশ বছর বাদে রসায়নবিদরা ফেনল থেকে পিকরিক অ্যাসিড তৈরি করতে সমর্থ হলেন। ওরা দেখলেন আলকাতরা থেকে আংশিক পাতন পদ্ধতিতে সহজেই ফেনল পাওয়া যায়। অন্যদিকে কোল গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর পরিমাণে আলকাতরা উৎপন্ন হওয়ায় ফেনল বেশ সহজলভ্য রাসায়নিক পদার্থ। আর ফেনলের সঙ্গে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটালে উৎপন্ন হয় ট্রাই নাইট্রো ফেনল বা পিকরিক অ্যাসিড। বর্ণহীন দুটি পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পিকরিক অ্যাসিড পাওয়া যায় হলুদ বর্ণের কেলাস হিসাবে। তাছাড়া পিকরিক অ্যাসিড দিয়ে কাপড় রাঙালে তীব্র সূর্যালোকেও কাপড়ের হলুদ বর্ণ ফিকে হয়ে যায় না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রঞ্জক পদার্থ হিসাবে এই পদার্থটির কদর বাড়তে আরম্ভ করল। পরবর্তীকালে শিল্প উৎপাদন শুরু হলে এর মূল্যও সাধারণের নাগালের মধ্যে চলে এলো।

এদিকে পিকরিক অ্যাসিড নিয়ে রসায়নবিদদের আগ্রহ ও গবেষণা বেড়েই চলল। সময়ের সাথে সাথে এই পদার্থটির আরও কিছু ধর্ম আবিষ্কৃত হল। দেখা গেল তীব্র অম্লধর্মিতার পাশাপাশি যৌগটি বিভিন্ন ধাতু বা ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ‘পিক্রেট’ জাতীয় অস্থায়ী ধাতব লবণ উৎপন্ন করে। পিক্রেট জাতীয় সমস্ত পদার্থ আবার ভয়ংকর বিস্ফোরকধর্মী। উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে হেরম্যান স্প্রেনজেল নামে এক রসায়নবিদ দাবি করেন পিকরিক অ্যাসিডের নিজের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন রয়েছে এবং দ্রুত দহনের জন্য বাইরের অক্সিজেনের কোনো প্রয়োজন হয় না, ফলে বিস্ফোরক হিসাবে সরাসরি একে ব্যবহার করা যাবে। এই কথাগুলো মাথায় রেখে ফরাসি রাসায়নবিদ ইউজিন টারপিন বিশেষ পদ্ধতিতে পিকরিক অ্যাসিডকে গলিয়ে বিশেষ আকারের ছোটো পাত্রে ঢেলে পুনরায় শীতল করলেন। এবার যুদ্ধের সময় সৈন্যরা পিকরিক অ্যাসিড পূর্ণ সেই পাত্রগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের গোলা হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করলো।

কিন্তু প্রশ্ন হল গান পাউডারের মতো বহুল প্রচলিত বিস্ফোরকের পরিবর্তে পিকরিক অ্যাসিডকে ব্যবহারের নেপথ্যে প্রকৃত কারণগুলি ঠিক কী? আসলে গোলাতে ব্যবহারযোগ্য বিস্ফোরকের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা জরুরি—

- তীব্র দহনে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে হবে যাতে প্রচুর গ্যাস ও তাপ মুক্ত হয়।
- প্রাথমিক দহনের ধাক্কা সহ্য করার ক্ষমতা পদার্থটির থাকা চাই যাতে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার পর মূল বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।
- বিস্ফোরক পদার্থের ঘনত্ব সর্বদা বেশি হওয়া চাই, তাহলেই সীমিত স্থানে অনেকটা পরিমাণ পদার্থ ঠেসে দেওয়া সম্ভব।
- ফিউজ বা এইরকম কোনো সহজ ডিটোনেশন প্রযুক্তির সাহায্যে যেন নির্দিষ্ট মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।
- বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট চাপ এবং নিক্ষিপ্ত বস্তুগুলির গতিবেগ যেন যথেষ্ট হয় যাতে ধ্বংসকারী প্রভাব থাকে।
- সবচেয়ে বড়ো কথা নিরাপদ উৎপাদনের জন্য বিস্ফোরক পদার্থটির যথেষ্ট স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

পিকরিক অ্যাসিডের উপকারিতা সম্পর্কিত আমেরিকান পোস্টার।
সময় ১৯৪১-১৯৪৫

খুব কম বিস্ফোরকেরেই এইসব গুণাবলী থাকে। আর পিকরিক অ্যাসিডের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল স্থিতিশীলতার অভাব; একে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকেই। এর বিস্ফোরণ ক্ষমতা ডিনামাইটের তুলনায় দশগুণ বেশি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে একটু আধটু আলাদা মিশ্রণ সহযোগে কামানের গোলার বিস্ফোরক হিসাবে পিকরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হতে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীতে এর নামও ছিল আলাদা। যেমন, ফ্রান্সে মিলিনাইট, ইংল্যান্ডে লিডাইট, ইতালিতে পারটাইট, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিতে এক্রাসাইট, জার্মানিতে গ্রানাটফুলানাং ৮৮ এইরকম।

১৯০৫ সালে রুশ-জাপান সুশিমার যুদ্ধে রুশ রণতরীগুলিতে

আক্রমণের জন্য কামানের গোলাতে 'শিমোসে পাউডার' ব্যবহার করা হতো। সেই গোলা জাহাজের উপর আছড়ে পরে এমন শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটাত যা রাশিয়ানরা আগে কোনোদিন দেখে নি। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ডেকের উপর দিকে থাকা ইস্পাতের প্যানেল এবং অন্যান্য শক্ত কাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। সেই যুদ্ধে তিনটি রাশিয়ান রণতরী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১২০০০ এর বেশি সেনার মৃত্যু হয় বা তারা যুদ্ধবন্দী হন। রুশরা পরাজিত হন।

বিস্ফোরক হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল পিকরিক অ্যাসিড। চাহিদা বাড়তে থাকায় এই সময় মিত্র শক্তি পিকরিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য নাইট্রোজেন ভিত্তিক বিস্ফোরক আমদানির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে নজর দেয়। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল বরাবর গড়ে ওঠে গোলাবারুদ প্রস্তুতির কারখানাগুলি। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ আমেরিকায় প্রতি মাসে ৬০০০০০ পাউন্ড পিকরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হতো এবং বিপুল চাহিদার জন্যই এক বছরের মধ্যে সেই উৎপাদন প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। বিস্ফোরক হিসাবে পিকরিক অ্যাসিডের সাফল্যের পথ ধরেই আরও শক্তিশালী বিস্ফোরক ট্রাই নাইট্রো টলুইন (TNT)-এর ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই প্ল্যান্টগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে মালিকপক্ষের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। ফলে বায়ু চলাচল হীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হতো, নাইট্রাস গ্যাসের প্রভাবে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হতো তাদের গলা ও ফুসফুস। পিকরিক অ্যাসিডের বিষাক্ত হলুদ ধুলো সর্বাঙ্গে লেগে থাকতো, ত্বক পুড়ে গিয়ে ছোপ ছোপ দাগ হয়ে যেত, এদের 'কানারিজ' নামে ডাকা হতো। অ্যালিস হেমিল্টন নামে এক ডাক্তার কারখানার বিষাক্ত পরিবেশ এবং শ্রমিকদের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সর্বসমক্ষে নিয়ে আসেন। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী নাইট্রাস ধোঁয়ায় আক্রান্ত ৫৩ জন শ্রমিকের মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

দেশের নাগরিকদের ভয়ংকর দুর্দশার মুখে ঠেলে দেয় যুদ্ধ। তবে এই সময় সবচেয়ে ভয়ংকর ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সৈনিকদের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়ে শত্রুপক্ষের গোলাবারুদের মোকাবিলা করার জন্য পদাতিক সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে বা বাঙ্কারে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতেন। একদিকে কাদামাটি মাখা ভিজে পোশাক ও জুতো পরে দীর্ঘ সময় ট্রেঞ্চে থাকা, শত্রুপক্ষের গোলাগুলির পাশাপাশি বিষাক্ত পোকামাকড়ের দংশন, অন্যদিকে পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার তীব্র হতাশা। এসবের পাশাপাশি 'ট্রেঞ্চ ফুট' নামে এক অদ্ভুত শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন সৈন্যরা। সেই সময়ে প্রায় ৭৫০০০ ব্রিটিশ এবং ২০০০ আমেরিকান সৈন্য এতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রথমে পায়ের দিকে শিহরণ হতো, তারপর চুলকানি এবং ক্রমে অনুভূতির অসাড়তা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দীর্ঘ সময় ভিজে থাকার ফলে পায়ের চামড়া ও টিস্যু ভাঙতে আরম্ভ করতো এবং পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত অংশ ফুলে উঠে শেষে অনেকেই গ্যাংরিনে আক্রান্ত হতেন। আর একবার গ্যাংরিন হয়ে গেলে পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া কোনো চিকিৎসা ছিল না। এই দুর্ভোগ প্রতিহত করার জন্য ডাক্তারবাবুদের নিদান ছিল প্রত্যেক সৈন্য যেন ১% পিকরিক অ্যাসিড দ্রবণে নিজেদের পা রাঙিয়ে রাখে। যে রাসায়নিক পদার্থটি বিস্ফোরক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিধনের কাজে ব্যবহৃত হতো সেই একই রাসায়নিক আবার সৈন্যদের চিকিৎসাতেও কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল। এমনকি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ইংরেজ সৈন্যদের চিকিৎসায় ওষুধ হিসাবে কুইনাইনের পাশাপাশি পিকরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হতো, বিশেষত যাদের দেহে কুইনাইনের কার্যকারিতা কম বলে মনে করতেন চিকিৎসকরা তাদেরই ক্ষেত্রে।

১৮৬৮ সালে সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অ্যালকালাইন পিকরেট (পিকরিক অ্যাসিডের ধাতব লবণ)-কে নিরাপদ ওষুধ বলে দাবি করা হয়। ইংল্যান্ড, মিশর ও অন্যান্য অনেক দেশেই অ্যানিমিয়া, মাথাব্যাথা, ডাইরিয়া ইত্যাদি অসুখেও ডাক্তারবাবুরা রোগীদের এই ওষুধ দিতেন। এমনকি পুড়ে যাওয়া ত্বকের চিকিৎসাতেও পিকরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা হতো, আর গবেষকরা বুঝেছিলেন জীবাণু বিনাশকারী হিসাবে এই দ্রবণ বেশ কার্যকরী। অবশ্য পিকরিক অ্যাসিড বা পিকরেট লবণ সেবনকারী অনেকেরই ত্বকে হলদে ছোপ বা চোখ হলুদ হয়ে যেত বলেও রিপোর্টে দেখা গেছে।

বিস্ফোরকের মতো বিনাশকারী ধর্মের পাশাপাশি ওষুধ হিসাবে পিকরিক অ্যাসিডের ব্যবহার রসায়নের ব্যবহারিক প্রয়োগের এক নতুন অধ্যায়। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে এই প্রয়োগের কাহিনী আমাদের ক্লোরিন ও ডিডিটি-র কথা মনে করায়। পিকরিক অ্যাসিডের আরেকটি ছোট ঘটনা বলে এই লেখা শেষ করছি। এস্তোনিয়ার কাছাকাছি এক দ্বীপের অধিবাসীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডুবে যাওয়া এক রাশিয়ান রণতরী থেকে বেশ খানিকটা পরিমাণ পিকরিক অ্যাসিড উদ্ধার করেন ১৯৩০ সালে। যে পদার্থটি এককালে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা দিয়েই দ্বীপের অধিবাসীরা নিজেদের বস্ত্র রাঙাতে শুরু করেন। পিকরিক অ্যাসিডে রাঙানো উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের স্কার্ট সবার নজর কেড়ে নেয়।

ইদানিংকালে অবশ্য বিজ্ঞানীরা জীবকোষে পিকরিক অ্যাসিডের প্রভাবকে পুনরায় ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছেন, তবে ওষুধ হিসাবে নয়, হিস্টোগ্রাফিক স্টেইন হিসাবে গবেষণাগারে জীবকোষ রাঙাতে।

ভারতীয় স্কিমার ও হিমালয়ান স্যালামাণ্ডার—বিলুপ্তপ্রায় দুই প্রাণীর সংরক্ষণে ২০২৬ এর গ্রিন অস্কার 'হুইটলি অ্যাওয়ার্ডস' পেলেন ভারতের পারভিন শেখ এবং বরখা সুব্বা

ড্রোন বিজ্ঞান: একটি চ্যালেঞ্জ

তপন দাস

একটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার। গৃহকর্তা সুবিনয় বাবু পেশায় একজন গৃহ শিক্ষক। ছোটদের ক্লাসের বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান সবই পড়ান। টিউশন, বাড়ির কাজ এসব করতে করতেই এখন তিনি ষাট ছুঁই ছুঁই। একমাত্র ছেলে ঋজু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেক্ট্রনিকস নিয়ে পড়াশুনা করছে। এটা তার তৃতীয় বর্ষ। ছেলে ছুটিতে বাড়িতে এলেই অনেক অনেক গল্প চলে দুজনের। আসলে সুবিনয় বাবুর জানার আগ্রহ চিরকাল। এইতো কয়েকদিন আগেই এক প্রাক্তন ছাত্রীর বিয়েতে গেছিলেন। ছাত্রী এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কন্যা। তাই রকমারি সব ব্যবস্থা। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে খোলা আকাশের নিজে বিয়ের আয়োজন। বহু মানুষের ভিড়। ভিভিআইপিদের আগমন। আঁটসাঁট নিরাপত্তাও রয়েছে। বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি ক্যামেরা বন্দি হচ্ছে। আবার নজরদারি চলছে ড্রোনের মাধ্যমে। সুবিনয়বাবু ড্রোন শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এর ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে সেই অর্থে জানেন না। তাই এবারে ছেলে ছুটিতে বাড়িতে আসা মাত্রই ছেলের কাছে ড্রোন নিয়ে নানান প্রশ্ন।

যেকোনো বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করতে ঋজুর বেশ ভালোই লাগে। এবারও ড্রোন সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বাবাকে শোনাল। ঋজু প্রথমেই বলে ড্রোনের ইতিহাস নিয়ে। ১৯১৬-১৭ সাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'এরিয়াল টর্পোডো' বা স্বয়ংক্রিয় বিমান তৈরির কাজ শুরু করে। ১৯৩৫ সালে Reginald Denny রেডিও-নিয়ন্ত্রিত মডেল বিমান তৈরি করেন, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতো। তবে পাশাপাশি ঋজু এটাও জানায় ড্রোন বা মনুষ্যবিহীন আকাশযান (Unmanned Aerial Vehical or Unmanned Aircraft System) হলো এমন বিমান যা দূরবর্তী নিয়ন্ত্রক বা স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার দ্বারা চালিত হলেও ১৮৪৯ সালে অস্ট্রিয়ার বেলুন আক্রমণের মাধ্যমে এর ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে এটি জিপিএস (GPS), গাইরোস্কোপ, ও সেন্সর ব্যবহার করে নজরদারি, ভিডিওগ্রাফি এবং সামরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোর বিকাশ মূলত সামরিক প্রয়োজন থেকে শুরু হয়ে এখন বেসামরিক ও শখের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহারিক দিক গুলো আলোকপাত করতে থাকে ঋজু। সুবিনয়বাবু শুনে চলেছেন একমনে।

সময়ের সাথে সাথে এবং প্রযুক্তি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, ড্রোনের সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের পাশাপাশি বেসামরিক ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ স্থান তৈরি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML) এর বিস্ময়ের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ড্রোন শিল্প, কৃষি, নির্মাণ, বিশেষ কোন জায়গা নজরদারি করতে, চোরা শিকারি রুখতে, খেলার মাঠে ভিডিও তৈরিতে, সিনেমার শুটিং এ, দুর্গমস্থানে ত্রাণ পৌঁছে দিতে, প্রত্নতত্ত্ব নজরদারিতে কখনো বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে গবেষণার গতি বাড়াতে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অর্জন করে।

প্রথমেই ঋজু বলে কৃষি বিপ্লবের কথা। ড্রোন প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে এমন রূপান্তরকারী ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি হল কৃষি। ভারতের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকায়, অত্যাধুনিক ক্যামেরা এবং সেন্সরযুক্ত ড্রোনগুলি নির্ভুল কৃষিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে সচেষ্ট। এই ইউএভিগুলি দক্ষতার সাথে ফসলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে, মাটির অবস্থা পরিমাপ করে এবং এমনকি লক্ষ্যবস্তুতে কীটনাশক প্রয়োগও পরিচালনা করে। ফলস্বরূপ আমরা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পেরেছি সেই সঙ্গে যথাযথ সম্পদের ব্যবহার করাও সম্ভব হয়েছে। ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ, ফসল ব্যবস্থাপনা এবং নির্ভুল কৃষিকাজে ড্রোন প্রযুক্তি সমাধানের ডানার নিচে বিকশিত হয়।

ড্রোন প্রযুক্তির সৌজন্যে নির্মাণ শিল্পেও এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। প্রাথমিক ভূমি মূল্যায়ন থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধমান কাঠামোর সূক্ষ্ম রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত, ড্রোনগুলি নির্বিঘ্ন সমাধান প্রদান করে। আকাশ জরিপ, প্রকল্পের অগ্রগতির রিয়েল-টাইম অন্তর্দৃষ্টি, আয়তন বিশ্লেষণ-একটি বিস্তৃত টুলকিট ড্রোনের আওতাধীন, দক্ষতাকে সুগম করে। সমসাময়িক সময়ে, ড্রোন প্রযুক্তি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে আরও সহজ করে তুলেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ প্রচেষ্টায় ড্রোন এক অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখে গেছে। বন্যা ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর, ড্রোনগুলি ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন, জীবিতদের সনাক্তকরণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে জীবন রক্ষাকারী জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য কাজ করে। এই সমন্বয় সংকটময় মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া সময় এবং কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে।

ভারতের ড্রোন শিল্প এখন ক্রমবর্ধমান হচ্ছে। ভারতের সামরিক সুরক্ষা আরও সুনিশ্চিত করতে ড্রোন প্রযুক্তি একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। নিয়ন্ত্রক বাধা এবং আকাশসীমা ব্যবস্থাপনায় ড্রোনের ব্যবহারে আমাদের দেশও আজ আর পিছিয়ে নেই। চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় ড্রোন ইকোসিস্টেম অনেক স্টার্টআপ এবং অগ্রণী প্রকল্পের জন্ম দিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ থেকে শুরু করে আকাশপথের মাধ্যমে সিনেমাটোগ্রাফি সমৃদ্ধ করা পর্যন্ত উদ্যোক্তারা ড্রোন প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অভিনব সুযোগ তৈরি করেছেন। গল্পে গল্পে ঋজু সুবিনয়বাবুকে জানায় 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ দেশীয় ড্রোন তৈরি উৎপাদনকে ত্বরান্বিত

করেছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক কোম্পানি দেশীয়ভাবে ড্রোন তৈরি, উৎপাদন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রযুক্তিগত স্বায়ত্তশাসনের এই দ্বৈত জোর ভারতের ভূদৃশ্যকে নতুন রূপ দিচ্ছে। ঋজুর কথায় বর্তমানে ড্রোন শুধু যুদ্ধের ময়দানেই নয় কৃষি, ফটোগ্রাফি, ত্রাণ বিতরণ এবং উদ্ধারকাজেও একটি অপরিহার্য প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানটা সুবিনয় বাবু খুব ভালো না বুঝলেও নিউটনের গতিসূত্রগুল সম্পর্কে তার সম্মক ধারণা রয়েছে। সেই কারনেই ঋজু যখন একটি ড্রোনের কাঠামো এবং তার যন্ত্রাংশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছিল সুবিনয় বাবুর সেসব বুঝতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। সুবিনয় বাবু জানেন একটি উড়োজাহাজ আকাশে যখন ওড়ে তখন নিউটনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গতিসূত্র কীভাবে কাজে লাগে। সেই ব্যাখ্যাই দিচ্ছিল ঋজু। হালকা ও শক্ত উপাদান যেমন কার্বন ফাইবার বা হালকা প্লাস্টিক ব্যবহার করে ড্রোন নির্মাণ করা হয়। ড্রোন সাধারণত 'কোয়াডকপ্টার' (চারটি প্রপেলার) বা ফিক্সড-উইং ডিজাইনের হয়। এগুলো এরোডাইনামিকস এবং প্রপেলারের গতির পার্থক্যের মাধ্যমে ওড়ে। জিপিএস (GPS) এর মাধ্যমে ড্রোন অবস্থান নির্ণয় করে এবং রিমোট কন্ট্রোলার বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে নির্দেশ (Radio Signals) গ্রহণ করে। পদার্থ বিদ্যার চারটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই ড্রোন বানানো হয়। বাতাস কাটিয়ে একটি কঠিন বস্তু নিয়ন্ত্রিত গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী আমরা জানি প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ড্রোনকে ওড়াতে গিয়ে তৃতীয় সুত্রের যেমন প্রয়োগ আছে পাশাপাশি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রও প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় গতিসূত্রের নির্যাসে আমরা পাই, বল = ভর x ত্বরণ। অভিকর্ষজ বলের বিপরীতে পর্যাপ্ত বল উৎপন্ন করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলতে এরোডাইনামিকস এবং ইলেকট্রোডায়নামিকস যুগ্ম ভাবে কাজ করে। যান্ত্রিক শক্তি, তাপ এবং আনুষঙ্গিক বেশ কিছু বিষয় তাপ গতিবিদ্যার সূত্র অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রান্সমিটার, রিসিভার এবং প্রসেসর ইত্যাদির মধ্যে রেডিও সংযোগ স্থাপনে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক তত্ত্ব কাজে লাগানো হয়। এসবের সঙ্গে জুড়ে আরেকটি বিষয়, তা হল কন্ট্রোল থিয়োরি। তবে এক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। উন্নত ড্রোনগুলোতে গাইরোস্কোপ, অ্যাক্সিলোমিটার, ব্যারোমিটার এবং ক্যামেরা থাকে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে।

পিতা পুত্রের ড্রোন নিয়ে জানা অজানা নানান গল্প এভাবেই এগিয়েছিল। ইতিমধ্যে সুবিনয় বাবুর বেশ কিছু প্রশ্ন জমেছে মনে। ঋজুর কাছে জানতে চায় ড্রোন কি মরুভূমিতে ওড়ানো সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋজু জানায় মরুভূমি থেকে পর্বত, তাপমাত্রা-১০° থেকে ৪০° সেলসিয়াস ড্রোন ওড়ানোর জন্য উপযোগী। তাহলে বৃষ্টির সময় কি ড্রোন ওড়ানো সম্ভব? ভারী বৃষ্টিতে ড্রোন ওড়ানো অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। তবে ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়না। ড্রোন এবং মিসাইলের মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋজু জানায় মিসাইল দ্রুতগতির, একবার নিক্ষেপযোগ্য এবং সরাসরি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে। অন্যদিকে ড্রোন ধীরগতির, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য, আকাশে অনেকক্ষণ উড়ে লক্ষ্যবস্তু খুঁজে বের করতে পারে। সুবিনয় বাবু আবারও জানতে চায় চাঁদে কি ড্রোন ওড়ানো সম্ভব? এটা খুব সহজ ভাবেই বলা যায় বাতাস কাটিয়ে ড্রোন সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। চাঁদে বাতাস না থাকায় ড্রোন ওড়ানো সম্ভব নয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যেসমস্ত ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল সেইসব ড্রোন যতক্ষণ জ্বালানি মজুত থাকে অথবা মাটিতে ল্যান্ড করার মুহূর্ত পর্যন্ত ছবি তুলতে বা ভিডিও বানাতে সক্ষম থাকত। বিগত বছরগুলিতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ড্রোন ওড়ানো হয় উন্নত ব্যাটারির মাধ্যমে। 3100 mAh ব্যবহার করা হচ্ছে। ড্রোন নিয়ে দেশ বিদেশে চলছে আধুনিক গবেষণা। সেখানে আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। সামরিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে সামরিক কাজকর্মের বাইরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ড্রোনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তবে কোন ব্যবহারের ক্ষেত্র বিশেষে ড্রোনের ধরন আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। ঋজুর কথায় উঠে এলো বেশ কয়েকটি ধরনের ড্রোনের কথা—

১) নজরদারি ড্রোন (Reconnaissance UAV)

২) লক্ষ্যভেদী ড্রোন (Targeted UAV)

৩) শত্রুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ছলনামূলক ড্রোন (Decoy UAV)

৪) যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত ড্রোন (Combat UAV)

৫) গবেষণামূলক ড্রোন (UAV for Research)

৬) অসামরিক ড্রোন (UAV for Civil Use)

৭) বাণিজ্যিক ড্রোন (Commercial UAV)

এছাড়া কত উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম তার উপর ভিত্তি করেও ড্রোন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

১) Hand-held UAV: ৬০০ মিটার উচ্চতায় উঠতে এবং দুই কি.মি. অবধি পরিক্রমা করতে সক্ষম।

২) Close UAV: ১৫০০ মিটার এবং ১০ কি.মি.

৩) NATO type UAV: ৩০০০ মিটার এবং ৫০ কিমি

৪) Tactical UAV: ৫৫০০ মিটার এবং ১৬০ কিমি

৫) MALE (Medium Altitude, Long Endurance) UAV: ৯০০০ মিটার এবং ২০০ কি.মি.

এই প্রজন্মের আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরাও ড্রোন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে নিজের ক্যারিয়ার গড়তেই পারে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ দেশীয় ড্রোন উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করেছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক কোম্পানি দেশীয়ভাবে ড্রোন তৈরি, এবং উৎপাদন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রযুক্তিগত স্বায়ত্তশাসনের এই দ্বৈত জোর ভারতের একটি নতুন চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। ড্রোন শিল্পের রূপান্তর এবং জীবনযাত্রার উন্নতিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। চ্যালেঞ্জের মধ্যেও, ভারতীয় ড্রোন বিপ্লব দেশের প্রযুক্তিগত ভূখণ্ডকে নতুন করে রূপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তুত। ভারত যখন সামনের দিকে তাকাচ্ছে, তখন ড্রোনের দক্ষতাকে কাজে লাগানো একটি উজ্জ্বল এবং আরও আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের দিকে তার যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করে সকলেই। ঋজু, সুবিনয়বাবু সকলেই আশাবাদী। বাকিটা বলবে ভবিষ্যৎ।

ক্ষেপণাস্ত্র (Missile) ও ড্রোনের (UAV) পার্থক্য : ক্ষেপণাস্ত্র বড় আকৃতির, ভারী, অনেকটা বস্তু (Payload) নিতে সক্ষম, দ্রুতগামী, একমুখী যুদ্ধাস্ত্র। ড্রোন যুদ্ধাস্ত্রও হতে পারে, আবার অসামরিকও হতে পারে। কোন কোন ড্রোন পুরোটাই দূর থেকে পরিচালনা করা হয় এবং কোন কোন ড্রোন উড়িয়ে ফিরিয়ে আনা হয়।

ক্ষেপণাস্ত্র স্বল্পপাল্লার, মাঝারী পাল্লার এবং দূরপাল্লার (Long Range) ও আন্তর্মহাদেশীয় (Intercontinental) হয়। সেগুলির কোনটি শব্দের চাইতে দ্রুতগামী (Supersonic) কিংবা শব্দের চাইতে অনেকগুণ বেশি দ্রুতগামী (Hypersonic) হয়। কোনটি Ballistic যেগুলি তার গতিপথে প্রথমে মহাশূন্যে পৌঁছে তারপর বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রবল বেগে ফেটে পড়ে। Cruise Missile হল রকেটহীন স্বচালিত সোজাসুজি দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া ক্ষেপণাস্ত্র।

তথ্যসূত্র :

1. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): An Emerging Technology for Logistics, International Journal of Business and Management Invension Volume 5, Issue 5, PP-86-92.
2. Journal of Mathematics Research, ISSN-0315-3681, Volume 120, 2023

সহযোদ্ধা ডাক্তার বিনায়ক সেন, শহীদ হাসপাতালে আমাদের সহকর্মী, গুরুতর অসুস্থ। ইলিনা সেনের মৃত্যুর পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সাম্প্রতিক অতীতে ফ্র্যাকচার নেক ফিমার, তার অপারেশন, অপারেশনের পর বারবার মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ, শয্যাশায়ী থেকে শয্যা ক্ষত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভর্তি আছেন কলকাতার এক হসপিসে। দেখাশোনার জন্য কেবল তার মেয়ে প্রাণহিতা। আর্থিক দুরবস্থায় দিন কাটছে।

জীবনটা অন্যভাবে কাটতে পারত। ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজের শিশুরোগে স্নাতকোত্তর বিনায়ক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা শিক্ষক চিকিৎসক হিসেবে দেশে বা বিদেশে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। তেমনটা না করে কাটালেন মিশনারি হাসপাতালে, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক হাসপাতালে, নাগরিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে জেলের শলাকার পিছনে....

চিকিৎসক সমাজের বিবেক যেন বিনায়ক। সমাজকে তিনি অনেক দিয়েছেন, সমাজেরও বোধ হয় দায়িত্ব বর্তায় যাতে তাঁর দিনগুলি কিছুটা স্বচ্ছন্দে কাটে। সাধ্যমত তাঁর কন্যার একাউন্টে আসুন আমরা অর্থ জমা করি।

আশীষ কুমার কুন্ডু, চঞ্চলা সমাজদার, পুণ্যব্রত গুণ

Pranhita Sen
State Bank of India, Jadavpur University Branch. Account no. 44116420825 IFSC: SBIN0000093 Gpay +919619982356

প্রাণহিতার একাউন্টে জমার লিমিট ছাড়িয়ে গেলে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের একাউন্টে জমা দিতে পারেন—

SHRAMAJIBI SWASTHYA UDYOG
A/C NO- 0100000128050492
PUNJAB NATIONAL BANK
BRABOURNE ROAD BRANCH
KOLKATA-700001
IFS CODE-PUNB0010000

শিক্ষা প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গের বিগত পাঁচ দশকের শিক্ষা ব্যবস্থা: একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান

তপন সামন্ত

গত শতকের আটের দশকের শুরুতে যখন কলকাতায় স্নাতকোত্তর করতে আসি তখন জানতাম না 'এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা' শব্দবন্ধের একটি কবিতা আছে কবি শঙ্খ ঘোষের। জেনেছি অনেক পরে। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ যেভাবে বলেছেন তার বিপ্রতীপে থেকে ওই সময় বুঝেছিলাম কলকাতার মধ্যে আর একটা কলকাতা আছে। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাগুরু কলকাতা হচ্ছে কলকাতাসহ গ্রাম বাংলার গরীব নিম্নবিত্ত ও আংশিক উচ্চবিত্ত অংশ থেকে আসা, প্রথাগত শিক্ষায় ভালো ফল করা, বাংলাভাষী এবং বাংলা মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা। এই কলকাতার মধ্যেও ছিল অন্য একটি কলকাতা। সেই অন্য কলকাতার অতি সংখ্যালঘু এই বাসিন্দারা অবশ্যই উচ্চবিত্ত পরিবারের এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতো ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে, মিশত নিজেদের মধ্যে, তাদের পোশাকে সাজগোজে সর্বোচ্চ আধুনিকতার ছাপ। অপুষ্টি, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, হাড় জিরজিরে মেহনতী বিশ্বকে তারা করুণা করত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে খুবই প্রান্তিক হলেও বাংলা মাধ্যমের সহপাঠীদের প্রতি তাদের চোখে মুখে একটা উন্নাসিক তাচ্ছিল্য লেগে থাকত। দুর্ভেদ্য না হলেও একটা তারজালির বেড়া ছিল এই দুই কলকাতার মধ্যে। ব্যতিক্রম বাদ দিলে কলকাতার নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই দুটি কলকাতা স্পষ্ট ছিল বেশ। এই পাঁচিল মফঃস্বল শহর ও গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়েনি তখনও, যা এখন উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান প্রায় সব শহরে মফস্বলে। গ্রামগুলিতে বেশি দেরি নেই। পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াটিও গ্রামের সঙ্গে শহরের ছিল বেশ বৈষম্যমূলক—আমাদের শৈশব থেকে যদি আরও পিছোই তাহলে এই বৈষম্যগুলি আরো বাড়বে। তার মানে বৈষম্য কমানোর একটা চেষ্টা ছিল সরকারের, তবে বৈষম্যহীন শিক্ষা কখনোই ছিল না।

ঘুম ভাঙানিয়া.....

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের শাসন নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে, শিক্ষাক্ষেত্রটিও তার বাইরে নয়। তবুও একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে, বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাধিকারের প্রথম দিকেই রেখেছিল শিক্ষাকে। অনেক কান্না ঘাম রক্তের পথ পেরিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগণ পেয়েছেন সুনির্দিষ্ট বেতন ক্রম ও পেনশন বামফ্রন্ট আসবার পর। এর আগে শিক্ষকদের দুর্দশার কথা আলোচনায় আনছি না। সামগ্রিক শিক্ষক সমাজের ১৯৭৭ পূর্ব এই দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার বহু মর্মস্পর্শী ঘটনা স্থান পেয়েছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে। বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দিনে হা ক্লিষ্ট পরিবারগুলি থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের বুকে জমে থাকা তীব্র অভিমানও মুক্তি পেয়েছে সাতাত্তরের পর, ১২ ক্লাস পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায়, যা ছিল ভারতবর্ষে প্রথম।

নতুন ক্লাসে উঠে প্রাণ ভরে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নেওয়ার আনন্দানুভূতি আমরা খুব কমই পেয়েছি। অ্যানুয়াল পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরই প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিত গ্রামের ছাত্র সমাজের মধ্যে। চলত প্রতিযোগিতা। কে কার কাছ থেকে কতটা বেশি কমিশনে পুরনো অথচ পড়া যায় এরকম বই সংগ্রহ করতে পারবে তার প্রতিযোগিতা। বইতে যা দাম লেখা থাকতো তার পঁচিশ শতাংশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দিয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ঠিক তার নিচের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা বই কেনায় ব্যস্ত হয়ে পড়তো প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সরকারি খরচে প্রাথমিক স্তরের সব বই এবং মাধ্যমিক স্তরে গণিত ও ইংরেজি বই বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করে বামফ্রন্ট সরকার। তপশিল জাতি উপজাতিদের জন্য চালু হয় বুক গ্রান্ট। বামফ্রন্ট সরকার শেষের দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের পোশাকের অর্থ সরবরাহ করে। অল্প হলেও ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য সাইকেল দেওয়ার কাজ শুরু হয় তখন থেকেই।

শিক্ষার প্রসারে বড় বাধা হলো দূরত্ব। এই দূরত্ব কমানোর জন্য প্রতি গ্রামে গড়ে তোলে প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্তত একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতি পঞ্চায়েতে, প্রতি ব্লকে অন্তত একটি কলেজ। নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। গড়ে তুলেছে শিক্ষার বিপুল পরিকাঠামো। ফলে লক্ষ লক্ষ প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া আলোকিত হয়েছে শিক্ষার আলোয়। স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় যখন কড়া নাড়ছে হাজার হাজার পড়ুয়া, তখন সরকার মনোনিবেশ করেছে নতুন নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে। এর সঙ্গে গড়ে উঠেছে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর অনেক কলেজও। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন না হলে শিক্ষার অঙ্গনে এই বিপুল অংশের ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ ঘটতো না। অপারেশন বর্গা, ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষিজ ফসলের উৎপাদনে অনেকগুলিতে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করা, মৎস্য উৎপাদনে প্রথম স্থান দখল করা প্রভৃতি গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক ভিতকে শক্তিশালী করেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধারাবাহিক নিয়োগ, মাসুল সমীকরণ নীতি ও লাইসেন্স প্রথা রদ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কিছু শিল্প কলকারখানা স্থাপন হয়। অন্যদিকে বহু কলকারখানা রুগ্ন ও বন্ধ হয়ে এবং পুঁজি চলে গিয়ে শহর ও শিল্পাঞ্চলে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। আবার গ্রামাঞ্চলেও অপারেশন বর্গাসহ সংস্কারগুলি বন্ধ হয়ে জোতদার ও ধনীকৃষকরা পুনরায় ক্ষমতা সংহত করে।

আটের দশকের শুরুতেই দ্বিতীয় ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি কোন শ্রেণী থেকে পড়ানো উচিত এবং কিভাবে পড়ানো উচিত তা নিয়ে শুরু হল প্রবল বিতর্ক। বামফ্রন্ট সরকার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করলো। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন দেশে উচ্চ প্রাথমিকের গোড়ায় দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা শুরুর উদাহরণসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদগ্ধ মানুষের মতামত উল্লেখ করে বামফ্রন্ট সরকারসহ সরকারে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠন সেই নীতির স্বপক্ষে প্রচারে সামিল হল। প্রবল বিরোধিতায় নামল বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষ করে এসইউসিআই, সঙ্গে অনেক বুদ্ধিজীবীও। বিরোধীদের যুক্তি ছিল - ইংরেজি না শেখার ফলে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে। আর যারা প্রাথমিক থেকে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন তাঁদের যুক্তি ছিল - এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষার শক্ত বুনিয়াদের উপর দ্বিতীয় ভাষা সহজে আয়ত্ত করবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এবং কিছুতেই ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে ছাত্ররা পিছিয়ে যাবে না। কী সরকার, কী বিরোধী সকলের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল ইংরেজি শিক্ষা। প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়ারা আসছে বিদ্যালয়ের অঙ্গনে, তাদের যে সব থেকে বেশি প্রয়োজন মাতৃভাষায় দখলদারি এবং ন্যূনতম আঙ্কিক জ্ঞান অর্জন, সেটি থেকে গেল সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আন্দোলন হতে পারত ভালো করে মাতৃভাষা ও গণিত শেখানোর জন্য। তার বদলে আন্দোলন গড়ে উঠলো ইংরেজি প্রাথমিক স্তর থেকে শেখানোর জন্য। আবার এই বিতর্ক যখন একেবারে শেষ হয়ে গেছে তখনই ওয়ান ম্যান কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে ইংরেজি পড়ানো শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে। বিতর্কের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় দুটি বড় গলদ রয়ে গেল। (১) কলকাতা ও শহরগুলিতে এলিট ও নামী ইংরেজি মিডিয়াম প্রাইভেট স্কুলগুলি সরকারের পদক্ষেপের বাইরে থেকে গেল। সেখানে ধনী ও ক্ষমতাবানদের পুত্র-কন্যারা ইংরেজি শিখতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। (২) বির্তকের অন্তরালে কিছু ব্যতিক্রম বাদে বাংলা মাধ্যমের সরকারি বিদ্যালয়ে কি বাংলা, কি ইংরাজি—শিক্ষার মান বজায় রাখা নিয়ে সরকার নজর রাখলেন না।

আর যে শিক্ষক সমাজ দীর্ঘ বঞ্চনার পর সম্মানযোগ্য বেতনক্রম, পেনশন ও সময়োপযোগী ডিএ-এর আওতায় চলে এলেন, সমাজ আশা করেছিল পাঠদানের কাজে তাঁরা হবেন আন্তরিক, সৃজনশীল। প্রাণ ঢেলে পড়াবেন, ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধা–অসুবিধার পাশে থাকবেন, ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত হলে কেন অনুপস্থিত সে কারণ অনুসন্ধান করে তার সমাধানের চেষ্টা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতা বুঝে, প্রয়োজনে স্কুলে অবসর সময়ে বা এগারোটা-চারটের বাইরেও শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদে হল বিপরীত। যে শিক্ষক সংগঠন দীর্ঘ সংগ্রামের কারিগর, ঐতিহ্যবাহী চুয়ান্ন'র আন্দোলনের সময় যারা ডাক দিয়েছিল - ধর্মঘটের ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেবে বাড়তি ক্লাস করে, যখন উচিত ছিল রাজ্যজুড়ে শেখানোর আন্দোলন গড়ে তোলার, তখন সেই শিক্ষক সংগঠনও কাউকেই চটাব না, সব বেনো জলই স্বাগত—এই সস্তা পপুলিজমে ঢুকে পড়ল। আরেকটি গুরুতর রোগ ছড়িয়ে পড়ল অর্থাৎ নিজস্ব ও সংগঠনের সুবিধাবাদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দলবাজি যাকে বিরোধিরা 'অনিলায়ন' নাম দিয়েছিলেন। দল বা দলের শিক্ষা সংগঠনে নাম থাকলেই চলবে। স্কুলে না এলে, না পড়ালে, ইচ্ছে মত প্রাইভেট কোচিং করলেও কেউ কিছু বলবে না। উপরন্তু ভাল পোস্টিং সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী শিক্ষক স্কুল কমিটি, পঞ্চায়েত সহ সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে ক্ষমতার মধুভাণ্ডারটিও দখল করে নিলেন। স্কুলের চাকরি ও মাইনে ছাড়লেন না, স্কুলে যাওয়া ও পড়ানো হয়ে গেল তাদের কাছে একটি গুরুত্বহীন বিষয়। বিরোধী বা অন্য শিক্ষক সংগঠনের প্রসঙ্গ আনছি না, কারণ তাদের একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক করে রাখা হয়েছিল। সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিরও শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রশ্নে যে আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল সেটাও ছিল তাদের উপলব্ধির বাইরে। তারা কেবল দলের কর্মসূচি রূপায়ণে মনযোগী ছিল।

শুধু লিখতে পড়তে পারা না, শিক্ষা একটা আন্দোলন। প্রকৃত শিক্ষায় হৃদয়ে ওঠে ঝড়। সেই ঝড়ে অন্ধকারের ধুলোবালি থেকে জমাট পাথর হৃদয় খালি করে দিতে বাধ্য হয়, জ্বলে ওঠে অসংখ্য প্রদীপ, দূর হয়ে যায় মনের গভীরের অন্ধকারও। ব্যক্তি মানুষ সব অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার ও সব রকম মৌলবাদ সরিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে কার্য–কারণ সম্পর্কের উপর। এরকম লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি মানুষ যে সমাজটা গড়ে তোলে সেটা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যেতে পারে না। এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল না সমাজ পরিবর্তনের ডাক দেওয়া কুশীলবদের, বা থাকলেও সেই ভাবনা রাজ্য জেলা ব্লক গ্রামের বিপুল কর্মীবাহিনীর মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়েও আসেনি। ফলে যখন পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় ছাত্র-যুব-মহিলা-শিক্ষক-কৃষক-শ্রমিক সংগঠন সহ পঞ্চায়েত ও শিক্ষানুরাগী প্রগতিশীল মানুষদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করে প্রকৃত অর্থেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তরিক ও সার্বিক আন্দোলন গড়ে তোলার দরকার ছিল, প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়ারা বাঁধ ভেঙ্গে শিক্ষার অঙ্গনে আসছে এই আত্মতৃপ্তিতে, সেই কাজটির সূচনাই হলো না। এমনকি এই প্রশ্নটাও জাগেনি যে, যে কেরালা নিয়ে এত গল্প, চৌঁত্রিশ বছর ধরে সেই কেরালার ধারে কাছেও পৌঁছানো গেল না কেন ২০১১ সালে এসে। প্রাথমিকে বিভিন্ন ক্লাসের মূল্যায়নে নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর বলে দিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাজ্যে শিক্ষার মান যে কাঙ্খিত উচ্চতার উর্ধ্বে তা দেখানোর প্রবণতাও সর্বজনবিদিত।

চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের শুরুর সময় থেকেই দেশ উদারনীতির স্রোতে গা ভাসাতে শুরু করেছে। শিল্প ও কৃষির সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রগুলিতে তখনই শুরু হয় বেসরকারি উদ্যোগের রমরমা। পশ্চিমবাংলাও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি এই রমরমার হাত থেকে। যখন এটা প্রমাণ করার দায় ছিল যে সরকারি স্কুলগুলিতে লেখাপড়ার মান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ভালো, তখন পশ্চিমবাংলার মোটা মাইনের শিক্ষকরা 'আসি যাই মাইনে পাই' গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে 'পরের ছেলের নাম পরমানন্দ যতই উচ্ছন্নে যায় ততই আনন্দ' উপভোগ

করতে করতে নিজের সন্তানকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে বে-আব্রু করেছে নিজেদের অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার কঙ্কালকে। বেসরকারিকরণের বিরোধিতা মুখে করলেও, সরকারও এর প্রতিকারে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

এতকিছু মন্দের মধ্যেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা দূর করতে সচেষ্ট ছিল তৎকালীন সরকার। স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন করে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে শিক্ষক নিয়োগের কাজটি নিরলস ভাবে করেছে ১৯৯৭ সাল থেকে।

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা.....

পট পরিবর্তন হলো ২০১১ সালে। মানুষের অন্নবস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন হয়নি, হয়েছে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের উদ্গীরণে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। পরিবর্তন চাই - এটাই ছিল সরকার পরিবর্তনের মূল কথা। পরিবর্তন করে কারা সরকার গড়বে, কোন নীতিতে সরকার পরিচালিত হবে - এগুলি বিবেচনার মধ্যেই আসেনি। সরকার পরিবর্তনের প্রশ্নে অতিবাম থেকে অতিডান ও তাদের মাঝে থাকা সকল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিসহ বুদ্ধিজীবী বিদ্বজনদের বৃহৎ অংশের সমাবেশ ঘটলো যে শক্তিকে কেন্দ্র করে, তাদের না ছিল কোন নীতি না ছিল রাজনৈতিক মতামতের স্পষ্টতা। কোন নীতি না থাকাটাই তাদের নীতি। সংসদীয় রাজনীতিতে এর সুবিধা অনেক। আগে কী বলেছি, এখন কী বলছি, দুটি বক্তব্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য কেন, তার জবাবদিহি করার কোন দায় থাকে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য—যে কোন মূল্যে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতায় টিকে থাকা। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কংগ্রেসের জঠরে তাদের জন্ম আর বাড়-বাড়ন্ত জগাখিচুড়িতে। এই সুযোগে অপারেশন বর্গা ও খাস জমি বিলি বন্টনের মাধ্যমে পর্যুদস্ত হয়ে যাওয়া জোতদার ও ধনীকৃষকদের উত্তর পুরুষরা বাম আমলের মধ্যভাগ থেকেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, এবার জার্সি বদল করে তারা আগ্রাসী হয়ে উঠল। পুরানো আক্রোশ মেটানো ও জমি পুনর্দখলের চেষ্টা শুরু হল, সরকারের আয়ু যত বাড়লো, সরকার গড়ার নেপথ্যে থাকা বামপন্থীরা হয় অদৃশ্য হয়ে গেল অথবা যে বর্ণ ধারণ করল তা থেকে তারা বাম না ডান তা বোঝা মুশকিল। ব্যাপক দুর্নীতি আর কেন্দ্রের সরকারের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করে মন্দির-মসজিদ পুরোহিত-ইমাম রাজনীতির ঘোলা স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নিজেদের সুযোগ সুবিধার জন্য সমস্ত ক্ষমতা কব্জা করা এক স্বৈরাচারী খামখেয়ালী ক্ষমতালোভী নেত্রীর চাটুকারে পরিণত হলেন। ফলস্বরূপ: গরিব মেহনতী মানুষদের সন্তানদের শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসা যে তাদের অভিমুখ ছিল এবং এ কাজে তারা সফল হয়েছিল, একথা 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' ছাড়া সকলেই স্বীকার করবেন। স্বাভাবিকভাবেই ২০১১ সালে যে সরকারটা গড়ে উঠেছে তার কাছ থেকে 'সকলের জন্য শিক্ষা' আশা করাটাই সোনার পাথর বাটি। কাজেই—

১। পঞ্চায়েত হল বখরা ভাগের জায়গা আর, স্কুলগুলো হয়ে উঠল পঞ্চায়েত অফিস। মিড ডে মিল খাওয়ানো, নানা রকম স্কলারশিপের জন্য নাম নথিভুক্তকরণ, বই খাতা ব্যাগ পোশাক বন্টন, সাইকেল বন্টন, ট্যাব বন্টন, কন্যাশ্রী প্রভৃতি নানা রকমের প্রকল্প চালু হল স্কুলে। প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সুনির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম কানুন রয়েছে। সেই নিয়ম মেনে প্রকল্প রূপায়ণ হওয়া উচিত, কিন্তু হলো উল্টো। নিয়ম ভাঙ্গার জন্য পঞ্চায়েতের মেম্বার থেকে বিডিও এসডিও ডিএম–দের তর্জনী ধেয়ে এল বিদ্যালয়ের প্রধানদের দিকে, যা অতীতে কখনো হয়নি।

২। প্রধান শিক্ষকদের মান-সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে শুরু হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলিকে হত্যা করা। আগে বিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় নির্বাচিত অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর প্রতিনিধি নির্বাচনের সঙ্গে পঞ্চায়েত/পৌরসভার মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হতো পরিচালন সমিতি। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রতিনিধিরাও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হতেন। সব জায়গায় বসে গেল সরকার মনোনীত প্রতিনিধিরা ফলে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে একক মানুষের তুঘলকী সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত করবার দায় পড়ে গেল বিদ্যালয় প্রধানদের উপর। স্কুল কবে খোলা থাকবে কবে ছুটি হবে সেই সিদ্ধান্তও নিচ্ছেন ওই একক ব্যক্তি। অলিখিত নিয়ম চালু হয়ে গেল স্কুলে স্কুলে - সরকারি মনোনীত প্রতিনিধিরা (অবশ্যই তিনি সরকারি দলের) বলবেন শেষ কথা। এক কথায় এমন একটা ব্যবস্থা কায়েম করা হলো যে, প্রধানশিক্ষক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অভিভাবকরা নয়, ওই প্রতিনিধিই থাকবেন স্কুল পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কার্যত সরকারি দলের নেতা-নেত্রীদের জমিদারি হয়ে গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তথ্য আদান প্রদানের করণিক হয়ে গেলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানেরা।

৩। শিক্ষক সমাজকে কোন দৃষ্টিতে এই সরকার দেখে তা স্পষ্ট হয়ে যায় রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বদলে রিলিফ-এর কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যে সরকারের উদ্দেশ্য, সেই সরকার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে অকেজো করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেবে বা নিয়োগ করতে বাধ্য হলে কমিশনে নিজের পেটোয়া লোক বসিয়ে সরকারি দলের অনুগ্রহ প্রার্থীদের অর্থের বিনিময়ের নিয়োগ করবে। সেটাই স্বাভাবিক। আর হলও তাই।

৪। বন্ধ হয়ে গেল শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া:

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসবার পর যেমন প্রচুর স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, তেমনি জেলা প্রাথমিক স্কুল বোর্ডের মাধ্যমে প্রাথমিকে এবং স্কুল পরিচালন সমিতির মাধ্যমে মাধ্যমিকে নিয়োগ হয়েছিল হাজার হাজার শিক্ষকের। স্কুল পরিচালন সমিতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ ওঠে। তা দূর করবার লক্ষ্যে

গড়ে ওঠে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এই কমিশন অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে ধারাবাহিক নিয়োগের কাজ করে গিয়েছে।

পরবর্তী সরকার শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রথম থেকেই ছিল ভীষণ উদাসীন। দু একটি যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়েছে তা সীমাহীন দুর্নীতির পাঁকে ডুবে রাজ্যের সমগ্র পরিবেশকে পুতিগন্ধময় করে তুলেছে। ২০১৬ সালে উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা বহু আইনি জটিলতা পেরিয়ে গত বছর এপ্রিল মাসে ৯৭০০ জনকে নিয়োগ করতে পেরেছে। বাকি নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে ২০১৬ এর এসএলএসটি নিয়ে যে কুনাট্য চলছে সকলেরই জানা। এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষক অবসর গ্রহণ করছেন, নিয়োগ বন্ধ বছরের পর বছর, অথচ তার কোন প্রতিফলন নেই সরকারি নথিতে। তথ্যের কারচুপিতে সব ঢাকা দেওয়া হচ্ছে।

৫। বেহাল হলো শিক্ষা ক্ষেত্র—সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র ভর্তি ক্রমশ কমছে আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাড়ছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা।

ক) স্কুলের সংখ্যা

	১৯৭৭	২০১১
প্রাথমিক স্কুল	৪১৬৫৯	৭৪৭১৭
মাধ্যমিক স্কুল	৩৭৬২	১০০২৭

২০১১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা ৯০ লক্ষের বেশি বেড়েছে। সমানুপাতিক হারে স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি। DISE (২০২৪-২৫) অনুযায়ী মোট স্কুলের সংখ্যা ৯৩ হাজার ৭১৫। এর মধ্যে ৩৮১২ টি স্কুলে কোনো ছাত্র নেই, ৬৪৮২ টি স্কুলে একজন করে শিক্ষক। এই হিসেবকে বিচারের মধ্যে আনলে প্রকৃতপক্ষে ২০১১ এর তুলনায় স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি বললে চলে।

গত ১০ বছরে বন্ধ হয়ে গেছে ৭০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়, এখন বন্ধ হওয়ার মুখে ৮২০৭ টি।

খ) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত—২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ছিল ৩১.৫ঃ১। এখন কত তা স্পষ্ট নয়। ২০২৪-২৫ সালের তথ্য DISE-এর তথ্য অনুযায়ী ২৯ঃ১। দৃশ্যতঃ সত্যতা নেই এই তথ্যের। মুর্শিদাবাদের ১১ টি ব্লক থেকে ২০টি বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে এই অনুপাত হল ১ঃ৭৪.৩৩। এটিও অসম্পূর্ণ তথ্য। মিউচুয়াল ট্রান্সফারের কারণে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শহরে আসার পথ প্রশস্ত হয়েছে। ফলে শহর ও শহর সংলগ্ন স্কুলগুলিতে গ্রামের তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অনেক বেশি।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের প্রশ্নে একটি বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। সেটা হল - আমাদের রাজ্যে স্টাফ প্যাটার্ন ছিল অন্য রাজ্যগুলির থেকে আলাদা। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক এই দুটি ভাগ ছিল স্টাফ প্যাটার্নের। সুদূর অতীত থেকে শিক্ষকদের নিয়োগও হয়েছিল সেভাবেই। বছর পনেরো আগে মাধ্যমিক স্তরের স্টাফদের বিভাজিত করা হলো উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—এই বিভাজনে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য। কিন্তু কোন নিয়মে ভাঙ্গা হবে তার কোন সরকারি নির্দেশিকা না থাকায় স্কুলগুলি নিজের মতো করে এই বিভাজন করতে বাধ্য হয়েছে। সুনির্দিষ্ট নর্ম মেনে এই বিভাজন না হওয়ার ফলে স্তরভিত্তিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের মধ্যে বেশ বিভ্রান্তি আছে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আর একটি বিষয়ও খেয়াল রাখা উচিত। সেটি হল—কোন স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কতগুলি পড়ানোর বিষয় আছে। পড়ানোর বিষয় বেশি হলে, বিষয় অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত স্বাভাবিকভাবেই কম বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অনেক স্কুলে কমার্স আছে, ইকোনমিক্স আছে। কিন্তু এখন এই বিষয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশ কম, অথচ বিষয়গুলি পড়াবার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত কম হলেও চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই।

গ) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—বিভিন্ন সরকারি তথ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার হদিশ মেলে না। যা তথ্য পাওয়া যায়, সবেতেই থাকে শতকরা হিসেব। খবরের কাগজে প্রকাশিত তথ্য থেকে ছাত্র সংখ্যার বিষয়ে যা জানা যায় সেগুলি হল—

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১১ সালে ৮০ লক্ষ (মোট ছাত্রের ৯৯.৩% ছাত্র) পড়তো, এখন পড়ছে ৫৩ লক্ষ।
- গত পাঁচ বছরে স্কুলে ভর্তি কমেছে ১৬ লক্ষ। ২০২৪ এর তুলনায় ২০২৫ কমেছে ৪ লক্ষ।
- ২০১১ থেকে ২০২৪ এই সময়কালে সরকারি স্কুলে ৮% কম ভর্তি হয়েছে অথচ বেসরকারি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ৫৮%।
- 'জার্নাল অফ ইমার্জিং টেকনোলজিস অ্যান্ড ইনোভেটিভ রিসার্চ' দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় করা একটি সমীক্ষায় জানাচ্ছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ঐ জেলায় ২০১১ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬,৭১,২৫৫ (যার ৯০.৪% জন সরকারি স্কুলে পড়তো)। আর ২০১৫ সালে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০৫,৭৯২ (যার ৮০.৫৬% সরকারি স্কুলে পড়তো)।

ঘ) ড্রপ আউট—

- ২০০৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ২৪,১৬,০৫৯ জন। ২০১৮ তে এরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। ওই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১১,২৯,৯২১ জন। অর্থাৎ ২০০৮ ভর্তি হওয়া অর্ধেকের বেশি ছাত্র-ছাত্রী হারিয়ে গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে।
- ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে ৭২,৭৬,৩৮৫। অথচ ২০১১ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ৩১,০০০। ২০১১ তে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ, সেটা ২০২৫ এ হয় ৯,৬৯,৪২৫।
- উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজের দিকে তাকালে ছবিটা আরো করুন হয়ে যায়। ২০২৩ সালে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পাস করেছিল। ২০২৫ সালে তারাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। সে বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৭০

হাজার। অর্থাৎ ড্রপ আউট হয়ে গেল ৯৫ হাজার। এর মধ্যে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু ওই বছরে কলেজে ভর্তি হয় ২ লক্ষ ৭০ হাজার। হারিয়ে গেল ১ লক্ষ ৬০ হাজার। এমন বহু কলেজ আছে যেখানে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের বেশি আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় না।

৬। প্রাইভেট টিউশনি—

- দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত নমুনা সমীক্ষার ৮০তম রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র পিছু খরচ গ্রামে ৩৮৪০৩ টাকা ও শহরে ৯১৭৫২ টাকা। শহরে এর থেকে বেশি খরচ হয় অরুণাচল, হরিয়ানা, সিকিম, পাঞ্জাব ও তেলেঙ্গানায়। বেসরকারি স্কুলগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত টিউশন ফি ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য সার্বিক গড় এত বেশি হয়েছে অনুমান করা যায়। আবার সরকারি স্কুলগুলিতে যেহেতু ডেভেলপমেন্ট ফি বাবদ ২৪০ টাকার বেশি নেওয়া হয় না এবং বই খাতা ইত্যাদির অনেকটাই সরকারিভাবে সরবরাহ করা হয়, সেহেতু ধরে নেওয়া যায় প্রায় সব খরচটাই হয় প্রাইভেট টিউশান নেওয়ার জন্য। সমীক্ষার রিপোর্টও সেই তথ্য সমর্থন করে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাধ্যমিকে ৯১% ও উচ্চমাধ্যমিকে ৯০% ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট টিউশান নেয়, যেখানে জাতীয় গড় হল মাত্র ১৯.৮%।
- ২০১০ সালে মাধ্যমিক স্তরে প্রাইভেট টিউশানের জন্য ছাত্র পিছু ১২৮১ টাকা খরচ করতেন অভিভাবকেরা, সেখানে এখন খরচ করেন গ্রামে ১১৫৪২ টাকা (উপরে ত্রিপুরা, মনিপুর, গোয়া) এবং শহরে ১৮৭০৬ টাকা। আর উচ্চমাধ্যমিকে এই বাবদ অভিভাবকরা খরচ করেন গ্রামে ১৭৪৮৩ টাকা (রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ) ও শহরে ২৪৭৯১ টাকা (তৃতীয় স্থানে, উপরে ত্রিপুরা ও মনিপুর)। স্তর অনুযায়ী প্রাইভেট টিউশনি নেওয়ার ছবিটি নিম্নরূপ—

স্তর	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
প্রাক-প্রাথমিক	পশ্চিমবঙ্গ ((৩৭.১%)	উড়িষ্যা ((৩৪.২%)	ত্রিপুরা (৩৩.৮%)
প্রাথমিক	ত্রিপুরা (৭৫.৫%)	পশ্চিমবঙ্গ (৭৩.৪%)	উড়িষ্যা (৫৯.৭%)
উচ্চ প্রাথমিক	ত্রিপুরা (৯১.২%)	পশ্চিমবঙ্গ (৮৬%)	বিহার (৬৭%)
মাধ্যমিক	ত্রিপুরা (৯৪%)	পশ্চিমবঙ্গ (৯০.৫%)	বিহার (৭৫.৬%)
উচ্চ মাধ্যমিক	ত্রিপুরা (৯৩.৩%)	পশ্চিমবঙ্গ (৮৯.৫%)	বিহার (৬৫.৩%)

৭। শিক্ষার মানঃ এত টিউশনি নেওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার মানের অবনমন ঠেকানো যায়নি। ASER 2024 এর গ্রামীণ পশ্চিমবাংলার রিপোর্ট থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল –

পঠনের মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শতকরা হার

শ্রেণী	অক্ষরও চেনে না	অক্ষর চেনে	শব্দ পড়তে পারে	প্রথম শ্রেণীর বই পড়তে পারে	দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়তে পারে	মোট
প্রথম	১৫.৯	৩৩.৪	২৭.৯	১২.৯	৯.৯	১০০
দ্বিতীয়	৯.২	২০.২	২২.৭	২১.৫	২৬.৪	১০০
তৃতীয়	৬.১	১৫.৩	১৯.৯	২২.৪	৩৬.৩	১০০
চতুর্থ	৫.২	১১ .১	১৬.৪	২০.৩	৪৭.০	১০০
পঞ্চম	৩.৫	৯.৫	১৩.৮	১৮.৬	৫৪.৬	১০০
ষষ্ঠ	২.৭	৭.৫	১০.৮	১৭.৩	৬১.৭	১০০
সপ্তম	১.৮	৬.৬	১১.১	১৫.৮	৬৪.৮	১০০
অষ্টম	২.০	৩.৪	৮.৩	১৫.১	৭১.৩	১০০

অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ধরলে তাদের ২% অক্ষর চেনে না, ৩.৪% অক্ষর চেনে বাকি কাজ করতে পারে না, ৮.৩% শব্দ পড়তে পারে বাকি কাজগুলি পারে না, ১৫.১% প্রথম শ্রেণীর বই পড়তে পারে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়তে পারে না আর, ৭১.৩% দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়তে পারে।

পাটিগণিতিক ধারণার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা হার

শ্রেণী	১ থেকে ৯ ও চিনতে পারেনা	চিনতে পারে ১-৯	চিনতে পারে ১১-৯৯	বিয়োগ করতে পারে	ভাগ করতে পারে	মোট
প্রথম	১৪.৩	৪২.৮	৩১.২	৯.০	২.৭	১০০
দ্বিতীয়	৬.৬	২৮.২	৩৪.৬	১৭.৪	১৩.২	১০০
তৃতীয়	৪.৪	১৯.৫	৩৫.২	১৮.৬	২২.৩	১০০
চতুর্থ	২.৮	১৪.১	৩৫.২	১৮.৮	২৯.২	১০০
পঞ্চম	২.৪	১১.৮	৩২.৯	১৭.৯	৩৫.০	১০০
ষষ্ঠ	২.৩	৮.২	৩৭.৯	১৭.৩	৩৪.২	১০০
সপ্তম	১.০	৭.১	৩৮.৯	২০.২	৩২.৮	১০০
অষ্টম	১.৪	৫.৬	৩৯.৬	১৯.৬	৩৩.৭	১০০

অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ১.৪% ১ থেকে ৯ সংখ্যাও চেনে না, ৫.৬% শুধুমাত্র ১ থেকে ৯ সংখ্যা চিনতে পারে, ৩৯.৬% ১১ থেকে ৯৯ সংখ্যা চিনতে পারে কিন্তু বিয়োগ বা ভাগ করতে পারে না, ১৯.৬% বিয়োগ করতে পারে কিন্তু ভাগ করতে পারে না, ৩৩.৭% ভাগও করতে পারে।

৮। ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ এর UDISE থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অরুণ সি মেহতা (ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং Educational management information system বা EMIS বিভাগের প্রধান, National Institute of Educational Planning and Administration বা NIEPA, নিউ দিল্লি) পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল - i) দেশের অনথিভুক্ত শিশুদের অর্ধেক থাকে পশ্চিমবাংলায় এবং ৩৮ শতাংশের কম স্কুলে পঞ্চাশ বা তার থেকে কম ছাত্রছাত্রী পড়ে। ii) প্রাথমিক স্তরে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বা নেট এনরোলমেন্ট রেশিও উচ্চমানের হলেও, মাধ্যমিক স্তরে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও লক্ষণীয়ভাবে কমে ৮৮.২ থেকে ৪৬.১ হয়েছে এবং উচ্চমাধ্যমিকের কমে গিয়ে হয়েছে ২৯.১। এই তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে বয়সন্ধিকালের কিশোর কিশোরীদের অর্ধেকই প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে উচু ক্লাসগুলিতে iii) প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপ আউট ৮.৬ পার্সেন্ট থেকে কমে ১.৪% হয়েছে এবং প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিকে ভর্তি হচ্ছে ৯৯%, কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ড্রপ আউট প্রায় ২০%, যার ফলে নবম-দশম স্তরটি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছে iv) ডিজিটাল এবং উন্নত সুযোগ

সুবিধার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ফাঁক থেকে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক চতুর্থাংশ স্কুলে কম্পিউটার এবং এক পঞ্চমাংশ স্কুলে ইন্টারনেট রয়েছে, যেটা জাতীয় গড় কিংবা কেরালাম ও তামিলনাড়ু অপেক্ষা যথেষ্ট কম।

৯। কন্যাশ্রী প্রকল্প: কন্যাশ্রীও রোধ করতে পারছে না নারী শিক্ষার অবনমন—

- ২০২৪ সালে কন্যাশ্রী প্রকল্পে ২৫০০০ টাকা পেতে পারে এমন ছাত্রীদের অর্ধেক আবেদনই করেনি।
- সরকারি দলের বহু আঞ্চলিক নেতা-নেত্রীই গায়ের জোরে তথ্য গোপন করে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়া ছাত্রীদের কন্যাশ্রীর ভাতা অবৈধভাবে পাইয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকেন বিদ্যালয় প্রধানদের উপর। নির্দ্বিধায় অবিবাহিত শংসাপত্র পেয়েও যায় বিবাহিত অনূর্ধ্ব ১৮ ছাত্রীরা। সবকিছু জেনেও চুপচাপ থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকে না বিদ্যালয় প্রধানদের।
- লেখা পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েরা এতই অনুৎসাহী হয়ে পড়েছে যে, আগে অভিভাবকেরা ১৮ বছরের নিচে বিবাহের ব্যবস্থা করলে মেয়েরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হতো, এখন আঠারো বছরের নিচে থাকা মেয়েরাই অভিভাবকের সম্মতিকে তোয়াক্কা না করে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ছে।
- জাতীয় ক্ষেত্রে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিবাহের গড় হার যেখানে ২৩.৩% সেখানে রাজ্যের গড় হল ৪২%। ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে মা হয়েছেন এমন জাতীয় গড় ৯%, আর রাজ্যে গড় হল ১৬%। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কিশোরী মায়ের বিচারে মুর্শিদাবাদ জেলা হলো বিশ্বে প্রথম। নাবালিকা বিবাহতে পশ্চিমবঙ্গ দেশের প্রথম সারিতে।

১০। শিক্ষা দুর্নীতি:—এই দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অপরাধে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন সহ সরকারের ২৪টি সংস্থা এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, এমএলএ, পর্ষদ-সংসদ-কমিশনের মুখ্য আধিকারিক সহ ৫৪ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের ব্যাপম কেলেঙ্কারির সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃহত্তম এই শিক্ষা কেলেঙ্কারি। প্রচুর টাকা ঘুষ নিয়ে ওএমআর টেম্পারিং ও র‍্যাঙ্ক জাম্প করে যোগ্যদের টপকে নিয়োগ করা হয়েছে অযোগ্যদের ও শাসকদলের অযোগ্য ঘনিষ্ঠদের। তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয়নি সরকারের। উল্টে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি বাধ্য হয়ে যে ১৮০৪ জন দাগি শিক্ষকের নাম প্রকাশ করেছে, তাদেরকে চোরাগোপ্তা পথে বহাল রাখার জন্য মন্ত্রিসভাকে ব্যবহার করতেও চক্ষুলজ্জা হয়নি সরকারের। খাটের তলায় যে এত নগদ টাকা রাখা যায় আর একজন এমএলএ যে পাঁচিল টপকে পুকুরে মোবাইল ছুঁড়ে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে পারেন তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল পশ্চিমবাংলার মানুষ। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সুচারু রূপে প্রসারিত হয়েছিল অবৈধ লেনদেন ও প্রতারণার জাল। অনুপ্রেরণার প্রসাদ ধন্য শাসক দলের কেষ্ট-বিষ্টু থেকে পাড়ার তোলাবাজ কর্মীরা গড়ে তুলেছিল এই জাল। কিন্তু সারদা থেকে অভয়া তদন্তের মত মাথাদের কাছে পৌঁছনোর আগেই তদন্ত আটকে গেল।

১১। আন্দোলন এখনো অব্যাহত—

- পথে বসে আছেন ২০২২ এ প্রাথমিক টেট পাস করা যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষকদের এক লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবনে ওই প্রার্থীদের ডিএলএড ঐক্যমঞ্চ গত উনিশে আগস্ট পঞ্চাশ হাজার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির দাবিতে অভিযান করতে চেয়েছিল। কিন্তু করুণাময়ী পৌঁছাতেই শুরু হয়ে যায় ব্যাপক ধরপাকড়। দীর্ঘক্ষণ থানায় আটকে রাখার পর ১৬৮ নম্বর ফরমে (যাতে দু'দিন তারা ওই চত্বরে আন্দোলন করতে পারবে না ও সমাজ মাধ্যমে এ বিষয়ে কোন পোস্ট করতে পারবে না) সই করিয়ে মুক্ত করা হয় তাঁদের।
- ক্ষমতায় আসবার আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন দশ হাজার মাদ্রাসা স্থাপন করবেন। সেটা যে ক্ষমতা দখলের জন্য গাজর ছিল এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার যাওয়ার সময় রাজ্যে ৬১৪ টি হাই ও সিনিয়ার মাদ্রাসা ছিল। তারপরে একটিও বাড়েনি। ২০১৩ সালে ২৩৫ টি আনএডেড মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাম্মানিক প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। গত ১৩ বছরে বেতন তো দূর অস্ত, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোশাক এমনকি মিড ডে মিলের বরাদ্দও আসছে না। ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাসা ঐক্য মঞ্চ বিধাননগর সিটি সেন্টার এক নম্বর মেট্রো রেল স্টেশনের কাছে অবস্থানে বসে। অবস্থানে বসার অনুমতি পুলিশ দেয়নি, হাইকোর্ট থেকে আদায় করতে হয়েছিল অনুমতি। অবস্থানের ১৩ দিনের মাথায় ঐক্য মঞ্চ কালীঘাট অভিযানের ডাক দেয়। হাজরা নেতাজি ভবন মেট্রোতে জমায়েত হতেই টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে দেয়া হয় তাঁদের। ১১ জন শিক্ষিকা সহ ১৪১ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। , প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯৭১ থেকে ৭৭ সময়কালে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকার খরচ করেছিল মাত্র ৫.৬০ লক্ষ, ২০১০-১১ তে সেই খরচ দাঁড়ায় ৫.৭৪ কোটি টাকায়। ২০৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ২৩৮, ২০১০-১১ তে হয়েছে ৬০৫। ১৯৭৭-৭৮ মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৩৩৮, ২০১০-১১ তে হয়েছে ৪.৭৮ লক্ষ।
- পার্শ্ব শিক্ষক, কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষক, বৃত্তিজীবী শিক্ষক, মিড ডে মিল কর্মীগণ ভাতা বা বেতন বৃদ্ধি সহ চাকুরী জীবনের সম্মানজনক ও নিরাপত্তাজনিত সুযোগ-সুবিধার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে আন্দোলন করছেন তার প্রতি সরকারের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না।

১২। পরিযায়ী শ্রমিক: এখন কলেজে ছাত্ররা আসে কেবলমাত্র

পরীক্ষা দেওয়ার সময়। ক্লাস করে গুটি কয়েক ছাত্র। ছাত্রীদের মধ্যেও একই প্রভাব সঞ্চারিত হচ্ছে। ছাত্রদের কলেজে না আসার কারণ বেশিরভাগ ছাত্রই এখন পরিযায়ী শ্রমিক। নানা রকম স্কলারশিপ ও ভাতা তাদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখতে পারছে না, কারণ লেখাপড়ার পর কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ রাজ্যে নেই। তাই বেশিরভাগ ছাত্রই শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে চলে যায় ভিন্ রাজ্যে। কলেজের এই প্রভাব চুঁইয়ে নেমে গেছে নবম শ্রেণী পর্যন্ত। নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রদের স্কুলে অনুপস্থিতির প্রধান কারণও তাই। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্যত্র চলে যাওয়া। উচ্চ মাধ্যমিকে স্তরেও নিয়মিত স্কুলে না যাওয়া অলিখিত নিয়ম। পাঁচ বছর আগেও উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের দিন স্কুলে যেত, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজের মতো উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়াদের কেবলমাত্র পরীক্ষা দেওয়ার জায়গা এখন স্কুল। এই বিষয়ে সকলেই উদাসীন।

যন্তর মন্তর.....

বর্তমান আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে 'দুর্গা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন আরএসএস প্রধান। আর যে রাজনৈতিক দলের প্রাণ ভোমরা আরএসএস, তারাই কেন্দ্রের এবং রাজ্যের শাসকদল। সেই দলের নেতৃত্বে দেশে এখন অমৃতের বন্যা বইছে। ২০৪৭ সালে নাকি আমরা অমৃত ভারতে পৌঁছাব। সেই অমৃতের মাহাত্মে ধর্মনিরপেক্ষতার চিতায় অগ্নিসংযোগ করে দেশ এখন যাত্রা করছে শ্রীরামচন্দ্রের সত্যযুগের দিকে। তাই ফিলান্থ্রোপিকদের উপর দায়িত্ব বর্তাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর। সেরকমই কথা বলা আছে দেশের ২০২০ সালের নিউ এডুকেশন পলিসিতে। তবে গোপন কথা হলো সকল ধর্মের ফিলানথ্রোপিক প্রতিষ্ঠানগুলি সেই সুযোগ পাবে না, সুযোগ পাবে সংঘ অনুগামী ফিলানথ্রোপিক সংগঠনগুলি। দেশ জুড়ে বিপুল তাদের নেটওয়ার্ক। শুধু বিদ্যাভারতীর স্কুল আছে ১২৮৫০, সেই স্কুলে ৩৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়ে। ২০২২-২৩ সালের হিসেব এটি। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করবে তারা। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্গালোরে চাণক্য বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। গত ১০০ বছর ধরে তারা গড়ে তুলেছে এই নেটওয়ার্ক। এই সবগুলিতে চলছে অমৃতের চাষ।

নেপ ২০২০ তে চালু হলেও পলিসিটা পুরনো। পঁচিশ বছর আগেও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোসফিক্যাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডভান্স স্টাডিজ রিসার্চ সংস্থাগুলির মাথায় যাঁদের বসানো হয়েছিল তাঁরাও ছিলেন ফিলানথ্রোপিক এবং সকলেই দেশের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় গোষ্ঠীর। দেশের তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী ইউজিসি মারফত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্যোতিষ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০১৪ সালের পর আরো পাকাপোক্ত হয়েছে তাদের মসনদ। তাই আস্তিনের ভেতরে থাকা গোপন তাসগুলি বেরোচ্ছে একে একে। বিজ্ঞানের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত। সংস্কৃতই নাকি হতে চলেছে কম্পিউটারের অত্যাধুনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। এই ভাষ্যের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অথচ বোম্বে আইআইটির সমাবর্তনে একথা বলেছেন এক মন্ত্রী। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার এবং মনগড়া ধারণার উপর গড়ে ওঠা গোমূত্র বাস্তুবিদ্যা পুরোহিততন্ত্র জ্যোতিষ প্রভৃতি বুজরুকিকে বিজ্ঞানের মোড়কে ভরার জন্য গাল ভরা নাম দেয়া হয়েছে 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ন'টি বিষয়ে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের সিলেবাস বানানো হয়েছে। যেমন আধুনিক রসায়নে ঢোকানো হয়েছে আয়ুর্বেদিক খাদ্যাভ্যাস, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় বৈদিক যুগের কাল গণনা। একই রকমে সরস্বতী বন্দনা, জ্যোতিষ চর্চা, বৈদিক গণিত, বৈদিক বিজ্ঞান, আধুনিক ম্যানেজমেন্টে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটিতে রাম রাজ্য, গীতার উপদেশ বা রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা কূটনীতিতে ও ব্রিটিশের কাছে মুচলেখা দিয়ে মুক্তি পাওয়া সাভারকারের কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। পড়বে মহাভারতের কর্ণের জন্ম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে স্যারোগেট মাদারের গর্ভে। আহা! কী বিজ্ঞানটাই না জানতাম আমরা! নিউটনের বহু আগে আমাদের ব্রহ্মগুপ্ত আবিষ্কার করেছিলেন অভিকর্ষ সূত্র। ভবিষ্যতেও যা যা আবিষ্কার হবে সবই আমরা জানতাম মহাভারতের যুগে। মহান বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার ভাষায় 'সবই ব্যাদে আসে।'

সৈনিক স্কুল শুনলে আমাদের মনে সৃষ্টি হয় এক ভালোলাগা সম্ভ্রম। গর্বও হয় বেশ। অমৃতের চাষ বাড়ানোর জন্য দেশের ৬২% সৈনিক স্কুলকে তুলে দেওয়া হয়েছে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপে। এই পার্টনারশিপে আছে কারা? ২০% মালিকানা আরএসএস ও তার সহযোগীদের, ২৭.৫% বিজেপির বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁদের সহযোগী ও বন্ধুদের, ৭.৫% সংঘঘেঁষা হিন্দু সংগঠন ও ব্যক্তিদের, ৭.৫% অন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের। বাকি ৩৭.৫% স্কুল চলবে আগের মত।

ত্রিপুরার রাজ্য সরকার, সরকার পরিচারিত ২০টি স্কুলকে তুলে দিয়েছে ইসকনের হাতে। এইসব স্কুল ত্রিপুরার প্রত্যন্ত ও আদিবাসী অঞ্চলে অবস্থিত।

এক শ বছর ধরে মগজ ধোলাই চলছে অজস্র যন্তর মন্তর ঘর তৈরি করে। এই ধোলাইয়ের কাজ এত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে যে, জাতির জনকের চশমাটি কেড়ে নিয়ে তাঁর হত্যাকারীকে গৌরবান্বিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারছে দেশের বর্তমান সরকার, সরকারি দল ও আরএসএস। কারণ সেরকম কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন যে হবে না, এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান তারা। সামনের এক শ বছরে ছাত্র-যুবদের মনে সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদ, উগ্র-হিন্দুত্ববোধ ও কুসংস্কারের বীজ বুনে দিতে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস প্রয়াস অব্যাহত আছে। তার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণ, গৈরিকিকরণ এবং দুর্নীতি। একের পর এক সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে চলেছে।

ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমির.....

শুরু করেছিলাম কলকাতার মধ্যে অহংকারী, বাংলা মাধ্যমের ছাত্রদের করুণার দৃষ্টিতে দেখা, অতি সংখ্যালঘু অন্য কলকাতার কথা দিয়ে। গত পাঁচ দশকে কলকাতায় ওই অংশটি গিলে ফেলেছে কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের। নাভিশ্বাস উঠলেও মাসে পনেরো—কুড়ি হাজার টাকা আয় করতে যাঁদের কালঘুম ছুটে যায় তাঁদের সন্তানরাও ভিড়ে গেছে ওই দলে। মফঃস্বল শহর থেকে ব্লকের গঞ্জ পেরিয়ে গ্রাম পর্যন্ত বেসরকারি স্কুলের রমরমা শুরু হয়ে গেছে। সবার মুখেই এখন - 'সরকারি স্কুলে কিস্যু হয় না'। সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শতকরা নব্বই শতাংশের বেশি নিজের সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পড়িয়ে বেশ তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ওই কথাটাতেই সীলমোহর দিয়ে প্রাপ্য ডিএ না দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছেন। ফিসফিস করছেন, কারণ সরকারের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস তাদের বেশিরভাগের নেই। সাহস যে নেই সেটা আবার প্রমাণ হয়ে গেল ২০২৫-র মার্চের ১৩ তারিখে, যেদিন প্রাপ্য ডিএ-এর দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এখন ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির। মানুষ তো আর খেচর নয় যে আকাশে ভেসে বেড়াবে। তাকে থাকতে হবে হয় ডাঙ্গায়, না হলে জলে। কিন্তু কিভাবে?

[সংক্ষেপিত]

সম্পাদনা: অরণি সেন

তথ্যসূত্র:

১। www.scribd.com › document › 96521509 Amartya Sen's Insights on West Bengal Education Indeed, the significant improvements that have already happened in West Bengal over the last seven years between the surveys of 2001-02 and the resurveys of 2008-09 give strong indication that

২। www.researchgate.net › publication › 325459982 Failure of education policies in West Bengal, since 1951: An ... Dec 1, 2017 · Download Citation | Failure of education policies in West Bengal, since 1951: An analysis | West Bengal, in 1951, was ranked second in the country, with a literacy level of 24.0 per

৩। timesofindia.indiatimes.com › education › news RSS to start five universities for 'positive change' - The ... Sep 26, 2022 · RSS has already been involved in primary and higher secondary education and now wants to focus on institutions of higher education through their organisation Uchch Shiksha Sansthan.

৪। rssfacts.org › how-rss-inspired-vidya-bharati-is How RSS inspired Vidya Bharati is helping educate millions Dec 16, 2023 · What started as Saraswati Shishu Vidya Mandir, a small school by Vidya Bharati at Gorakhpur, Uttar Pradesh, in 1952 to educate the young generation according to Bhartiya values and culture, has grown into one of the largest private networks of schools in the country.

৫। www.jetir.org › papers › JETIR2509362 SAFFRONISATION OF THE EDUCATION SYSTEM: A THREAT TO INDIAN ...The saffronisation of education, the infusion of a singular religious-ideological narrative into the curriculum, poses profound risks for the future of Indian democracy and social cohesion.

৬। গণশক্তি (১৮.০৮.২৫, ২০.০৮.২৫, ০৩.০৯.২৫ - ০৬.০৯.২৫, ১৫.১০.২৫, ৩০.১২.২৫, ৩১.১২.২৫) ৭। আনন্দবাজার পত্রিকা (৩১.০৮.২৫, ০১.০৯.২৫, ০২.০৯.২৫)

৮। ইউজিসি'র ফরমান সভ্যতার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা - পার্থপ্রতিম বিশ্বাস (গণশক্তি - ১৬.০৯.২৫)

৯। স্কুল বাচাও, প্রজন্ম বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও প্রজন্ম বাঁচাও বাংলা বাঁচাও - দেবাঞ্জন দে (গণশক্তি - ২৮.১১.২৫)

১০। রুখে দাও নৈরাজ্য, রক্ষা করো সাধারণের বিদ্যালয় ব্যবস্থা - সুকুমার পাইন (গণশক্তি ২৬.১২.২৫)

১১। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা - অমর্ত্য সেন (বামফ্রন্ট সরকারঃ মানুষই শেষ কথা)

১২। কোন পথে পশ্চিমবঙ্গ — বামফ্রন্ট কমিটি পশ্চিমবঙ্গ

১৩। দেশ (০২.০৭.২০১০)

১৪। https://youtu.be/VNdG2ZbMk2k?si=QzvvdcJNUcr9Epey

১৫। Centre hands over 62 percent of new Sainik Schools to Sangh Parivar & BJP Leaders:Reporthttps://www.newindianexpress.com/nation/2024/Apr/03/centre-hands-over-62-percent-of-new-sainik-schools-to-sangh-parivar-bjp-leaders-repor

১৬। Tripura to hand over 20 government schools to ISKCON | Education News - The Indian Express https://share.google/q6eVtLP60FGG8yqHo educationforallinindia.com › wp-content › uploads

১৭। School Education in West Bengal: Where Do We Stand? West Bengal's school education system, as evidenced by UDISE+ data up to 2024—25, displays distinct strengths that provide a solid foundation for further progress, alongside persistent

১৮। West Bengal Rural ASER 2024 : Analysis based on data from household - asercentre.org

Cupientem acerum nerrae iam dius. Sci firibenatis.

Nihica reo, vid C. Tatil coeredo, quit.

রাজ্যে বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার হাল ফেরাবে কে?

সনাতন মুর্মু

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের সরকারের (তৃণমূল দল নেতৃত্বাধীন) ১৫ বছরের শাসনে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছিল তা বোধ হয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যাঁরা দোদুল্যমান ছিলেন তাঁরাও হয়তো এতদিনে বুঝে গিয়েছেন যে এই সরকারটা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। শুধু যে শিক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে বিষয়টা তাতেই সীমাবদ্ধ নয়, রেশনে দুর্নীতি, এক'শ দিনের কাজে দুর্নীতি, আবাস যোজনায় দুর্নীতি, স্বাস্থ্যে দুর্নীতি সহ প্রশাসনিক নানা স্তরের দুর্নীতি এ সরকারটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এই লেখাতে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রকে দুর্নীতি যেভাবে গ্রাস করে চরম অরাজক এক পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়েছে সে সম্পর্কে বিশদে আলোচনা থাকছে। এই রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি উন্মোচিত হয়েছে গণমাধ্যমের প্রচারেও। খবরের কাগজ অর্থাৎ প্রিন্টমাধ্যম, ইলেকট্রনিক মাধ্যম (টিভি চ্যানেল, ইউটিউব, পোর্টাল ইত্যাদি) কিংবা বেতারে তার সম্প্রচারও হয়েছে। খোদ শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন, ধরা পড়েছেন দুর্নীতিতে, জেল হয়েছে তাঁদের, দু'তিন বছর ধরে জেলের ঘানি টেনে আইনি লড়াই লড়ে আপাতত জামিন পেয়ে জেলের বাইরে এসেছেন। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িত শিক্ষামন্ত্রীসহ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। সুতরাং শিক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে কিনা এই লেখাতে নতুন করে উদ্ঘাটনের কিছু নেই। তা সত্ত্বেও দুর্নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে এই জমানায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে সে সম্পর্কে কিছু টুকরো টুকরো ঘটনার উল্লেখ থাকবে। উল্লেখ থাকবে আনুষঙ্গিক প্রশাসনের অন্যান্য কিছু দুর্নীতির কথাও। চাকরি পাওয়া ও প্রমোশন সংক্রান্ত দুর্নীতিও।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে (যা এ রাজ্যে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে) প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং একসময় (মুকুল রায় দল ছাড়ার পর) দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত (দলনেত্রীর পরে তিনি প্রশাসনিক ও দলেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল ছিলেন দুর্নীতির অভিযোগে জেল যাত্রার আগে পর্যন্ত) এবারের নির্বাচনে টিকিট পাননি। আরেক নেতা খাদ্য দফতরের দায়িত্ব যাঁর কাঁধে ছিল তিনিও রেশনসহ খাদ্য সরবরাহ—এ যে ব্যাপক দুর্নীতি করেছিলেন, সেই তাঁকেও জেল খাটতে হয়েছে এবং কিছুদিন আগে (মাস ছ'য়েকের বেশি) জামিনে মুক্ত হয়েছেন। তাঁর ডাক নাম বালু। তিনি নেত্রীর খুবই স্নেহধন্য। তিনি কিন্তু টিকিট পেয়েছেন। দুর্জনেরা বলে থকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী দুর্নীতিতে ডুবে যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তা দলের ভাণ্ডারে সবটা পৌঁছয়নি, উল্টে সিংহভাগ অর্থে তিনি নানান স্থানে ফ্ল্যাট কিনেছেন, ব্যবসায় খাটিয়েছেন, বান্ধবীকে অর্থ জুগিয়েছেন এবং তাঁরই (বান্ধবী) ফ্ল্যাটে ৫০ কোটিরও বেশি নগদ অর্থ ইডি-র তল্লাশিতে পাওয়া গিয়েছে। সে কারণেই তাঁরও জেল হয়েছিল। বালুর ক্ষেত্রে দুর্নীতি ধরা পড়লেও তিনি সম্ভবত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মতো দুর্নীতির সিংহভাগ অর্থ আত্মসাৎ করেননি। দলনেত্রীর কাছে চূড়ান্ত আনুগত্য দেখিয়েছেন। সে কারণেই হয়তো ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও টিকিট পেয়েছেন। এই সরকারে ও দলে বালু যে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন বালুর প্রচারে গিয়ে নেত্রী তাও খোলসা করেছেন। বর্তমান সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল নন-ডব্লু বি সি এস বালুর দাদাকে। প্রফেশনালি তিনি একজন ডাক্তার। নাম দেবপ্রিয় মল্লিক। তাঁরই চেয়ারম্যানশিপ টেনিয়রে ছয় জন সাদা খাতা জমা দিয়ে বি সি এস অফিসার হন। এঁদের মধ্যে একজনকে টপারও করা হয়। তিনি একই জায়গায় ছ'বছর বিডিও হয়ে আছেন। এঁদের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি ও হাইকোর্টে মামলাও হয়েছে। কিন্তু কোনওটিরই এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি, কোর্টও রায় জানায়নি। কারণ সমূহ রহস্যে ভরা। এক সময়ের কংগ্রেস দলের আইটি সেলের সঙ্গে যুক্ত বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা টেলিভিশন চ্যানেলে প্রায়ই করে থাকেন। তাছাড়া বহুল প্রচারিত দৈনিকেও নিয়মিত প্রকাশ হয়েছে এই সমস্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি।

বামফ্রন্ট জমানায় রূপকলা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী (সম্ভবত তিনিই প্রথম আই এ এস ডিরেক্টর)। তারপর যাঁকে ডিরেক্টর করা হয় তিনি নন-আই এ এস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ-এর অধ্যাপক সঞ্জয় মুখার্জী। বামফ্রন্ট আমলেই প্রথা অনুযায়ী রাজ্যপালকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর না করে অর্থনীতির অধ্যাপক অমিয় বাগচিকে চ্যান্সেলর করা হয়। অদ্ভুত এক প্রথা অনুযায়ী রাজ্যের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর চ্যান্সেলর হন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি (তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অবহিত নন) চ্যান্সেলর। নর্মাল প্রসিডিউর অব ক্যাডার সিডিউল না মেনে পছন্দের মানুষকে যেমন প্রমোশন পাইয়ে উচ্চপদে বসানো এখন রেওয়াজে (যা অনিয়ম) পরিণত একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পাশ করা সিনিয়রদের বাদ দিয়ে নন-সিভিল সার্ভিস ম্যানদের প্রাইজ পোস্টে বসিয়ে দেওয়া এখন চল হয়েছে। হিডকোর টপ পোস্টে ছিলেন সিনিয়র আই এ এস দেবাশিস সেন। সেখানে এখন পদ অলঙ্কৃত করছেন নন-আই এস ব্যক্তি। একইভাবে এই জমানায় নিউটাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে আই এ এস অফিসারকে সরিয়ে নন আই এস তৃণমূল দল পরিত্যক্ত পরে দলে ফিরে আসা শোভন চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে চেয়ারম্যান পদে আসীন। বহু চর্চিত ও আলোচিত আই পি এস রাজীবকুমার নেত্রী এবং শাসক দলে আনুগত্য দেখিয়ে এ বছর তৃণমূল দলের রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়মক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা না করেই সরকার পোষিত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে কাজ করছেন বর্তমান সরকারের পছন্দের শিক্ষককুল। নিশ্চিতভাবেই তাঁরা দলীয় আনুগত্যে সেইসমস্ত পদে আসীন হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান সর্বত্র এইসমস্ত মহাবিদ্যালয় শিক্ষকরা দলীয় আনুগত্য দেখিয়ে পদ অলঙ্কৃত করেছেন, দলের ভাবনা অনুযায়ী কাজ না করে পরে সেই পদ ছাড়তে বাধ্যও হয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল এখনও পড়ানো হয় না। অথচ কোনও মহাবিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়ের অধ্যাপিকা স্নেহমঞ্জরী বসু কেবলমাত্র দলীয় আনুগত্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। একসময়ের বামফ্রন্ট ঘনিষ্ঠ সরকারি কলেজের অধ্যাপক দেবশিস সরকার যিনি সরকারি কলেজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কখনও সভাপতি, কখনও সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন দীর্ঘদিন ট্রান্সফার আটকে রেখেছিলেন সরকারে আনুগত্য দেখিয়ে। পরিবর্তনের সরকারের আমলে জেলে ঘানি টানা উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হয়ে চন্দননগরে প্রিন্সিপ্যাল (অধ্যক্ষ) পোস্টে যোগ দেন। ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রাণা রায় কলেজের হেরিটেজ কমিশনের কনভেনর ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কলেজটি রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সুনজরে পড়ে এবং কলেজটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয় ২০১০ সালে। ফলে কলেজটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাষ্ট্রিক উচ্চতর শিক্ষা অভিযান—রুশার পক্ষ থেকে প্রচুর টাকা অনুদান পায় হেরিজেট রক্ষা করার জন্য, কলেজের হেরিটেজ বিল্ডিং রক্ষা করার জন্য। টিচার্স কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় এই কাজটি হয় পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনে বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া-র পরামর্শ মত কলেজের হেরিটেজ সংরক্ষণ করা হবে। ইতিমধ্যে ২০১৭-এ দেবাশিস অধ্যক্ষ হয়ে কলেজে এসে সেই সিদ্ধান্ত বদলে দেন এবং পি ডব্লু ডি কে দিয়ে পুরনো কলেজ বিল্ডিং নষ্ট করে একটি নতুন রেপ্লিকা তৈরি করেন যা কোনওমতেই হেরিটেজ সংরক্ষণের বিষয় ছিল না। পরে বিপুল পরিমাণ টাকা যে তিনি শাসকদলের হয়ে নয়ছয় করেছেন সেই বিষয়ে জানতে আর টি আই করা হলেও সেই হিসাব আজও অধরা এমনটাই অভিযোগ অধ্যাপক রাণা রায়ের পুত্রের, যিনি নাগরিক মঞ্চ সংবাদে এক চিঠিতে এ সমস্ত অভিযোগ করেছেন। অধ্যাপক রায়কে দেবাশিস হেরিটেজ কমিশন থেকে সরানোই নয় তাঁকে কুচবিহারের এ বি এন শীল সরকারি কলেজে বদলিও করে দেওয়ার পেছনে মূল মাথা বলে অধ্যাপক রাণা রায় পুত্রের অভিযোগ। কারণ অধ্যাপক রাণা ছিলেন দেবাশিসের পথের কাঁটা।

ক্যানিং ট্যাংরাখালির বঙ্কিম সরদার কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে নির্বাচিত ড. প্রশান্ত সেনকে অধ্যক্ষ পদে নানা ছুতোয় (অভিযোগ) আটকে রেখে তাঁকে যারপরনাই হেনস্থা করেছেন শাসকদলের সাহায্য নিয়ে। এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অধ্যাপক সেনের বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) করার অভিযোগ করে চিঠিও দেন তৎকালীন চিটার-ইন-চার্জ পদে থাকা মাননীয়াকে দিয়ে। কলেজের বিপুল টাকা ব্যয় করে বর্তমান অধ্যক্ষ ড. সেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে মামলাও করেন বলে অভিযোগ। কিন্তু সে সমস্ত অভিযোগ প্রমাণে তিনি ব্যর্থ হলেও কলেজ ফাণ্ড থেকে বিপুল টাকা ধ্বংস করেছেন ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে। ড. সেন অবসর নেওয়ার পর (২০১৬তে অবসন নেন) তাঁর অবসরকালীন বেনিফিট পিএফ, গ্রাচুয়িটি ও পেনশন আটকে দেন। ড. সেন তাঁর অবসরকালীন পাওনা গণ্ডা পেতে উচ্চ আদালতে মামলাও করেন। কিন্তু মামলা তো এক দু'মাসের ব্যাপার নয়। অবসাদে তিনি অবসরের এক বছর পর মারাও যান। এমনই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী সেই কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। পরে আদালতের রায় ড. সেনের পক্ষে গেলে অধ্যক্ষ বাধ্য হন তাঁর স্ত্রীকে পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিতে। বর্তমান অধ্যক্ষ কলেজে কোনও ক্লাস নিতেন না বলে ছাত্রদের অভিযোগ। একজন প্রাক্তন জানান, একদিন এই ব্যক্তি, তখনও অধ্যক্ষ হন নি, সাধারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার থাকাকালীন ক্লাস নিতে গিয়ে ছাত্রদের বলেন এই পড়া দিচ্ছি পরের দিন তা করে আসতে হবে। না পারলে তিনি আর ক্লাস নেবেন না। তিনি অবশ্য কথা রেখেছিলেন। পরে তিনি আর ক্লাস নেন নি। তাঁর প্রমোশনের সময় (২০০৬-০৭ সাল নাগাদ) অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হবেন—নিজেই লিখেছিলেন ''আই ডিড নট টেক ক্লাসেস ডিউ টু মাই ন্যাক-কোঅর্ডিনেটর অ্যাসাইনমেন্ট''। ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকা অধ্যাপকেরা অবাক হয়ে যান এই লেখা দেখে। তাঁরা বলেন, ইউর প্রাইমারি অ্যাসাইনমেন্ট ইজ টু টেক ক্লাসেস, হোয়াই ইউ আর সেয়িং/রাইটিং অল দোজ থিংস?'' তাঁর প্রমোশন আটকে যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষও পরে কাগজপত্র ছেড়ে দেয় এবং তাঁর প্রমোশনও হয়। সেই ব্যক্তিই পরিবর্তনের সরকার আসার পর স্থানীয় নেতাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং আস্তে, আস্তে ছলেবলে কৌশলে অধ্যক্ষ পদে পৌঁছান। বর্তমানে কলেজ জিবি-র সঙ্গে তাঁর অহি নকুল সম্পর্ক। সুযোগ পেলেই তিনি অন্য দলে যোগ দেবেন, কারণ বর্তমান সরকারের কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। এ সমস্ত অভিযোগ ওই কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের। এভাবেই চলছে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা। ঐতিহ্যমণ্ডিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হলো ছ'বছর পর, ২৩ মার্চ, ২০২৬-এ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যসরকার ও রাজভবন (এক্ষেত্রে রাজ্যপাল) সংঘাতে উপাচার্যহীন ছিল বছরের পর বছর। এই লেখার সময়ও এপ্রিল ২০২৬ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও উপাচার্যহীন অবস্থায় আছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। শিক্ষক সংকটে পঠনপাঠনও এখন শিকেয় উঠেছে। বামফ্রন্ট জমানায়ও কলেজে কলেজে স্থায়ী শিক্ষক অপ্রতুল ছিল। সে কারণে কলেজে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তাঁদের বেশ কয়েকজন ইউ জি সি-র মানদণ্ড অনুযায়ী কোয়ালিফায়েড ছিলেন বা এখনও আছেন। তবে এঁদের সিংহভাগই নন-ইউ জি সি কোয়ালিফায়েড। বামফ্রন্ট জমানায় এঁরা আন্দোলন করে স্থায়ী

আংশিক সময়ের শিক্ষক হয়েছিলেন, ক্লাস লোড কলেজ বিশেষে ১৬-২০ বা তারও বেশি ছিল সপ্তাহে। পরে অতিথি হিসাবে কয়েক হাজার শিক্ষক তৃণমূল জমানায় ইউ জি সি কোয়ালিফায়েড এবং নন কোয়ালিফায়েড হয়েও কলেজে কলেজে কাজ করতে শুরু করেন দলেরই মদতে। এঁরাই তৃণমূলের শিক্ষক (কলেজ) সংগঠন ওয়েবকুপার সদস্য হন। এরপর সরকার ২০২০ সাল থেকে আংশিক ও অতিথিদের স্যাক্ট-১ ও স্যাক্ট-২ (স্টেট এডেড কলেজ টিচার) তকমা দিয়ে নন-ইউ জি সি কোয়ালিফায়েড ও দশ বছরের কম কাজ করা অতিথিদের ২০,০০০ টাকা এবং ইউ জি সি কোয়ালিফায়েড নন-ইউ জি সি কোয়ালিফায়েডদের (যাঁরা দশ বছর কাজ করেছেন) ৩০,০০০ টাকা মাসে মাইনে ধার্য করেন। সঙ্গে পূর্বেকার সরকার নির্ধারিত যাঁর যা কাজের অভিজ্ঞতায় তিন বছর অন্তর পাঁচ শতাংশ মাইনে বৃদ্ধি (আংশিক সময়ের দশ বছরের কাজ করা শিক্ষকদের) যোগ হয়েছে। অবশ্য ২০২০ সাল থেকে এদের প্রতি বছর তিন শতাংশ হারে মূল মাইনের উপর বৃদ্ধি হচ্ছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা এককালীন পাবেন এঁরা। এর আগে যাঁরা অবসর নিয়েছেন (২০২০ সালের অর্ডার বেরনোর আগে) তাঁরা এককালীন এক লক্ষ টাকা পেয়েছেন। সপ্তাহে এঁদের ক্লাস নিতে হয় ১৬টি এবং চারদিন কলেজে যেতে হয়।

একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেপ (নিউ এডুকেশন পলিসি) যা শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। প্রায় জোড়াতাপ্পি দিয়ে চলছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা। স্থায়ী শিক্ষক যেটুকু নিয়োগ হচ্ছে তা যথেষ্টই অপর্যাপ্ত। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৫-২০২৬) প্রতি কলেজে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক। সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ছাত্র ভর্তির হার বিপুল পরিমাণে কমে গিয়েছে। রাজ্যে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে (প্রাইভেট বা সরকারি) সেখানেও ছাত্রসংখ্যা কমে গিয়েছে। প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি বর্তমান ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে অর্ধেক হয়েছে। কলেজ বিশেষে কোথাও বা অর্ধেকের কম হয়েছে। চাকরি নামক বস্তুটি মহামূল্য (!) হয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকার বছরে ২ কোটি চাকরি (খোদ প্রধানমন্ত্রী মুখ নিঃসৃত বাণী) দেবে ঘোষণা করেছিল। চাকরি বাজার করে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীরা প্রত্যাশীদের হাতে প্রতি বছর ঘটা করে চাকরি তুলে দেন। সেই সংখ্যাটাও বছরে দু'লক্ষ হবে কিনা তা বলা মুশকিল।

চাকরি ক্ষেত্রে এস সি, এস টি, সংখ্যালঘুদের কথা নাই বা উল্লেখ করলাম। তাঁদের চাকরি পাওয়ার হার সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের চিত্রে ৫ শতাংশও অতিক্রম করে নি। সাচ্চার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছিল বামফ্রন্ট জমানায়। পরিবর্তনের সরকারের ১৫ বছরের শাসনকালে সেই রিপোর্টের কী খুব হেরফের হয়েছে? প্রদীপের নিচে যে অন্ধকারে তাঁরা ছিলেন সেই অন্ধকারেই তাঁরা রয়ে গিয়েছেন। দু'একজন এলিট মুসলমানের উচ্চপদে চাকরি (শিক্ষাক্ষেত্রে বা অন্যত্র) পাওয়া নিয়ে পসমন্দা মুসলমান (যাঁরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া) সমাজের শিক্ষালাভ এবং শিক্ষান্তে চাকরিলাভের আশ কী মিটবে?

স্কুল শিক্ষার বেহাল অবস্থাটা আরও ভয়ানক। কোথাও শিক্ষার্থী আছে, শিক্ষক নেই, আবার কোথাও শিক্ষক আছেন শিক্ষার্থী নেই। পরিকাঠামোর অভাবও প্রকট। সম্প্রতি প্রিন্ট মাধ্যমে প্রকাশিত একটি খবরে দেখা যাচ্ছে পুর বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ ছাঁটাই হয়েছে। স্কুল ও পড়ুয়ার সংখ্যাও কমেছে ব্যাপক হারে। চলতি আর্থিক বছরে শিক্ষা বিভাগের জন্য ৫৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। সেই পরিমাণ টাকাও পুর শিক্ষায় পুর বোর্ড খরচ করতে পারে নি। বরাদ্দ হওয়া টাকার মধ্যে খরচ করতে পেরেছে ৪৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মেয়র ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট বিবৃতিতে অন্যান্য খাতে বরাদ্দ বাড়ালেও একমাত্র শিক্ষাখাতে সেই বরাদ্দ সামান্য হলেও কমিয়েছেন। গত বছরের তুলনায় ৩৬ লক্ষ টাকা কমেছে। বর্তমান পুর বোর্ডের শুরুতে প্রাইমারি স্কুল ছিল ২৬৩টি। সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২১৭টিতে। ছাত্র সংখ্যাও ২৬,৯৭১ জন থেকে কমে হয়েছে ১৩ হাজার। সাধারণভাবে প্রান্তিক পরিবারের (দরিদ্র ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া) ছাত্রছাত্রীরা পুরবোর্ড পরিচালিত স্কুলে পড়তে যায়। সুতরাং শিক্ষা এখন সম্পন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া আছে স্কুল ছুটের ঘটনা। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ১২-১৪ বছর পর্যন্ত বা তারও কম বয়স অবধি স্কুলে যায়। পরে এরা স্কুল ছুট হয়ে (ছেলেরা) পরিযায়ী হয়ে বাইরের প্রদেশে পাড়ি জমায় কাজের সন্ধানে এবং মেয়েরা অল্প বয়সেই বিয়ে করে শ্বশুরালয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক, বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণি বা কলেজের (উচ্চ শিক্ষার) হাল এ রাজ্যে ক্রমশ খারাপ হয়েছে ও হচ্ছে। সরকারের সদিচ্ছা ও জন আন্দোলনের চাপ ছাড়া অবস্থা পাল্টাবে না।

চলে গেলেন পাণ্ডবাণী লোকসংস্কৃতির বিখ্যাত কলাকার পদ্মবিভূষণ তীজন বাই (১৯৫৬-২০২৬)। ছত্তিশগণের দুর্গ জেলার গনিয়ারি গ্রামে দরিদ্র পারদি জনজাতি পরিবারে জন্ম। দারিদ্র ও সমস্ত সামাজিক বাঁধাকে অতিক্রম করে, মহাভারতকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক লোকশিল্প পাণ্ডবাণীর কাপালিক ধারা (একসাথে গান, বাজনা, নাচ ও কথকতা) আয়ত্ব করে ১৩ বছর বয়স থেকে এর প্রদর্শন শুরু। তারপর দেশ-বিদেশ জয়।

উন্নয়ন প্রসঙ্গে

মণিপুরে এত গণ্ডগোল কেন?

বাসব রায়

মণিপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠী সংঘর্ষ খুব কাছ থেকে দেখার সুবাদে কিছু লেখার তাগিদ অনুভব করছি। মণিপুর রাজ্যের ইতিহাস খুবই পুরনো। ৩৩ খ্রিস্টাব্দে মণিপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এত পেছনে গিয়ে লাভ নেই, বর্তমানের কথা বলা যাক। মণিপুরের আয়তন মাত্র ২২৩২৭ বর্গকিমি। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা বা মেদিনীপুর জেলার সমান হবে। মণিপুরে রয়েছে ১৬টা জেলা। মোট জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। এর ভেতরে ৫৩ শতাংশ মেইতেই, যার আবার ৯ শতাংশ মুসলমান। ২৪ শতাংশ নাগা ও ১৬ শতাংশ কুকি। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে ১৯৬১ থেকে ২০১১ এই ৫০ বছরে মণিপুরের বাসিন্দাদের ধর্মীয় পরিচিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তখন হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৬২ শতাংশ, যা আজ কমে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশে। উলটো দিকে খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা বেড়েছে। ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠারেঠোরে একটা বিষয় বোঝাতে চেয়েছেন, যা মিথ্যে, যে মণিপুরের কুকিরা হল অনুপ্রবেশকারী। মণিপুরের যে রাজবংশাবলি 'চেইথারোল কুম্বাবা', তাতে চিন সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে ১৪৬৭ সালে আর খোংসাইয়ের উল্লেখ আছে ১৫০৮ সালে। মণিপুরের দক্ষিণে পার্বত্যাঞ্চলকে এখনও বলা হয় খোংসাই হিলস। যা এটা স্পষ্ট করে যে এই অঞ্চলে কুকিদের বসবাস পঞ্চদশ শতক থেকেই রয়েছে।

১৯১১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে মণিপুরে কুকিদের জনসংখ্যা ছিল ১৪ শতাংশ। আর রাসবিহারী বসুর আজাদ হিন্দ্ ফৌজে মণিপুর থেকে যে ১৮২ যোদ্ধা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ১৪৭ জন ছিলেন কুকি। তো এটা প্রমাণ করে যে কিছুতেই কুকিরা অনুপ্রবেশকারী নয়, যা বহুল প্রচারিত। ভারতে কুকি জনসংখ্যা কমবেশি ৮৪লক্ষ। ২০১১ জনগণনা অনুযায়ী। বিজেপি সরকার কোনো জনগণনা করেনি, ঘটনা হল ৮৪ লক্ষের অনেক কম জনসংখ্যা নিয়ে মেঘালয়ের খাসি-জয়ন্তিয়া গোষ্ঠী একটি রাজ্যের অধিকারী, যেমনটা কি না মিজোরাম। বড় বেশি করে সত্য হল, ভারতে কুকিদের মোট জনসংখ্যা মেইতেইদের তুলনায় বেশি। আর মণিপুরের সরকারি ভাষা মেইতেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হল কুকিদের নিজস্ব কোনো রাজ্য নেই।

মণিপুরে রয়েছে ১৬টা জেলা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে মেইতেইরা। শুধু চুড়াচান্দপুর ও কাঙ্গপোকপি জেলায় থাকে কুকিরা। নাগাদের বসবাস দুটি জেলায় — সেনাপত ও উখরুল।

১৯৯২ সালে কুকি ও নাগাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল। নাগাদের নিজস্ব রাজ্য আছে, স্বভাবতই তারা দলে ভারী, ওই দাঙ্গায় নিহতদের অধিকাংশই ছিল কুকি। তখন কুকিদের আশ্রয় দিয়েছিল মেইতেইরা। ১৯৯৮ সালে ফের সংঘর্ষ হয়, তবে এই সংঘর্ষ বেশিদিন চলেনি। এরপরের ২৫ বছর শান্তিতে ছিল মণিপুর। মণিপুর অসম্ভব সুন্দর একটা রাজ্য। সেখানকার নারীদের দেখলে আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসবে। এশিয়ার সবচেয়ে বড় নারী পরিচালিত বাজার ওই মণিপুরেই। রয়েছে নয়নাভিরাম লোকতাক হ্রদ। আর ন্যাশনাল গেমসে বেশ কয়েক বছর ধরেই পদক তালিকার শীর্ষে থাকে মণিপুর। ভারতীয় ফুটবল দলে মণিপুরের খেলোয়াড়ের ছড়াছড়ি। উত্তর-পূর্ব ভারতে মিজোরামের পরই সাক্ষরতার হারে এগিয়ে মণিপুর।

তো মণিপুরে এত গণ্ডগোল কেন?

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের অবস্থানটা হল স্টেডিয়ামের ভেতরে মাঠের মতো। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে সমতলভূমি — সেটাই ইম্ফল। আর সেখানেই মেইতেই সম্প্রদায়ের বাস। মেইতেইরা তফশিলি জনজাতি নন, শুধুই জনজাতি আর কিছু আছে ওবিসি। মেইতেইরা থাকতে পারে মানে জমি কিনতে পারে গোটা রাজ্যের মাত্র দশ শতাংশ এলাকায়। বাকি সবই তফশিলি জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। মেইতেইদের প্রধান জীবিকা কৃষি। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করতে হবে যে মণিপুরে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ দুটি গোষ্ঠীর। মেইতেই ও কুকি। নাগারা এই সংঘর্ষে কোনো পক্ষ নয়। কুকিরা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করলেও তারা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। গোটা সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের কবলে রয়েছে এমন নয়। মেইতেইরা আট দশক থেকেই তফশিলি জনজাতিভুক্ত হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। মামলা করেছে। যার ফল বেরিয়েছে এপ্রিল ২০২৩এ। যেখানে ২০২৩ এর মার্চের রায়কে সংশোধন করে মণিপুর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল মেইতেইদের তফশিলি জনজাতির অধিকারের ব্যাপারটা দেখতে। এবং সেই রায় ছিল সুপ্রিমকোর্টের একটি রায়ের বিরোধী। সে কথা থাক। কোনো রাজ্যসরকার কোনো গোষ্ঠীকে তফশিলি জনজাতি তো দূর অস্ত্, জনজাতি কিংবা ওবিসি মর্যাদাও দিতে পারেনা। কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া এটা সম্ভবই নয়। কিন্তু এসব তো যুক্তির কথা।

এর আগে মণিপুরে দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন কংগ্রেসের। আর স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী দল বলেই কংগ্রেসের মধ্যেই রয়েছে গ্রহণশীল মনোভাব। কংগ্রেস কখনো মুসলমান-বিরোধী, খ্রিস্টান-বিরোধী কোনো নীতি প্রণয়ন করেনি। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দিল্লিতে একটা শিখনিধন পর্ব আমরা দেখেছি, কিন্তু সার্বিক ভাবে শিখধর্মের বিরুদ্ধে যায় নি কংগ্রেস।

ঠিক এর উলটোদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সংবিধান পড়ুন। খুব স্পষ্টভাষায় লেখা আছে যে শত্রু হল তিনটি পক্ষ।

১. মুসলমান
২. খ্রিস্টান
৩. কমিউনিস্ট

আরএসএস থেকে হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘ হয়ে যে বিজেপির জন্ম তার শাসন চরিত্র দেখুন। নির্বাচনের আগে মোটা মোটা ভাষায় যোগী বা হিমন্ত বিশ্বশর্মা ভাষণ পেশ করেন যে মুসলমানের ভোট আমাদের দরকার নেই। বিজেপি হল হিন্দুদের দল। এই মুহূর্তে ভারত সরকারের বিভিন্ন নীতি, আইনের ভেতরে মুসলমান-বিদ্বেষ প্রতিভাত। এটা কংগ্রেস কখনো বলতে বা করতে পারবে না। তো কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গিয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হলেন বীরেন সিংহ যেমন অসমে হিমন্ত। একদা ফুটবলার তারপর সংবাদপত্রের সম্পাদক। এবছরের গোড়া থেকেই তিনি স্থির করলেন পপি চাষ উৎখাত করার নামে কুকিদের গৃহহীন করবেন। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট, জনসংখ্যায় মেইতেই শতাংশ বাড়ানো এবং পাহাড়ি জমি দখল। তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়ে রয়েছে গোদরেজ গোষ্ঠীর। কী সেই চুক্তি? না, চূড়াচান্দপুরে পাম চাষ। সে জন্য জমি খালি করতে হবে।

মণিপুর হাইকোর্টের রায় বেরনোর আগেই বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়েছিল মণিপুর। ৩ মে চূড়াচান্দপুর, বিষ্ণুপুর, মৈরাঙ, থৌবলে ট্রাইবাল সলিডারিটি মার্চ সেই বারুদে আগুন ছেটাল। মেইতেই পুলিশ মেইতেই জনগোষ্ঠীর জন্য খুলে দিল অস্ত্রাগার, উলটোদিকে একই কাজ করল কুকি পুলিশ। দুদলের হাতে চলে এল অত্যাধুনিক অস্ত্র। সংখ্যাটা এরকম: ৬০০০ অস্ত্র, ৬ লক্ষ কার্তুজ-বোমা। প্রথম দুদিনেই মৃতের সংখ্যা ৭০ ছাড়িয়েছে। টেলিগ্রাফ পত্রিকা ২৯ জুলাই সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, মণিপুরে মৃতের সংখ্যা ১৮২, এর মধ্যে কুকি ১১৭। আগস্ট মাসে আরও মৃত্যু ঘটেছে। মোট মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে।

ভারতের স্বাধীন ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন নিশ্চয়ই ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২। কলঙ্ক-লজ্জার দিক থেকে তার খুব কাছাকাছি থাকবে ৪ মে, ২০২৩। নগ্ন তিন কুকি মহিলার প্যারেড (একজন ভিডিয়োতে ধরা পড়েননি)। হাজার জনতার উল্লাসের মধ্য দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে আমাদের বোনেরা। এই ঘটনা চর্চিত। ৪ মে থৌবল জেলায় নংপোক সেকমাই থানার অদূরে একটি কুকি গ্রামে মেইতেইরা হামলা চালায়। বাধ্য হয়ে গ্রামের সবাই পালায় আর একটি পরিবারের পিতা, পুত্র ও কন্যা আশ্রয় নেয় পাশের একটি জঙ্গলে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন গ্রামের আরও দুই নারী। গোটা রাত কাটিয়ে ভোরের দিকে গ্রামে ফেরার সময় তারা একটি পুলিশের গাড়ি দেখতে পায়। তারা আশ্রয় চায় এবং পুলিশ তাদের ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে।

সরাসরি উদ্ধৃতি তুলে আনি, নির্যাতিতা ২১ বছরের মহিলা বলেছেন, ‘দুষ্কৃতীদের অনেকের হাতে একে-৪৭, ইনসাস, এসএলআর-সহ আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। গ্রামে ঢুকে তারা নির্বিচারে বাড়িতে আগুন ধরায়, মানুষ খুন করে। আমরা পাঁচ জন— তিন মহিলা এবং দু’জন পুরুষ (নির্যাতিতার বাবা এবং ভাই) দৌড়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ায় তখনকার মতো বেঁচে গিয়েছিলাম।’

এরপর নির্যাতিতা মহিলা বলেছেন, ‘পরে নংপোক সেকমাই থানা থেকে পুলিশকর্মীরা গিয়ে আমাদের উদ্ধার করেন। কিন্তু থানায় ফেরার পথে রাস্তায় দুষ্কৃতীরা আমাদের ঘিরে ফেলে। বাবা এবং ভাইকে খুন করেছিল হামলাকারী জনতা। আমার ৫৬ বছরের বাবাকে প্রথমেই খুন করা হয়। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ভাইও নিহত হয়।’ তিনি জানান, তিন মহিলাকে খুনের ভয় দেখিয়ে জোর করে বিবস্ত্র করানো হয়। এরপর সবার সামনে দুই মহিলাদের নগ্ন করে নিয়ে যাওয়া হয় ধান খেতে। সেখানে তাঁকে বলা হয়, শুয়ে পড়ো। তোমাদের ধর্ষণ করব, তোমাদের পুরুষরা আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করেছে। তবে শেষপর্যন্ত দু-একজন পরিচিত হওয়ার সূত্রে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়নি। ৪ মে, ওই ঘটনার পর কী হল সেটাই মূল কথা। সেই ঘটনা নিয়ে গত ১৮ মে কঙ্গপোকপি জেলার বি ফাইনম গ্রামের প্রধানের সাহায্যে ওই জেলারই সাইকুল থানায় অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন নির্যাতিতা। দায়ের করেছিলেন, ‘জ়িরো এফআইআর’। দুই মহিলাকে যখন নগ্ন করা হচ্ছিল, পোশাক খুলে ফেলো না হলে খুন করব – এই হুমকি দিয়ে, কাছেই দাঁড়িয়েছিল পুলিশের গাড়ি, পুলিশ, কেউ কিছু বলেনি। ৪ মে-র ঘটনা, ১৮ মে ভিলেজ পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয় আর ২১ জুন মণিপুর পুলিশ এফআইআর করে। আর যতদিন-না ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে নিদ্রায় ছিল মণিপুর প্রশাসন। তারপর সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর প্রথম এয়ার করেছে ইন্ডিয়া টুডে।

এরপর মণিপুর পুলিশ-প্রশাসন-মুখ্যমন্ত্রীর প্রলম্বিত নিদ্রা ভাঙে, রাত দেড়টায় গ্রেফতার করা হয়েছে একটি ছেলেকে। অথচ ভিডিয়োতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দুই নগ্ননারীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে অন্তত ৭-৮ জন, সবার মুখ স্পষ্ট। একটু খোঁজাখুঁজি করলেই পাওয়া যাবে। ২০ বর্ষীয়া, পীড়িত সেই মেয়েটির মা এনডি টিভিতে বলেছেন, বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে জাতিগত হিংসার বলি হয়েছে তাঁর গোটা পরিবার। কোন পরিস্থিতিতে মেয়ের লাঞ্ছনা সয়ে, স্বামী-পুত্র হারানোর বেদনা বুকে বয়ে চলেছেন অসহায় মণিপুরের মা। ‘‘আমাদের গ্রামে ফেরার আর কোনও আশা নেই। ফেরার কথা আর চিন্তাও করিনা… না, আমরা আর গ্রামে ফেরত যাব না। আমি নিজে আর ফিরতে চাইনা।’’ একটু থেমে আবার বলেন, ‘‘আমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। চাষের জমি নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানিনা, আমার এবং আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ কী। আমার আর কোনও আশা নেই।’’এই মণিপুরের মায়ের ছেলে ও স্বামীকে মেরেছে উন্মত্ত জনতা আর মেয়েকে হাঁটিয়েছে বিবস্ত্র করে। আর টেলিগ্রাফ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে আরেক নারীর কথা। সে নিয়ে লিখব কী, পড়তেই পারছিলাম না! আরেকটু তথ্য থাকুক সবার জন্য, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ১৮ মে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে সব খবর দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। এরপর ২৪ জুন ফের বীরেন সিং দিল্লি যান, কথা হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। নাহ্, না কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য

সরকার কেউ কোনো পদক্ষেপ করেনি।

সেই অসহায় তরুণী, কলেজে যাঁর শরীর নিয়ে ফুটবলের মতো খেলেছিল অন্য গোষ্ঠীর ছেলেরা আর মেয়েরা হাততালি দিয়ে বলছিল, আরও মার, মেরে ফেল। ঘটনা হল ১০টি মেয়ে থাকত কলেজ হোস্টেলে, ইম্ফলে। ৬ জন আগেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। ২ জন পালিয়েছিল, আর ২ জন পড়ে পড়ে মার খেয়েছে। তাঁদের মৃত ভেবে ফেলে গিয়েছিল অন্য গোষ্ঠীর পাশব উল্লাসে মেতে ওঠা মানুষ (!)। সেই মেয়েটির জ্ঞান ফেরে রাস্তায়, বিবস্ত্র অবস্থায়। মণিপুরে এরকম আরও যে কত ঘটনা! কত লিখব! এক যুবককে খুন করে তারই ঘরের সীমানা-বেড়ায় মুন্ডু গেঁথে রাখা হয়েছিল। চিল-শকুনে ঠুকরে খেয়েছে চোখ-মুখ-ঘিলু। দুমাস পেরিয়ে গেলেও, মেরি পুলিশের কাছে যাওয়ার সাহসটুকুও অর্জন করতে পারেনি, ১৮ বছরের কুকি মেয়ে, তাই আর ওকে 'আপনি' লিখলাম না। ওর মা বলেছেন, 'ওরা আমায় বলেছিল, ওদের কথা কাউকে বললে আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে।' তো মেরি আর বলতে পারেনি। অন্তত আড়াই মাস তো কাউকে বলেইনি। এখন মণিপুরের দুই মহিলার নগ্ন প্যারেডের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে বলে মেরির মতো অনেকেই মুখ খুলেছে। চূড়াচান্দপুরের ত্রাণশিবিরে বসে মেরির মা বলেছেন, 'পুলিশের কাছে যাওয়ার কথা ভাবিইনি, মেয়েকে ভীষণ ভালোবাসি যে। এখন সাহস পেয়েছি, ওই ভিডিয়োটা প্রকাশ্যে না-এলে আমরা মুখ খুলতাম না। ওই ভিডিয়ো আমাদের সাহস জুগিয়েছে। এরপর আর হয়তো সুযোগ পাবনা অত্যাচারের কথা, পীড়নের কথা, ধর্ষণের কথা পুলিশকে জানানোর।' কাঁদছিল মেরি, যা স্বাভাবিক। পাশেই দাঁড়িয়ে ১৯ বর্ষীয়া চিনসিয়ানচিং। তারও অবস্থা প্রায় একই। পড়ত ইম্ফলের একটি আবাসিক কলেজে। ১০টি মেয়ে। কোনোক্রমে ৮টি মেয়ে পালিয়ে যায়। বান্ধবীকে নিয়ে চিন লুকিয়ে ছিল একটি ঘরে। দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে উন্মত্ত ছেলেমেয়েরা। বলে, 'তোমাদের পুরুষরা আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করেছে এখন আমরা সেটাই করব। আর ওদের উৎসাহ দিচ্ছিল আমাদেরই সমবয়সি কিছু মেয়ে।' এরপর দুটি কিশোরীকে নিয়ে লাথালাথি খেলে কিছু ছেলে, আর মেয়েরা হাততালি দিয়ে বলে রেপ দেম, কিল দেম। জ্ঞান হারায় চিন। জ্ঞান ফেরে রাস্তায়, তখন গায়ে কোনো পোশাক নেই, শরীরে অজস্র দাঁতের আর নখের দাগ। চিন বলেছে, 'ওরা আমাকে মৃত ভেবে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যায়।' রাস্তায় তাকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশও ভেবেছিল মরে গেছে। নাড়ি টিপে বুঝতে পারে, বেঁচে আছে মেয়েটি।

দিল্লিতে কয়েক মাস আগে প্লাস্টিকে মোড়া এক নারীর শবদেহ পাওয়া যায়। যা ছিল অনার কিলিং। সেই ভিডিয়ো বা ছবি ছড়িয়ে গিয়েছিল মণিপুরে, বিশেষ করে মেইতেইদের মধ্যে। বার্তাছিল এরকমঃ চূড়াচান্দপুরে এক মেইতেই নার্সকে কুকিরা ধর্ষণ করে মেরেছে, এটা সেই লাশের ছবি। আর তারপরই ইম্ফলে বাসরত কুকিদের, বিশেষ করে মহিলাদের, ওপর আক্রমণ শুরু হয়। নগ্ন প্যারেডের ভাইরাল ভিডিয়োর মূল না হলেও অন্যতম কারণ এটাই। দুই নারীকে নগ্ন করে প্যারেডে বাধ্য করেছিল যারা, একজন তো নয়, অনেকেই, তাদের একজনের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে মেইতেই মহিলারাই। তবে লোকজন এখন বলছে, ওটা বানানো ভিডিয়ো। পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে, যার ভিডিয়ো নেওয়া হয়েছে খুবই ঠান্ডা মাথায়। যদিও স্থানীয় মেইতেই নেত্রী লেইমা বলেছেন, 'মেইতেই সম্প্রদায়ের তরফে আমরা এই ঘৃণ্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। ওদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ওর স্ত্রী ও তিন সন্তানকে গ্রাম থেকে তাড়ানো হয়েছে। মেইতেইরা এরকম ঘৃণ্য কাজ সমর্থন করে না। তবে ওটা ছিল মেইতেইদের ক্ষোভ ও বদলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কেননা বহু মেইতেই মহিলা অত্যাচারিত কুকিদের দ্বারা।' এরপর যোগ করেছেন, 'কুকি মহিলাদের নগ্ন প্যারেড এখন প্রকাশ্যে এসেছে, সবাই প্রতিবাদ করছে, কিন্তু আমরা যে এতদিন ধরে অত্যাচারিত সে বিষয়ে কেউ একটা শব্দও করছে না। আমরা কি লেসার ইন্ডিয়ান?'

প্রায় একই কথা বলেছেন মেইতেইদের সংগঠন কোকোমি-র নেতা খুরাইজাম আথৌবা, 'আমরা যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি সেটা আর বলছি না, কিন্তু অত্যাচারের বদলা ওই ঘটনা, যদিও ওই ঘটনাকে আমরা সমর্থন করিনা। 'কুকি গবেষক গ্রেসি হাওকিপ বলছেন, 'এই ভিডিয়ো ভাইরাল না হলে আমরা এত গুরুত্ব পেতাম না। সরকার বা রাজনৈতিক দল কেউই আমাদের কথা বলত না। আমরা এত বছর ভারতে রয়েছি, ১৯১১ সালের সেনসাসেও আমরা আছি, কিন্তু আমাদের দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশী বলে।' আর কি কুকি, কি মেইতেই – সবার একটাই কথা, ৩ মে থেকে যা চলছে তারপর আর আমরা কখনো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারব না। এবং জানিনা কখনো, কোনোদিন শান্তি ফিরবে কিনা। আর গ্রেসি বলছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের গভীর নীরবতা এবং এখনও মুখ্যমন্ত্রী না-সরানো এর কারণটাই কেউ বুঝতে পারছে না।' যে সব ঘটনা বেশি আলোচিত হয়নি, তার একটি। যেমন ওইদিনই, ৪ মে, সন্ধেবেলা গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থায় দুই কুকি তরুণীর ঘরে ঢুকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ও খুন। ৪ ঘণ্টা ধরে ধর্ষণ চলেছিল। ইম্ফলে। বিবরণ দিয়ে পাঠকের আর মন খারাপ করতে চাইনা। এটা ঠিকই যে মায়ানমার থেকে ভারতে পঞ্চাশ হাজারের মতো কুকি গত দু বছরে প্রবেশ করেছে। এর ৪৫ হাজার ঘোষিত ভাবেই রয়েছে মিজোরামে আর বাকি ৫ হাজার মণিপুরে। কিন্তু মণিপুরে সব কুকিই বিদেশী, এটা বললে সত্যের অপলাপ হয়। যেমন সুপ্রিমকোর্টে ভারতের এসজি তুষার মেহতা বলেছেন, ইম্ফলের মর্গে যেসব মরদেহ রয়েছে সবই বিদেশী, এ জন্যই কেউ শবদেহের দাবি জানাতে আসেনি। সত্য উত্তর যুগে শুধু সংসদ নয়, শীর্ষ আদালতে দাঁড়িয়েও চরম মিথ্যে এখন সরকার পক্ষ বলতে পারে!

ঘটনা হল, কুকিদের এখন আর ইম্ফলে পা রাখার সাহস নেই। এজন্যই শতাধিক মরদেহ পড়ে রয়েছে মর্গে। যেমন ইম্ফলে ধর্ষণ-হত্যার পর ওই দুই তরুণীর মৃতদেহ। পরিস্থিতি এমনই যে মণিপুরের একমাত্র বিমানবন্দরে যেতে পারছেন না কুকিরা। কেননা তাহলে

ইম্ফলের ওপর দিয়ে যেতে হয়। আর তাই তারা এখন রাজ্য ছাড়তে হলে খুব খারাপ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন বহুদূরের আইজলে, যা মিজোরামের রাজধানী। মণিপুর থেকে অসমের বিন্নাকান্দি খুব কাছাকাছি, কিন্তু সেখানকার রাস্তা সুগম নয়। যদিও মণিপুরে সংঘর্ষ শুরুর পর বহু মানুষ সেখান থেকে এসে ডেরা বেঁধেছিল কাছাড়ের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে। কেন্দ্রীয় সরকার তো বটেই, রাজ্য সরকারেরও সদিচ্ছা থাকলে এই গোষ্ঠী সংঘর্ষ কয়েক দিনেই থামাতে পারত। কিন্তু সেটা রাজ্য বা কেন্দ্র, কোনো সরকারই চায়নি। এখানে তথ্য হিসেবে থেকে যাক, মণিপুরে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি দলের সঙ্গে কুকিদের বৈঠক হয়েছিল, সেখানে স্থির হয়, কুকিরা বিজেপিকে সমর্থন করবে। বিনিময়ে কী পাবে সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। মণিপুরে কুকিদের রয়েছে ৯ আসন। সবই বিজেপির। গোষ্ঠীসংঘর্ষ কেন থামাতে চায়নি প্রশাসন? প্রথমত জমি। দ্বিতীয়ত সংখ্যাগুরুর স্বার্থ। মণিপুরে মেইতেই-কুকি সংঘর্ষ শুরু হতেই একটা পক্ষ লাভের অঙ্ক কষেছে। নাগা ও কুকি একত্র হয়ে গেলেই মণিপুরের রাজনীতি বদলে যাবে, আর সেই সঙ্গে বদলে যাবে প্রশাসনিক অধিকারও। ১৯৯২ সালে নাগা-কুকি সংঘর্ষের পর ওই দুই সম্প্রদায়ের মিলন এখন প্রায় অবাস্তব বলেই সবার ধারণা। কিন্তু জীবন তো চলমান, ভবিষ্যতে কী হয় কে বলতে পারে! মেইতেইদের আক্রমণে কুকিরা কোণঠাসা — এটাই বর্তমান মণিপুরের চিত্র। আর এখানেই মজা কেন্দ্রীয় সরকারের। গুজরাট মডেল তুলে আনা হয়েছে মণিপুরে। মণিপুরকেও কুকিহীন বানাতে চায় সরকার। ইতিমধ্যে মণিপুরের এই পার্বত্য অঞ্চলে সংগঠিত পাম অয়েল চাষ করার জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিয়মাবলি রচনা করে, ৪ মার্চ ২০২১-এ গেজেট নোটিফিকেশনেও রয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশ, আসলে এন বীরেন সিংহ-এর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার আদিবাসী, মুখ্যত কুকি জনজাতিগোষ্ঠীর সম্মতি ব্যতিরেকেই মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। মণিপুরের ছটি জেলায় ৬৭ হাজার হেক্টর জমি পাম অয়েল চাষের জন্য চিহ্নিত করেছে। আর সে জমি ফাঁকা করার লক্ষ্যে একদিকে আফিম চাষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রচারকে সামনে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে মেইতেইদের পার্বত্য অঞ্চলে জমি ব্যবহারের অধিকারকে টোপ হিসাবে সামনে রাখা হয়েছে। জাতি দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় সরকারের পক্ষে "বুলডোজার-রাজ" চালানোর সুবিধা হবে, আর সেই জন্যেই মণিপুরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতেও প্রশাসনের আপাত নির্লিপ্তি, এবং প্রধানমন্ত্রীর হিরণ্ময় নীরবতা।

শুধুই পাম চাষ নয়, মণিপুরের এই পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে খনিজ আকরিকের ভাণ্ডার। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তৈরি করা ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়েছে চুনা পাথর, ক্রোমাইট, নিকেল, তামা, ম্যালাকা ইট সহ বিভিন্ন প্ল্যাটিনাম জাতীয় পদার্থের খনিজের ভাণ্ডার। ২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন লাইমস্টোনের ভাণ্ডার রয়েছে উখরাল, তেংনৌপাল এবং চান্ডেল জেলার গ্রামগুলিতে। রয়েছে ৬.৬ মেট্রিক টন ক্রোমাইটের ভাণ্ডার মূলত উখরুল ও কামজং জেলায়, আর কিছুটা রয়েছে তেংনৌপাল এবং চান্ডেলে। এই সমস্ত অঞ্চলের জমিতে মাইনিং লিজ দেওয়া শুরু হয়েছে। লাইমস্টোনের ৮টি ব্লকের জন্য ৩৪.৩৭ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে এই মাইনিং-এর জন্য চিহ্নিত করে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ইম্ফলে সংঘটিত বিজনেস সামিটে এই লক্ষ্যে ৩৯টি মৌ সই হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের আগে যে প্রি-ফিজিবিলিটি রিপোর্ট এই সংস্থা গুলি তৈরি করে, তা অসত্য তথ্যে ভরা। এর ওপর নির্ভর করেই পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, উখরুলের লুংহার গ্রামের মাইনিং এলাকা গুলিতে কোনো বনাঞ্চল বা কৃষি এলাকা নেই। সবই সরকারি পতিত জমি। বাস্তবে সিরোহী, লুংহার, সিংচা-গ্যামনম এলাকাটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। প্রজেক্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, মাইনিং লিজ এরিয়ার ১০কিমি-র মধ্যেই কো-সেনসিটিভ অঞ্চল নেই। কিন্তু বাস্তবে এই মাইনিং এলাকার ৪.৫ কিমি-র মধ্যেই রয়েছে 'সিরোইলিলি' নামে একটি বিশেষ বিরল এবং লুপ্ত প্রায় প্রজাতির লিলি-র বাসভূমি। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিংচা-গ্যামনম মাইনিং এলাকায় তেমন উল্লেখযোগ্য বসতিও নেই, আবার কোনো বনাঞ্চল ও নেই। এ তথ্যও সঠিক নয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, মণিপুরে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠী, বনাঞ্চলের জমিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহার করার অধিকারী। অথচ সেই সমস্ত অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ জমি, পাম অয়েল চাষ বা মাইনিং এর জন্য দেওয়া হচ্ছে। এই অঞ্চলগুলিতে তাংখুল নাগা এবং কুকি জনজাতিগোষ্ঠীর বাস।

সংবিধানের ৩৭১ (গ) ধারা অনুযায়ী এ ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের পূর্বে ঐ অঞ্চলের হিল এরিয়া কমিটির অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যিক। তা না নিয়ে, জাতি দাঙ্গার অজুহাতে এই অঞ্চলগুলিতে একের পর এক বসতি উচ্ছেদ চলছে। এ ধরনের মাইনিং প্রজেক্টের রূপায়নের পূর্বে নিয়মমাফিক পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণও করা হচ্ছে না। মণিপুর তিন ধরনের জৈব প্রজাতি (মালয়-পলিনেশিয়ান, টিবেটো-চাইনিজ এবং ইণ্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট) এর সঙ্গম স্থল। এ জাতীয় অঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এভাবে অগ্রাহ্য করা বিপজ্জনক। ক্রোমাইট মাইনিং এর মতো প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য দূষণ সৃষ্টির বিপদ ও বিবেচনার মধ্যে রাখা হচ্ছে না। ফলত মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া অমূলক নয়। অধিকার হারানোর বিরুদ্ধে আদিবাসী মানুষের সম্মিলিত বিক্ষোভ প্রতিহত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করা। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কাণ্ডারীরা দীর্ঘদিন ধরে সংগঠিত ধর্ম ও লোকজ ধর্মের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে বিভেদের বাতাবরণ তৈরির কাজে ব্যাপৃত। এই অঞ্চলের সমস্যা এখন বহুমুখী, এবং আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে। মণিপুর, মায়ানমারের দুটি প্রদেশ সাগাইং এবং চিনের লাগোয়া। মায়ানমারে গৃহযুদ্ধ চলছে। ফলে এই সীমান্ত অঞ্চলে বিপদ এক ভিন্ন মাত্রা

পেয়েছে। চিন প্রদেশ থেকে যাঁরা এদেশে ঢুকছেন, তাঁদের সঙ্গে জাতিগত সম্পর্ক রয়েছে মিজোরাম, মণিপুরের জনজাতি সমাজের। মিজোরাম সরকার এই শরণার্থীদের এদেশে আসায় বাধা দিতে রাজি নয়। অন্যদিকে মণিপুরে এর ফলে চাপ বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে দুতিনটি আইনের কথা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি সংসদে পাশ হয়েছে। প্রথম হল অরণ্য আইন। যেখানে বলা হয়েছে সরকার ইচ্ছে করলেই বেসরকারি সংস্থাকে অরণ্যভূমির অধিকার দিতে পারবে। আগে এজন্য অরণ্যবাসীদের অনুমতি নিতে হত। আর সীমান্তের ১০০ কিমি পর্যন্ত সরকারের কোনো অনুমতি দরকার নেই, যে কাউকে মানে বেসরকারি সংস্থাকেও এই জমি দিতে পারবে। আরেকটি হল খনিজ আইন। পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে যে ১২টি খনিজ দরকার পড়ে তা খননের এতদিন একক অধিকারী ছিল সরকার, নতুন আইনে বেসরকারি সংস্থা এর ছয়টি খনিজ খনন করতে পারবে।

এবং মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলকে কাজে লাগানো হবে এসব কাজে। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বছর পাঁচেক আগে জানা গেল কাশ্মীরে রয়েছে লিথিয়ামের বিরাট ভাণ্ডার। অথচ ভারত সরকারের তৎকালীন আইনে বেসরকারি সংস্থার ওই খননের অধিকার ছিল না। এখন আর বাধা নেই। সব জমি আগেই ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। যা কিছু বাকি আছে তা রয়েছে পাহাড়ে, অরণ্যে, সৈকতে। এখন সব আইন হয়ে গেছে, কোনো বাধা নেই। মিস্টার আদানি, মিস্টার গোদরেজ, মিস্টার আম্বানি... আপনারা আসুন, আমরা কুকিদের তাড়াচ্ছি, মণিপুরের পাহাড়-জঙ্গল মুক্ত করছি। আপনারা শুধু আসুন দয়া করে...।

(তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়া টুডে, এনডিটিভি, বিবিসি, দ্য টেলিগ্রাফ, মার্কসবাদী পথ)

বিরোধী শূন্য ভোটার তালিকা তৈরি করাটাই SIR এর প্রাথমিক লক্ষ্য

সুমন সেনগুপ্ত

অবশেষে এসে গেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একেকবার একেকরকম বয়ানের মাঝখান থেকে জানা গেছে, এই তালিকাই চূড়ান্ত তালিকা নয়। এর পর আরও তালিকা আসবে। যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেই তালিকায় যেমন আছে যোগ্য ব্যক্তিদের নাম, তেমন আছে মুছে দেওয়া মানুষের নাম। কেন মুছে দেওয়া হয়েছে তার কারণ অবশ্য লেখা নেই, আর আছে বিবেচনাধীন নাম। অর্থাৎ এখনও যে মানুষদের নামের নথি যাচাই শেষ হয়নি, তাঁদের নাম। এইটাকে অনেকে কলেজে বা স্কুলে ভর্তির প্রথম তালিকাও বলতে পারেন। আবার কিছুদিন পরে দ্বিতীয়, তার কিছুদিন পরে তৃতীয়, চতুর্থ আরও কত তালিকা প্রকাশিত হবে কেউ জানে না। গোটা বিষয়টাই হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে এবং বাংলার বিচারবিভাগের তত্ত্বাবধানে। শেষে ফাইনাল লিস্টে দেখা গেল ৯১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ।

অনেকে প্রশ্ন করছিলেন বারোটি রাজ্যে তো এসআইআর হচ্ছে তাহলে শুধু বাংলাতেই অসুবিধা কেন? অসুবিধা বারোটি রাজ্যেই হচ্ছে। কোথাও খবর পাওয়া যাচ্ছে কোথাও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টা আসলে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে বিরোধী যারা তারা বুঝতে অব্দি পারলেন না যে তাদের ভোটার বেস কিভাবে মুছে দেওয়া হলো। তারা অন্য বিষয় নিয়ে চিৎকার করে গেলেন, ফেসবুক ভরিয়ে দিলেন আরো অনেক বিষয় নিয়ে, কিন্তু মাঝখান থেকে বাদ পড়লেন অসংখ্য সংখ্যালঘু দলিত প্রান্তিক মানুষজন এবং অবশ্যই মহিলারা। গত লোকসভা নির্বাচনে 'আবকি বার ৪০০ পারে'র স্লোগান যখন ব্যর্থ হয় তখনই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে ভোটার তালিকা তে এমন গোলমাল করতে হবে যাতে বিরোধীরা আর মাথা তুলেই দাঁড়াতে না পারে। সেই অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে 'এসআইআর' করার জন্য বলা এবং সেটাও কোন লিখিতভাবে নয়। সেই অনুযায়ী বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা এই সমস্ত কিছুই এই 'এসআইআর' প্রক্রিয়ায় হলো আর বিরোধী দলগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল এই চক্রান্ত বুঝতে।

ভোটার তালিকায় আগে চুরি ছিল আর এখন যে তালিকা হয়েছে তা রীতিমত পুকুরচুরি। দেশের অন্যতম একটি স্বশাসিত সংস্থা, কীভাবে প্রধান শাসকদলের হয়ে কাজ করলো, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে। গুজরাটেই প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গেছে। ৩৪ লক্ষ মধ্যপ্রদেশে, ৩১ লক্ষ রাজস্থানে এবং ৩৪ লক্ষ ছত্তিশগড়ে। প্রাথমিকভাবে উত্তরপ্রদেশেই ২.৫ কোটি মানুষের নাম বাদ গিয়েছিল। এই রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিই বিজেপি শাসিত। বিরোধী শাসিত রাজ্য তামিলনাডুতে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা ৭৪ লক্ষ। দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বেশ কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে তারা আরো ৫০ বছর রাজত্ব করবেন। এই এসআইআর প্রক্রিয়া তার বক্তব্যকেই সিলমোহর দিল। বাংলায় কি হবে জানা নেই কতজন বাদ যাবেন জানা নেই, কিন্তু সারাদেশে বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়ার এই চক্রান্তে সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকলো নির্বাচন কমিশন এবং তাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করল চোখ বুজে থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। যখন সবার আগে এই এসআইআর প্রক্রিয়ার আদৌ সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে নাকি সেইটা নিয়ে আদালতের বিচার

হওয়া উচিত ছিল তখন তারা কি করে এসআইআর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে। অবশ্যই বলতে হবে গদি মিডিয়ার কথা যারা দেখেও না দেখার ভান করেছে। বিহারের উদাহরণ তাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা চুপ করে থেকেছেন এবং এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে গেছেন। সুতরাং আজকে যদি কেউ ভাবেন, যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নজরদারিতে প্রকাশিত হওয়া এই তালিকা শুদ্ধ এবং কোনও ভুল নেই এই তালিকায়, তাহলে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

অন্য রাজ্যে এইরকম ধাপে ধাপে তালিকা প্রকাশ হয়নি, শুধু বাংলাতেই এই প্রক্রিয়া কেন, তা নিয়েও অনেক কথা বলতে হয়। প্রাথমিকভাবে মৃত, স্থানান্তরিত এবং খুঁজে না পাওয়া ভোটারদের সংখ্যাই ছিল ৫৮ লক্ষ। তার মধ্যেও বেশ কিছু জীবিত মানুষ ছিলেন, তাঁদের নামও ছিল। প্রাথমিকভাবে দেখা গিয়েছিল, যে ২০০২ সালের তালিকায় নাম থাকা এবং সেই নামের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা প্রায় সমস্ত ব্যক্তিরই নাম ছিল। অসুবিধা শুরু হয় তার পরে। তারপরেই নির্বাচন কমিশনের দৌলতে আমরা নতুন একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হই—'লজিকাল ডিস্ক্রিপেন্সি'। শোনা গেল নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব প্রযুক্তি যাঁদের মনে করছে সন্দেহজনক, তাঁদেরকেই কমিশন শুনানিতে ডেকে নথিপত্র দেখতে চাইছে এবং সেটা একবার নয়, বারংবার। দীর্ঘদিন এই দেশে থেকে, ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করার পরে, যদি কোনও ব্যক্তিকে শুনানিতে ডেকে প্রমাণ দিতে হয় তিনি এই দেশের নাগরিক এবং তাঁর বাপঠাকুর্দারা এই দেশে এসেছেন স্বাধীনতার পরে কিংবা কমিশন নির্ধারিত সময়সীমার আগেই, তাহলে মান এবং হুঁশ সম্পন্ন একজন ব্যক্তির কেমন লাগতে পারে? সেই জন্যেই এত হয়রানির পরে, অনেকেই নির্বাচন কমিশনকে নির্যাতন কমিশন বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করছেন না। কিন্তু কোনও কিছুই বিচার্য হয়নি নির্বাচন কমিশনের কাছে, এমনকি দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলা সত্ত্বেও তাঁরা ঐ 'লজিকাল ডিস্ক্রিপেন্সি'র তালিকায় কাদের নাম আছে সেই তালিকা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেনি। কী কারণে কাদের ডাকা হয়েছে, তার তালিকাও সাধারণ মানুষের হাতে নেই। বুথ স্তরের কর্মী বা এআরওদের প্রশ্ন করলে, তাঁরা বলেছে বটে যে তালিকা বুথে বুথে টাঙানো হয়েছে কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। যার ফলে একদিকে যেমন সাংবাদিকেরাও এই বিষয়টা নিয়ে খবর করতে পারেননি, তেমনি রাজনৈতিক দলেরাও পারেনি ভুক্তভোগী মানুষদের সহায়তা করতে।

শুধু এখানেই থেমে থাকেনি বিষয়টা। যাঁদের কোনও নথি নিয়ে সমস্যা খুঁজে বের করা যায়নি, তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কেউ বা কারা ছাপানো ফর্ম ৭ জমা করেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট ব্যক্তি 'ভারতীয় নাগরিক নন'। আরও বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে তাঁর ভারতীয়ত্বের স্বপক্ষে নির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল করতে শুনানিতে আসতে হবে। প্রতিটি ফর্ম ৭ যে জমা পড়েছে, তার মধ্যে একটাই মিল। প্রতিটি ফর্মই জমা পড়েছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নামে এবং যাঁরা জমা করেছেন, তাঁরা কেউই সংশ্লিষ্ট বুথের কোনও বিএলএ নন, অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের অঞ্চল স্তরের কর্মী নন। এই ঘটনার কয়েকটি মাত্র খবর এসেছে, আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই খবর আসেইনি। সন্দেশখালিতে দেখা গেছে, প্রায় ৪০০০ মুসলমান মহিলা এবং পুরুষের নামে এইরকম ফর্ম ৭ জমা পড়েছে। খোঁজ নিতে গিয়ে বেশ কিছু সমাজকর্মী দেখেছেন, অঞ্চলের বিজেপি'র কর্মীরা অবধি জানেন না, কারা এই ফর্ম ৭ জমা করেছেন। শুধু সন্দেশখালি নয়, হাওড়াতেও এই ধরনের একটি ঘটনার খবর এসেছে। দেখা গেছে ভারতীয় রেলের এক প্রাক্তন কর্মী শেখ লিয়াকৎ হোসেনকে বলা হয়েছে, তিনি যেন তাঁর নাগরিকত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য শুনানিতে হাজির হন।

এই ফর্ম ৭ সংক্রান্ত অভিযোগ শুধু বাংলা থেকেই এসেছে এমনটা নয়। রাজস্থানে আলওয়ারে এক বিএলও'র কাছে ফোন এসেছিল, মুসলমান ভোটারদের নাম বাদ দিতে হবে এবং সেই সংক্রান্ত ফর্ম ৭ জমা হয়েছে বলে। গুজরাটে পদ্মশ্রী প্রাপ্ত লোকশিল্পী হাজিভাই কাসমভাই যিনি ঐ রাজ্যে হাজি রামকাড়ু নামে পরিচিত, তাঁর নামে ফর্ম ৭ জমা করেছিলেন বিজেপির এক নেতা। যেদিন তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক হিসেবে ঘোষণা করে, তার ৪৮ ঘণ্টা পরে এই খবরটি প্রকাশিত হয়, যে তাঁর নামেই ঐ ফর্ম ৭ এর অভিযোগপত্র জমা পড়েছে। ঐ অভিযোগ তাঁর নামে জমা পড়েছে শোনার পরে ঢোল শিল্পী বলেন, তিনি ৬০ বছর ধরে এই দেশে ঐ অঞ্চলে বসবাস করছেন, সরকার তাঁর কাজের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করছে আর বিজেপির নেতারা তাঁকেই দেশের নাগরিক নন, এই কথাটা প্রমাণ করতে চাইছেন, এই বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক। গবাদি পশু কল্যাণের জন্য ৩,০০০ টিরও বেশি দাতব্য অনুষ্ঠানে এবং ১,০০০ স্টেজ শোতে ঢোল বাজানো এই শিল্পী এই পদক্ষেপে গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন। তারপরে এই বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত শোরগোল হওয়ার পরে অভিযোগকারী বিজেপি নেতা বলেন, কোথাও একটা ভুল হয়েছে, তিনি হাজি রামকাড়ু'র নাম বাদ দিতে চাননি। ভোটার তালিকায় অন্য নাম দেখাচ্ছিল, তাই সেটা ঠিক করার উদ্দেশ্যেই এই কাজটা করেছেন। এইরকম অজস্র খবর পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশ থেকেও। ঐ রাজ্য থেকেও এই ফর্ম ৭ এর অপব্যবহার সংক্রান্ত মামলাও হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। অসমে তো আরও বড় ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি শাসিত ঐ রাজ্যের এক বুথ স্তরের কর্মী, সুমনা রহমান চৌধুরী অভিযোগ করেছেন সর্বসমক্ষে যে তাঁর কাছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ৬০টি ফর্ম ৭ এর অভিযোগপত্র দিয়ে বলা হয়েছে খতিয়ে দেখতে, যে আদৌ অভিযোগগুলো সঠিক কি না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে সুমনা দেখতে পান যে তিনি যে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা, সেই স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক, যার কাছে তিনি রোজ হাজিরা দেন, সেই প্রধান শিক্ষকের নামেই অভিযোগ জমা পড়েছে। শুধু তাঁর নামেই নয়, আরও অসংখ্য জীবিত মানুষ, যাঁরা দীর্ঘদিন এই দেশের বাসিন্দা, এমনকি যাঁদের নাম আসামের নাগরিকপঞ্জির তালিকাতেও আছে, তাঁদের নামেও এই ফর্ম ৭ জমা পড়েছে যাতে তাঁদের নাম নতুন

'শুদ্ধ' ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়। এই ঘটনাটি সামনে নিয়ে আসার কারণে ঐ বিএলও সুমনা রহমান চৌধুরীকে কর্তব্যে গাফিলতির কারণে তাঁর চাকরি থেকে নিলম্বিত করা হয়েছে।

তালিকার বাইরে যারা থাকবেন তারা আবারও সেই আশঙ্কায় ভুগবেন যে তাদের নাম থাকবে তো? আদালত বলেছে ধাপে ধাপে নাকি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে এরপরে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে তখন আদালত বলবে যাদের নাম তালিকায় নেই তারা মনোনয়ন জমা দেওয়ার সাত দিন আগে অব্দি ফর্ম ৬ জমা করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন ও তাতে সায় দেবে। এরপর নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে কোন একজন ব্যক্তিও কি কোনও রাজনৈতিক দলকে আর সঙ্গে পাবে? কোনো রাজনৈতিক দল কি আর উৎসাহী হয়ে কোনও বাদ যাওয়া ব্যক্তির হয়ে কথা বলবে কিংবা ফর্ম ৬ জমা করবে? তাহলে সেই মানুষগুলোর কি হবে? যে রাজনৈতিক দল বলেছেন একজনও বৈধ ভোটারকে বাদ দিতে দেব না, কিংবা যারা এখনো বলছেন একজন বৈধ ভোটার এর নাম বাদ গেলে আমরা নির্বাচন কমিশনের জিনা হারাম করে দেবো সেই রাজনৈতিক দলগুলোকে তখন কোনো একজন ভোটারও খুঁজে পাবেন তো? যখন এই কথাটা বলা জরুরি, একটি সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কারণে একজন ভোটারের নামও বাদ না যায়, এবং সেটা আইনত, সংবিধানগতভাবে অসঙ্গত ও অগ্রহণযোগ্য, তখন নাগরিক সমাজ যদি চুপ থাকে তখন ভয় হয়। ভোটার তালিকা সংশোধন কোনও মতেই কোনও একজন ব্যক্তিরও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের কৌশল হতে পারে না, এই কথা শুধু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নয়, নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও বলতে হবে এবং সেটা সজোরে, তাহলে যদি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের টনক নড়ে। কী পদ্ধতিতে হবে জানা নেই, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের রাজ্যে কিংবা দেশে নাগরিক সমাজও অনেকখানি রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী, এবং সেটাই ভয়ের কারণ। নাগরিক সমাজ যদি এই বিষয় নিয়ে আরো সচেতনতা দেখাতে পারতো, এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিত, তাহলে হয়তো কিছু সুবিধা হতো, তাহলে হয়তো দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে বাধ্য করানো যেত, এই প্রক্রিয়া বন্ধ করাতে।

[নির্বাচনের আগে লেখা]

অগভীর গঙ্গার দ্বীপে মিনি বন্দর বলাগড়ে

বিবর্তন ভট্টাচার্য

১৮ জানুয়ারি, ২০২৬, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে এসে আদানিকে উপহার দেওয়া বলাগড়ের মিনি বন্দরটি উদ্বোধন করলেন; সারা বিশ্বে শুধুমাত্র বাড়তে থাকা উষ্ণতার জন্য যখন প্রতি মিনিটে একজন মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লণ্ডন (ইউ. সি. এল.) -এর অধ্যাপক মারিনা রোমানেল্লার সমীক্ষা এবং বিশ্লেষণে সম্প্রতি ভয়াবহ এই তথ্য উঠে এসেছে। উষ্ণতা ডেকে আনছে চরম বায়ুদূষণ, দাবানল, অসংখ্য রোগ আর এই সবের জেরেই মারা যাচ্ছে মানুষ প্রতি মিনিটে একজন। এ বড় সুখের সময় নয়। তবু দেশের নেতাদের এইসব তথ্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং বিচলিত করে না। বরং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নিজেদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং ব্যাপারটাকেই ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দেন। উল্টে নানা দেশের সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা উড়িয়ে দেন ফসিল ফুয়েলস ব্যবহারকারী কোম্পানিগুলোর সুবিধার্থে। পরিবেশ কতটা বিপর্যস্ত হচ্ছে, তা' ভাববার সময় নেই। দিল্লিতে যমুনার জলে ডুব দিয়ে ছট পুজোতে ব্রতী হবেন বিহারের নির্বাচনের আগে, তাতে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট জাগ্রত হবে; এই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু যমুনার জল এতটাই দূষিত যে তা' আর হল না। যমুনার জল খাওয়া তো দূরস্ত, ডুব দিলে চর্মরোগ অবধারিত—তাই তা' আর হয়নি।

এবার গঙ্গা শুদ্ধিকরণের কথা মুখে বলে ভয়ংকর বিপদের মধ্যে ফেলতে চলেছে এই বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা।

গত আগস্ট, ২০২৩, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এই বন্দর স্থাপনের আলোচনা করতে উপস্থিত হন বলাগড় বি.ডি.ও. অফিসে। তখন থেকেই এলাকার কৃষক এবং মৎস্যজীবীগণের জিজ্ঞাস্য কেন এই বন্দর ? কাদের উপকারে লাগবে এই বন্দর?

কলকাতা বন্দর থেকে N.T.P.C. র কয়লাবাহী জাহাজের তেল নেওয়া ও রেস্ট নেওয়ার জন্যই এই মিনি বন্দর। এখন প্রশ্ন, এই কয়লা কার? উত্তর আদানির। তাকে খুশি করতেই এই বন্দর উপহার।

বন্দর গড়ে উঠলে তেল-কালি-ময়লা জলে পড়ে এই উর্বর কৃষিপ্রধান অঞ্চলটি দূষিত হবে। এছাড়া গঙ্গার দু-পাড়ে বলাগড় থেকে কালনাঘাট এই অঞ্চলে ৫০০০ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ছোটো হালদার নৌকা নিয়ে মাছ ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে; তাঁরা কোথায় যাবেন?

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে ইস্কনের ট্র্যাভেলিং লঞ্চ বা C.P.T. র লঞ্চ বা জাহাজ যাওয়ার সময় প্রায়শই মৎস্যজীবীগণের জাল ছিঁড়ে নৌকা ডুবিয়ে যাতায়াত করে এবং মৎস্যজীবীগণের সাথে নিত্যদিন সংঘর্ষ লেগেই থাকে। আর যেখানে বন্দর করবার পরিকল্পনা হচ্ছে সেখানে C.E.S.C. একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট (৭৫০ মেগাওয়াট) করবার পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু এই চড়ার তলা দিয়ে জোয়ার ভাটা খেলায় তাতে ফিজিবিলিটি পায়নি এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তাই ২০০৭ সালে এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।

পরিবেশগত কারণে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের আপত্তি ছিল। কেননা B.T.P.S.-এর অভিজ্ঞতা হুগলি জেলার কুন্তীঘাট,

ব্যাগুলের মানুষের আছে। কালো ছাই আর গরম জল ঠাণ্ডা না করে সরাসরি গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার ফলে মাছ উৎপাদন ব্যাপকহারে ব্যাহত হয়।

বন্দর হলে হুগলি জেলার বলাগড় থেকে কালনা আর এদিকে খামারগাছি, কুন্তীঘাট, সোমড়া আর গঙ্গার এপারে নদিয়াতে রানিনগর, গৌরনগর, মুকুন্দনগর, নন্দীঘাট, গবার চড়া, সবুজদ্বীপ সব শেষ হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণ (সংখ্যায় ৫০০০) আর মাছ ধরতে পারবেন না। সম্পূর্ণরূপে জীবিকা হারাবেন।

শীতকালে গৌরনগরের বিপরীত পাড়ে মিলননগর অঞ্চলে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে চুপির চড়ের মতো, তাদের আসাও বন্ধ হয়ে যাবে । সবথেকে বড় কথা, বন্দর হলে ক্রিমিন্যাল অ্যাক্টিভিটি বৃদ্ধি পাবে। এলাকায় যৌনপল্লী তৈরি হবে। বন্দরকে কেন্দ্র করে সচরাচর যে সমাজ গড়ে ওঠে এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সামাজিক পরিবেশ দূষিত হবে।

বড বড় হাইমার্স আলোতে পাখিদের প্রজননের ভীষণ অসুবিধা হবে। এলাকার জীববৈচিত্র্য ভেঙে পড়বে এই তেল - কালি- কয়লার অত্যাচারে।

কিছু মানুষ ভাবছেন, এই উন্নয়নের ফলে উপার্জনের পথ খুলে যাবে; স্থানীয় মানুষের আয় বাড়বে।

সে ধারণা যে কতটা ভুল তা' বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সমুদ্রের পাড়ে গড়ে ওঠা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, রকেট লঞ্চিং স্টেশন, বৃহদাকার আবাসন নির্মাণ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণের চিরাচরিত জীবিকা পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। কৃষক জমি হারিয়ে মানসিক কষ্টে মারা গিয়েছেন। সবথেকে বড় কথা, ভূ - গর্ভস্থ জল দূষিত হলে এলাকার বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা -- তাঁরা কি বাঁচতে পারবেন?

হুগলী নদীর জলহ্রাস ও ড্রেজিং-এর অভাবে চড়া পড়ে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে, বড় জাহাজ মোহনার পর আর ঢুকতে পারে না, তখন বলাগড়ে এইসব বন্দর বন্দর খেলা বন্ধ হোক। এলাকার মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা না বলে আদানির এই মিনি বন্দর স্থাপন করা ঠিক হবে না। এলাকার মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন। পথসভা-মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। অগভীর গঙ্গায় এই মিনি বন্দর কতটা গ্রহণযোগ্য তা' গভীরভাবে ভাবতে হবে।

নাস্তিকতার আন্দোলন

ভবানীপ্রসাদ সাহ

নাস্তিকতা বলতে বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝায় যা স্পষ্টভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এবং এরই প্রাসঙ্গিকতায় ঈশ্বর বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে কৃত্রিম ও মনুষ্যসৃষ্ট বলে চিহ্নিত করে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এই ঈশ্বর নানা নামে পরিচিত,—ভগবান, দেবতা, আল্লা, খোদা, গড, জিহোবা (ইয়াহুবা), আহুরা মাজদা ইত্যাদি ইত্যাদি। নাস্তিকতার পরিবর্তে অনেকে অনীশ, না—ঈশ্বর, নিরীশ্বরবাদী ইত্যাদি প্রায় সমার্থক শব্দও ব্যবহার করেন। পৃথিবীতে বিশেষ করে ভারতীয় ও গ্রীক ঐতিহ্যে এই নাস্তিকতার চর্চা ও আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। নাস্তিকতার আন্দোলন একটি সামাজিক ও দার্শনিক আন্দোলন হলেও, প্রকৃত বিচারে তার অর্থনৈতিক দিকও আছে এবং এটি শ্রেণিসংগ্রামের অন্যতম অঙ্গ।

নাস্তিকতা, নিরীশ্বরবাদ, অনীশ ভাবনা (Atheism) শব্দগুলিকে অনেকে নেতিবাচক বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে নাস্তিকতা ইত্যাদি বলার অর্থ ব্যাকরণগতভবে আগে 'ঈশ্বর' বলে কিছু একটাকে 'স্বীকার' করে নিয়ে, তারপর তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে এটি একটি অপযুক্তি এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার বিচারে নাস্তিকতা জাতীয় শব্দই ইতিবাচক। এবং পরবর্তীকালে শাসকশ্রেণিবিরোধী পরিভাষা হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্তও বটে।

এখনো অব্দি জানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণের মধ্য দিয়ে এটি এখন প্রতিষ্ঠিত যে, এখন থেকে প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে একটি **মহাবিস্ফোরণ (Big Bang)**-এর মধ্য দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির সূচনা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে চলা প্রাকৃতিক বিবর্তনে পৃথিবীর সৃষ্টি। আদিম পৃথিবীতে চলা জৈবরাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টির প্রায় ১০০ কোটি বছর পরে, ৩৫০ কোটি বছর আগে প্রথম জীবিত কোষ সৃষ্টি হয়, লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনে এর থেকেই পৃথিবীতে প্রায় ৪ লক্ষ উদ্ভিদের প্রজাতি, ১৯-৭৭ লক্ষ প্রাণীজ ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদির জন্ম, তার মধ্যে প্রকৃতিতে টিকতে না পেরে অসংখ্য প্রাণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এবং এই বিবর্তনের মাধ্যমেই নানা প্রাণী থেকে বাঁদর জাতীয় প্রাণী আর তার একটি শাখা থেকে যেন এই সেদিন, মাত্র ৭০ লক্ষ বছর আগে মধ্য আফ্রিকার চাড অঞ্চলে যথাসম্ভব প্রথম মনুষ্য প্রায় প্রাণী (বা হোমিসিড)-য় আবির্ভাব ঘটে। চারপায়ে চলা এই হোমিসিড দু'পায়ে হাঁটতে শেখে কম করে ১০ লক্ষ বছরের প্রচেষ্টায়। তবে সুস্পষ্টভাবে দ্বিপদ মনুষ্য প্রায় প্রাণী, অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যানামেনসিস-এর দেখা পাওয়া যায় উত্তর তাঞ্জানিয়ায়,—৩৬ লক্ষ বছর আগে। এদেরই বিরামহীন বিবর্তনে নানা ধরনের আদিম মানুষ সৃষ্টি হতে থাকে, শেষ অব্দি আসে হোমো সোময়েন নিয়ানডার্থালিস প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে এবং ৩০০০০ বছর আগে যা বিলুপ্ত হয়। অন্য ধারার একটি বিবর্তনে আরেকটু উন্নত প্রাণী অর্থাৎ আধুনিক মানুষ **(হোমো সেপিয়েন সেপিয়েন)** সুনিশ্চিতভাবে দেখা দেয় ইথিওপিয়ায়,— ১ লক্ষ ৬০ হাজার বছর আগে। এখনো অব্দি জানা প্রাণীদের মধ্যে এদেরই মস্তিষ্ক ও

কর্মদক্ষতা সর্বোন্নত, যাও অর্জিত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে অস্তিত্বরক্ষার নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। এরাই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে বসতি ও বংশ বিস্তার করে,—১ লক্ষ বছর আগে মধ্য প্রাচ্যে ও প্রাচ্য দেশে, ৬০০০০ বছর আগে চিনে, ৫৫০০০ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায়, ৪০০০০ বছর আগে দক্ষিণ ফ্রান্স হয়ে ইয়োরোপে, ১৩৫০০ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস-এ ও ১২৫০০ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে।

অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য গবেষণায় এসব এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা গেলেও, এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কল্পিত ঈশ্বর জাতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব কোথায়? একেবারেই নেই। যা নেই, তাকে নেই হিসেবে বলাটা কিভাবে নেতিবাচক নয়।

আসলে মানুষের এই ঈশ্বর কল্পনা নাস্তিকতার সিদ্ধান্তের অনেক আগে নেওয়া। তাই ব্যাকরণভাবে তা নেতিবাচক হতে বাধ্য।

এখন থেকে প্রায় ৬০০০০ বছর আগের কথা। এখনকার **উত্তর ইরাকের শানিদার** গুহার চার নম্বর অংশে এক নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ মারা গেছেন। তাঁকে কবর দেওয়া হল, শুধু তাই নয় তাঁর কবরে ফুলও রাখা হল। হয়তো কিছু অনুষ্ঠানও করা হল। আপাতভাবে এটি একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা মনে হলেও, এখনো অব্দি এটিই প্রমাণিত প্রথম ঘটনা, যেখানে মৃতদেহকে এদিক ওদিক ফেলে না দিয়ে যত্ন করে কবর দেওয়া হচ্ছে এবং তার উদ্দেশ্যে ফুল ইত্যাদিও দেওয়া হচ্ছে। এর আগে কোন মনুষ্যপ্রায় প্রাণী তা করে নি, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে তো তার প্রশ্নই নেই।

এবং এর থেকেই জানা গেছে যে, মোটামুটি ঐ সময় কালেই **'মৃত্যু পরবর্তী প্রাণ'**, তাকে সম্মান বা ভালবাসা জানানোর আদিমতম চিন্তা মানুষের মাথায় আসে। এরই হাত ধরে ঐ আদিম 'মানুষ' নিজেদের চারপাশের ও মহাকাশের নানাবিধ ঘটনা, বিপর্যয় ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ বা কর্তা হিসেবেও কোন এক সর্বশক্তিমান অদৃশ্য সত্তার কাল্পনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 'কোন কাজ হলে তার কর্তা কেউ একজন থাকবেই'—এই সহজ যুক্তিবোধের সাহায্যে এমন কল্পনা ধীরে ধীরে জাগরুক হয়। ঐ মানুষের এমন অসাধারণ কল্পনাই তার দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম, চিন্তাভাবনা, ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে সম্পৃক্তভাবেই মিশে যেতে থাকে। কোন মনুষ্যেত্তর প্রাণী যা পারে নি, উন্নত হতে থাকা মস্তিষ্ক তথা চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি উন্নত ক্ষমতায় 'মানুষের' পক্ষে সেটি সম্ভব হয়। আর এই কাল্পনিক সিদ্ধান্তই পরবর্তীকালে আত্মা ও ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছে। কাউকে সন্তুষ্ট করতে হলে, বা ক্রন্দনরত শিশুকে থামাতে গেলে, তাকে কিছু দেওয়া, তার সামনে অঙ্গভঙ্গী করা, উদ্ভট শব্দ করা ইত্যাদির মত সহজ পর্যবেক্ষণই আদিম মানুষের মধ্যে ঐ 'মৃত্যু পরবর্তী প্রাণ' (হয়তো তা ক্ষতিও করতে পারে) ও **অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক সত্তা** (যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে দৈনন্দিন বিপদ আপদের নিয়ন্তা)—এ দুই রহস্যময় শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাকে ফুল ফল থেকে নানা কিছু নিবেদন করা তার উদ্দেশ্যে নানা অঙ্গভঙ্গি ও আওয়াজ করা ইত্যাদি কাজকর্মে উৎসাহিত করে। বহু হাজার বছরের বিবর্তনে তা পূজা প্রার্থনা, অঞ্জলি, বলিদান, আধ্যাত্মিক নৃত্য, ধর্মীয় সঙ্গীত ইত্যাদিতে পরিণত হয়। সৃষ্টি হয় যাদু বা ম্যাজিক, মিথ্যা হলেও যাকে কার্যকরী বলে ভাবা হয়েছিল। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের অবলুপ্তির বেশ কিছু আগেই হোমো সেমিয়েনের (অর্থাৎ আধুনিক মানুষের) উদ্ভব ঘটতে থাকে। তাদের মধ্যে মিলন মিশ্রণ সংঘাত—সবই হত, মোটামুটি চিন্তা ভাবনায় উভয়েরই মিল ছিল। তাই অঙ্কের হিসেবে শুধু নিয়াণ্ডার্থালরা নয়, হোমো সেপিয়েনও এই চিন্তার শরিক ছিল। নাস্তিকতার প্রসঙ্গে ঈশ্বর কল্পনার সৃষ্টি এইভাবে ৪০-৬০ হাজার বছর আগে। একে সন্তুষ্ট করার নানাবিধ কাল্পনিক পদ্ধতিও মানুষ অনুসরণ করতে থাকে। স্পেনের **এল জুিয়ো (El Juyo)** গুহায় পাওয়া অভ্যন্তরীণ অলংকরণ থেকে অনুমান করা যায়, এটি ছিল ঐ সন্তুষ্ট করার একটি স্থান (যা এখনকার গির্জা, মসজিদ, মন্দির, সিনাগগ ইত্যাদির পূর্বসূরী)। এর সময় কাল প্রায় ১২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং এখনো অব্দি আবিষ্কৃত এটিই মানুষের আদিমতম পূজাস্থল।

এই 'মৃত্যুপরবর্তী প্রাণ', ঐশ্বরিক জাতীয় একটি শক্তি এবং তাদের সন্তুষ্ট করার নানা কাল্পনিক প্রক্রিয়া—এগুলিই মানুষের দৈনন্দিন জীবন মনন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে নানাবিধ আবিষ্কার করতে থাকে। প্রায় ১০০০ বছর আগে শুরু হওয়া **নব্যপ্রস্তর যুগের** আগে, দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা **পুরা প্রস্তর যুগে** (যে নামকরণ আধুনিক সময়ে করা), মানুষ পশুকে পোষ মানানো ও কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। ফলে মানুষ আর খাদ্য সংগ্রাহক নয়, খাদ্য উৎপাদক হয়ে উঠতে থাকল। নিছক ফলমূল সংগ্রহ ও শিকারের অনিশ্চয়তার মধ্যে নয়, নিজেদের খাদ্য জোগানের নিশ্চয়তা সে পেল, আর এইভাবেই একসময় উৎপাদিত শস্য, পালিত পশু তথা সামাজিক সম্পদ বিপুলভাবে বাড়তে থাকে। আগের মত সবাইকে শিকার আর ফলমূল সংগ্রহে যুক্ত থাকার প্রয়োজন হয় না। কিছু ব্যক্তি সবার মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সবাইকে নেতৃত্ব দেওয়া, যাদুবিদ্যাসহ নানা কাল্পনিক পদ্ধতির সাহায্যে অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করা, কিছু অন্যান্য ধরনের (দার্শনিক) চিন্তাভাবনা করা—ইত্যাদিতে যুক্ত হতে থাকল। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল শ্রেণিবিভক্ত সমাজ—যার সূচনা এখন থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগে।

এতদিন মানুষের মধ্যে ঐ কল্পিত ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস বা সন্তুষ্ট করার ব্যাপারটার মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। মিথ্যা হলেও অনাবিল ঐ বিশ্বাস ছিল সর্বজনীন। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র যেমন পাল্টাতে থাকল, তেমনি এই বহু শত বছরের 'স্বাভাবিক' (কিন্তু অলীক) বিশ্বাসের ব্যবহার ও চরিত্রও পাল্টাতে থাকল।

শুরুতে গোষ্ঠীর মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা, সবাইকে সুরক্ষিত রাখা, কল্পিত যাদুবিদ্যা জাতীয় পদ্ধতিতে সবাইকে বিপদমুক্ত রাখা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করে বা তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটি দিল সমাজবিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

এই বিশেষ ব্যক্তিদেরকে শারীরিক শ্রমে সময় ব্যয় না করে তার সুনির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হত। কিন্তু ক্রমশ এরাই হয়ে ওঠে সুবিধাভোগী শ্রেণী, সম্পদের বড় অংশের মালিক। এবং নিজেদের এই সুবিধা ও সম্পদকে সুরক্ষিত রাখতে নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাই তার বিরোধিতা করা ঈশ্বরেরই বিরোধিতা করার মত চিন্তা ভাব সৃষ্টি ও প্রচার শুরু হল। শ্রম না করার কারণে অবসর সময়ে তারা নানাবিধ চিন্তা (দার্শনিক চিন্তা ভাবনা) করার সময়ও পেল। নব্যপ্রস্তর যুগ শেষ হয়ে ঐতিহাসিক কাল তথা শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সৃষ্টি হওয়ার দু'এক হাজার বছরের মধ্যে এগুলি প্রকট হতে থাকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ অব্দ নাগাদ **সিন্ধু উপত্যকায়** বসতি শুরু করা মোহানজোদারো সভ্যতায়ও দেখা যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাসগৃহের তুলনায় শ্রমিক কৃষকদের অপরিসর ঘরের প্রকট বৈষম্য।

নানা ধাপে, নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ঐ ঈশ্বরবিশ্বাস ও তার শ্রেণিব্যবহার রূপ পেতে থাকে। নানা দেশে নানা ভাবে তা ঘটে কিন্তু নিছক এখনো আদিম স্তরে থাকা জনজাতি ছাড়া, অন্য সবার ক্ষেত্রেই ঈশ্বর ও আত্মা জাতীয় কল্পনা, তাদের ঘিরে নানা অনুশাসন (শুরুতে যা ছিল শৃঙ্খলা রক্ষা, এবং যা প্রাতিষ্ঠানিক নানা ধর্মের ভিত্তি তৈরি করল) ইত্যাদির শ্রেণিগত চরিত্র দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতেই থাকে, সৃষ্টি হতে থাকে রথকুশল কিছু নেতৃত্ব যারা পরবর্তীকালের রাজা বা সম্রাটদের পূর্বসূরী এবং এদের দোসর অলৌকিক শক্তি তথা ঐশ্বরিক সত্তাকে সন্তুষ্ট করা বা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কিছু ব্যক্তি, যারা পরবর্তীকালে পুরোহিত, যাজক, মোল্লাদের পূর্বসূরী।

ভারতীয় উপমহাদেশে এটি একটি বিশেষ রূপ পায়। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ বছর আগে বর্তমানের ইরানীয় তথা পারস্য অঞ্চল থেকে এক যাযাবর গোষ্ঠী হিন্দুকুশ দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডের উত্তর পশ্চিম অংশে প্রবেশ করে এবং কয়েক শত বছরের মধ্যে উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ঘোড়ার ব্যবহার জানা ঐ উন্নত গোষ্ঠীর সঙ্গে এলাকার আদিবাসিন্দা জনজাতিদের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু বিজয়ী ও সুবিধাজনক স্থানে থাকা ঐ বহিরাগত **আর্যভাষী গোষ্ঠীরাই** মূলত এখনকার পাঞ্জাব অঞ্চলের ঘটনাবলী ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা নিয়ে ১৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ মৌখিকভাবে **বেদ** সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে এরা হয়ে ওঠে শাসকগোষ্ঠী, স্থানীয়দের পদানত করে আধিপত্য বিস্তার করে। নিজেদের মত করে এরা ঈশ্বর-আত্মা জাতীয় বিশ্বাসকে পল্লবিত করে নানা অনুশাসন ও নিয়মশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এরই চূড়ান্ত রূপ হল বেদকে অপৌরুষের ও অবশ্য মান্য হিসেবে প্রচার করা এবং **চতুর্বর্ণ প্রথার সৃষ্টি। কর্মফল-জন্মান্তরের** ধারণা। এর ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবীকে শূদ্র বা দাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হল, ব্রাহ্মণ হল সর্বশ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় তার অনুগামী প্রত্যক্ষ শাসক। এসবের বহু দিক রয়েছে, তবে সাধারণভাবে এই চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক শ্রমবিভাজনের ফলে দু'এক শত বছরের মধ্যেই সমাজে কিছু চিন্তাবিদ এসবের অসারতা অনুভব করতে থাকেন।

ইওরোপে শিল্পবিপ্লবের আগে মধ্য যুগে যেমন ঈশ্বর এবং চার্চের ও যাজকদের সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে বিপুল আন্দোলন ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ভারতীয় ভূখণ্ডে তেমনি খৃষ্টপূর্ব ৫-৬ শত বছর আগে ঐ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে **সঞ্জয় বেলাথিপুত্তের** সন্দেহবাদ, **পুকুধা কাত্যায়নের** কণাবাদ, **অজিত কেশকম্বলির** বস্তুবাদ, **পুরানো কাশ্যপের** নীতিশাস্ত্রবিরোধী মতবাদ গড়ে ওঠে, বহু মানুষ এঁদের অনুগামী হন। এঁরা সবাই বেদ ও ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তা চূড়ান্ত রূপ পায় **গৌতম বুদ্ধ** (৫৬৬-৪৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দ)-এর বৌদ্ধ দর্শনে, যেখানে বেদ ও চতুর্বর্ণ প্রথাকে তো বটেই কর্মফল জাতীয় নানা ব্রাহ্মণ্য প্রচারকে অস্বীকার করা হয়। একইভাবে প্রায় সমসাময়িক সময়ে গড়ে ওঠা **জৈন দর্শনেও** তা করা হয় (যদিও কর্মফলকে অস্বীকার করা হয় নি)। এসবই ছিল শাসকশ্রেণি বিরোধী সাধারণ মানুষের মনোগত বাসনার কেন্দ্রীভূত রূপ।

এবং বেদচতুর্বর্ণ প্রথা অস্বীকারকারী এই সব দার্শনিককে 'নাস্তিক' ও তাঁদের চিন্তাকে 'নাস্তিক্যবাদী' চিন্তা হিসেবে **ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা** বিপুলভাবে প্রচার করতে থাকে। নানাভাবে তাঁদের হতমান ও নিপীড়ন করা শুরু হয়। আর ঐগুলিই ছিল নাস্তিকতার প্রথম আন্দোলন, যদিও তখন তার অর্থ এখনকার মত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা ছিল না।

প্রায় একই সময়ে ইওরোপেও গ্রীক সভ্যতায় নাস্তিকতার আন্দোলন দানা বাঁধে। **ডেমোক্রিটাস** (খৃ. পূ. ৪৬০-৩৭০ খৃ. পূ.) **এপিকুরাস** (খৃ. পূ. ৩৪১-২৭০) প্রমুখ দার্শনিকেরা রাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে থাকা ঈশ্বর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী তথা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ববিরোধী, নাস্তিকতার দর্শনকে তুলে ধরেন, এবং বস্তুবাদী তথা নাস্তিক্যবাদী চিন্তার বিরোধী সমসাময়িক রাজপুত্র রূপান্তরিত, প্লেটো (খৃ. পূ. ৪২৮-৩৪৮)-র সঙ্গে বিতর্ক করেন বা তাঁর চিন্তার বিরোধিতা করেন।

কিন্তু কি ভারতীয় ভূখণ্ডে, কি ইওরোপে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি অলীক ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরতার প্রবণতা অনেক বেশি ছিল। শাসকশ্রেণি এটিকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগায় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাপক প্রচারের মধ্যে নাস্তিকতার আন্দোলনকে প্রতিহত করতে থাকে। সরাসরি শাসন ক্ষমতায় থাকার কারণে এর বিরুদ্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-দৈহিক—সব ধরনের চূড়ান্ত নিপীড়ন করাও সম্ভব হয়।

তা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণীর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রচারের বিরুদ্ধে এবং এসব দিয়ে সাধারণ প্রজা ও শ্রমজীবী মানুষকে বিক্ষোভহীন অনুগত করে রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চিন্তা ঠিকই টিকে ছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক-সামাজিক শক্তির কাছে নিজেদের অসহায়তার কারণে অলৌকিক ঐ শক্তিতে বিশ্বাস ও তার উপর নির্ভরতার প্রবণতা থাকলেও, তাদেরই মধ্যকার কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি তার অসারতাও উপলব্ধি করেন,—যুক্তি-তর্ক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এইভাবে অজিত কেশকম্বলির থেকে গৌতম বুদ্ধ, ডেমোক্রিটাস থেকে এপিকুরাস—এঁদের আবির্ভাব। এমনকি **ছান্দোগ্য এবং উপনিষদও** মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী, বস্তুবাদী **উদ্দালক আরুণি এবং পরমাণুবিদ কণাদের** উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয়

ভূখণ্ডে পরবর্তীকালে এসবেরই আরেকটি সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় **চার্বাক দর্শনের** মধ্যে, যার উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টম খৃষ্টাব্দ থেকে। এটি ছিল সুনির্দিষ্টভাবে নাস্তিক্যবাদী দর্শন, ঈশ্বর, আত্মা, চতুর্বর্ণ প্রথা তথা ব্রাহ্মণ্য প্রতারণা—এসবের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তে বলীয়ান।

ততদিনে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মূল ভিত্তি ছিল ঈশ্বর বিশ্বাস। এদের মধ্যে কঠোরভাবে ধর্মানুসারী মুসলিমদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদী না হোক, প্রতিবাদী চিন্তারও সৃষ্টি হয়। এমনই একটি ৮-৯ম শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া **মুতাজিলাহ গোষ্ঠী,**—যারা কোরানকে চিরন্তন বলে মনে করেন না, অদৃষ্টবাদকে বর্জন করেন, মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও কর্ম স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন ইত্যাদি। অন্যান্য ধর্মেও কমবেশি এমন প্রতিবাদী চিন্তা নানাভাবে অঙ্কুরিত হয়। এরপর ইওরোপের **রেঁনেসা ও শিল্পবিপ্লবের** পর চিন্তাভাবনায় উথালপাথাল ঘটতে থাকে। একদিকে **নতুন উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা** ইত্যাদির পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যপ্তি ঘটে। পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-প্রমাণের মধ্য দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হতে থাকে তথা প্রকৃতির নানা নিয়ম আবিষ্কার হতে থাকে।

এর ফলে আগে যে নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ও আত্মার অনাস্তিত্ব সম্পর্কে অনুভব ছিল মূলত যুক্তি ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া, **আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায়** তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পৃথিবীর জন্ম, পৃথিবীতে প্রাণ ও মানুষের আবির্ভাব, বিবর্তনের মধ্য মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক অর্জন ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তা পরোক্ষভাবে এ সবের পেছনে ঈশ্বরের ভূমিকা ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাকেই সমর্থন ও শক্তিশালী করে। পরীক্ষাগারে **হেনরি মিলার** ও তাঁর সহকারীদের গবেষণা এবং পরবর্তীকালের আরো অসংখ্য গবেষণার মধ্য দিয়ে কিভাবে জড়পদার্থের কোটি কোটি বছরের রাসায়নিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'প্রাণ'-এর সৃষ্টি হতে পারে ও হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসবও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকা ও অস্তিত্বকে এবং আদিম কল্পনার মৃত্যুপরবর্তী প্রাণ তথা আত্মার ভূমিকাকে সরাসরি নাকচ করে।

অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে **লুডভিগ ফয়েরবাখ** (১৮০৪-৭২) সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, ঈশ্বর মানুষেরই চিন্তাভাবনার একটি রূপ (অর্থাৎ মানুষের কল্পনার সন্তান তথা অস্তিত্বহীন) এবং তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার করার ব্যাপারটি (অর্থাৎ নাস্তিকতাকে) মানুষের মুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় **কার্ল মার্কস** (১৮১৮-৮৩) ঈশ্বর ও ঐ ঈশ্বর বিশ্বাসকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে ব্যাখ্যা করেন। মার্কসবাদ মূলগতভাবে নিছক নাস্তিক্যদর্শন নয়, কিন্তু মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত হল নাস্তিকতা এবং শাসকশ্রেণির অন্যান্য হাতিয়ার যেমন জন্মান্তর, কর্মফল, স্বর্গ-নরকের আশ্বাস বা আশঙ্কা ইত্যাদিকে অস্বীকার করা। এই হিসেবে প্রকৃত একজন মার্কসবাদী নাস্তিক হতে বাধ্য এবং তা শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে মার্কসীয় দর্শন ও ব্যাখ্যার প্রয়োগের অবিচ্ছেদ্য অন্যতম অঙ্গ। তাই মার্কসবাদকে নিয়ে যে সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলন তার মধ্যেই নাস্তিক আন্দোলনও নিহিত থাকে।

সব 'মার্কসবাদী' (অর্থাৎ যাঁরা গোঁড়ামি ও অন্ধ আনুগত্য ছাড়া প্রকৃতই মার্কসীয় দর্শন ও সমাজ ব্যাখ্যায় শিক্ষিত) নাস্তিক হলেও, পৃথিবীর সব নাস্তিক মার্কসবাদী নন। কিন্তু মার্কসবাদী হোন বা না হোন, নাস্তিকতার আন্দোলন বা নাস্তিকতার মতাদর্শ উর্ধ্বে তুলে ধরা প্রত্যক্ষ ভাবে তা পরোক্ষভাবে শাসকশ্রেণি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনেরই অঙ্গ। ১৯৬৩ সালে **মাদালিন মারে ও' হেয়ার** প্রতিষ্ঠিত **'অ্যামেরিকান অ্যাথেইস্টস'**-এর সদস্যেরা মার্কসবাদী নন, কিন্তু চার্চ থেকে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পৃথক করার জন্য লড়াই করেন। আমাদের এখানেও নাস্তিক আন্দোলনে সঙ্গে যুক্ত অনেকেই রাষ্ট্র কর্তৃক মন্দির-মসজিদ-গির্জার প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার কথা বলেন। কিন্তু তারা সবাই যে সুস্পষ্টভাবে মার্কসবাদী তা নন। (যেমন ছিলেন না **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** থেকে **অক্ষয়কুমার দত্ত** কিংবা **সত্যজিৎ রায়** থেকে **সুনীল গাঙ্গুলীর** মত অজস্র ব্যক্তিত্ব)। একইভাবে তামিলনাড়ু-র **পেরিয়ার ই ভি রামাস্বামী** (১৮৭৯-১৯৭৩) ব্যাপকভাবে নাস্তিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, চতুর্বর্ণ প্রথা তথা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেন। **আম্বেদকর** (১৮৯১-১৯৫৬) দলিত শ্রমিক-কৃষকদের শোষণের বিরুদ্ধে এবং জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালান। তাঁকেও মার্কসবাদী হতে হয় নি। তা সত্ত্বেও অনেকেরই মনে হতেই পারে, এখনো অব্দি পাওয়া নানা পথের মধ্যে মার্কসীয় পথই সমাজ রূপান্তরের তথা শাসকশ্রেণিকে নির্মূল করার প্রধান পথ। সেক্ষেত্রেও যাঁরা তা মনে করেন না, ঐ সব নাস্তিকরা তথা নানা স্থানে নানা সময়ে গড়ে তোলা নাস্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিরা পরোক্ষভাবে মার্কসীয় দর্শনকেই সমর্থন করেন এবং শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কারণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সৃষ্টি হওয়ার পর কি সামন্ততান্ত্রিক, কি পুঁজিবাদী কি বর্তমানের কর্পোরেটসর্বস্ব নব্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা—সাধারণ মানুষের মধ্যে টিকে থাকা ঈশ্বর ও অলৌকিকত্ব ইত্যাদির উপর বিশ্বাসকে কাজে লাগায়, তাকে শক্তিশালী করে, প্রশ্রয় দেয়। কি ভারতের কি ভারতের বাইরের, বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি এখন কর্পোরেট পুঁজির আনুকূল্য পায় ও তার জন্য কাজ করে। তা করতে গিয়ে আগের শাসকদের মত তাকেও মানুষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী আন্দোলন যাতে দানা না বাঁধতে পারে তাই তাদের মধ্যে ধর্মের মত কৃত্রিম, মানুষেরই তৈরি করা একটি পরিচয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করা এবং ঈশ্বর নির্ভরতা, পূর্বজন্মের কর্মফল, জ্যোতিষ বিশ্বাস, স্বর্গ নরক আর পাপপুণ্যের উপর বিশ্বাস জাতীয় মিথ্যা নানাদিকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হয় যা বাস্তব সমস্যার প্রকৃত বিশ্লেষণ করা, তার সমাধানে প্রকৃত পথ অনুসরণ করা, সংগ্রামের সঠিক দিশা খুঁজে পাওয়া ইত্যাদিকে দুর্বল করে দেয়। মানুষকে করে তোলে

মেরুদণ্ডহীন, সংকীর্ণদশা, অলীক নানা ভাবনায় আচ্ছন্ন একটি প্রাণী হিসেবে। নাস্তিকতা এই সব 'নেতি'র বিরুদ্ধে ইতিবাচক বার্তা দেয়, এবং মার্কসবাদী (বা অন্য কারো) প্রকৃত শাসকশ্রেণিবিরোধী, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৪৫-৫০ কোটি মানুষ সুনিশ্চিত ভাবে নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) (যাঁদের কাছে ঈশ্বর আছেন কি নেই—এই প্রশ্ন অবান্তর) বলে চিহ্নিত। যা পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬.০৫ ভাগ। (জানুয়ারি ২০২৩ এ পৃথিবীর জনসংখ্যা ৮২৭ কোটি।) এঁদের মধ্যে চিনের: অংশই বড় (প্রায় ৯১ ভাগ চিনের নাগরিক নাস্তিক বলে ঘোষিত)। একটি সমীক্ষায় (গ্যালাপ ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশান) ভারতের শতকরা ১৮ ভাগ মানুষ (২০ কোটি) নাস্তিক বলে চিহ্নিত। তবে ২০১১ এর জনগণনায় ২৯ লক্ষ ভারতীয় নিজেদের নাস্তিক বলে ঘোষণা করেছেন বা নিজেদের ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে কিছু মন্তব্য করেননি। আবার এটিও জানা যাচ্ছে যে, প্রায় ৬ লক্ষ ভারতীয় কঠোরভাবে নাস্তিক হিসেবে নিজেদের গণ্য করেন। সুইডেন কোন কমিউনিস্ট দেশ নয়, ওখানেও বিগত কয়েকদশকের মধ্যে নাগরিকদের মধ্যে নাস্তিক প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ; অন্যদিকে অন্য সমীক্ষায় শতকরা ৫৫ ভাগ সুইডিশ সুস্পষ্টভাবে নিজেদের ধর্ম পরিচয়মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন বলে জানা গেছে। একইভাবে ইংল্যাণ্ডের ৭২ ভাগ, জাপানে ৮৬ ভাগ মানুষ নাস্তিক বলে চিহ্নিত। এই ধরনের সমীক্ষায় চূড়ান্ত অর্থে নিখুঁত না হলেও, পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা উন্নত দেশগুলিতে অধিক।

তাই আমাদের এখানে অনেকে বক্রোক্তি করেন যে, নাস্তিক কমিউনিস্টদের ব্যাপার—তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অন্যদিকে বিশেষত হিন্দুত্ববাদী বা হিন্দু মৌলবাদীরা বলে যে 'নাস্তিকতা বিদেশি ব্যাপার,—আদৌ তা ভারতীয় ঐতিহ্য নয়।' এটিও যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তা উদ্দালক আরুণি-অজিত কেশকম্বলি-গৌতমবুদ্ধ প্রমুখ নানাজনের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়। যার ধারাবাহিকতা এদেশে আছে অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে পেরিয়ারের মত বহু ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

অন্যদিকে এটিও বাস্তব যে, পৃথিবীবাসীর যে মাত্র শতকরা প্রায় ৬ ভাগ মানুষ সুস্পষ্টভাবে নাস্তিক, তাদের বাইরে আরো অসংখ্য মানুষ আছেন, যাঁরা কঠোরভাবে বা অন্ধভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী বা ধর্মবিশ্বাসী নন, দোদুল্যমান অবস্থায় আছেন, কিংবা নিছক বাইরের পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে আলগাভাবে ধরনের বিশ্বাস পরিচয় দেন। ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন পশ্চাদপদ বা ধর্মভিত্তিক দেশে ধর্মীয় মৌলবাদের রমরমায় (প্রায় ১৩০ কোটি বা ১৭%)। তা হলেও এটিও সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীতে ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ধর্মবিশ্বাসীরাও সংখ্যা গুরু। বহু দেশের শাসকগোষ্ঠী এরই সুযোগ নেয় ও তার সাহায্যে নিজেদের শাসন ও অস্তিত্ব সুরক্ষিত আর শক্তিশালী করা ষড়যন্ত্র করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাস্তিক মানুষেরা নানা ধরনের নিজস্ব গোষ্ঠী ও সংগঠন গড়ে তুলেছেন, আন্তর্জাতিকভাবে 'অ্যাথেইস্ট অ্যালায়েন ইন্টারন্যাশন্যাল', 'ফ্রীডম ফ্রম রিলিজিয়ন ফাউণ্ডেশান', 'হিউম্যানিস্টম ইন্টারন্যাশান্যাল' ইত্যাদি সংগঠন আছে, বিভিন্ন দেশেও নাস্তিক সংস্থা আছে। আমাদের এখানে যেমন বিভিন্ন গণসংগঠন, বিজ্ঞান ও মানবতাবাদী সংস্থা ইত্যাদি নাস্তিকতার কথা বলে। সুস্পষ্টভাবে শুধু নাস্তিকতাকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠেছে 'নাস্তিক মঞ্চ', যাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা 'আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবিকে অস্বীকার করি'।

মানব মেলা, মিলন মেলা, লালন মেলা

দুই বাংলার হিংসাত্মক যুযুধমান রাজনৈতিক এবং আগ্রাসী ধর্মীয় মৌলবাদী বাতাবরণের মধ্যেই কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় সাড়ম্বরে হয়ে গেল লালন মেলা ২০২৫।

মানবতাবাদী দার্শনিক, অনন্য সঙ্গীত প্রতিভা, জনপ্রিয় কৃষক প্রতিরোধের নায়ক, জাত - ধর্মের উর্ধ্বে বিরাজিত, সাধারণের লালন সাঁইজির তিরোধান স্থলের পাশে তিনদিন তিন রাত ধরে চলা এই মেলায় দুই বাংলা ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন লালনভক্ত ফকির বাউল দরবেশরা সমবেত হয়েছিলেন, এসেছিলেন ২০২৫ এর হোলবার্গ পুরস্কার বিজয়ী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক সহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং যশস্বী শিল্পীরা। জড়ো হয়েছিলেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মনের আনন্দে, প্রাণের আরামে, আত্মার শান্তিতে এবং অবশ্যই লালনের মনের মত গানগুলি শুনতে।

গড়াই নদী তীরে সাঁইজির তিরোধান স্থলের অদূরে পদ্মা পাড়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি আজও সাক্ষী বিশ্বসাহিত্য এবং সর্বমঙ্গলবাদী দর্শন, শিক্ষা, মানবিক ও সামাজিক বিকাশের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের যৌবনের অমর সব সৃষ্টির এবং তাঁর জ্যোতিদাদার উদ্যোগগুলির।

সমসময়ে উজ্জ্বলভাবে ছিলেন লালন ও রবীন্দ্র স্নেহধন্য গগন (ডাক) হরকরা (কবি গগন চন্দ্র দাস); কুমারখালির সমাজসেবী, সাংবাদিক ও সংগীতকার হরিনাথ মজুমদার; সাংবাদিক সাহিত্যিক মীর মোশারফ হোসেন প্রমুখ প্রকৃতপক্ষে বাংলার রেনেসাঁ র প্রাণপুরুষ রা।

অর্থনীতির হালহকিকত

• **আদানি ত্রাতা সরকার :** ২০২৫-র শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বান্ধব শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থায় যে ঋণের বোঝা চেপেছিল তার থেকে তাকে অব্যহতি দিতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে থাকা আর্থিক পরিষেবা দপ্তর রাষ্ট্রায়ত্ব এল.আই.সি থেকে ৩৪,৩২০ কোটি টাকা (৩৯০ কোটি ডলার) দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তার ভিত্তিতে আদানি ঋণ মেটান এবং আদানি পোর্টস ৫০০০ কোটি টাকার বণ্ড ছাড়ে। এই বণ্ডে আবার লগ্নি করে এল.আই.সি.। পরে সরকারের তরফ থেকে জানা যায় অর্থের পরিমাণ ৪৮,২৮৪.৬২ কোটি টাকা।

• **বিশ্ব ক্ষুধা সূচক '২৫ :** কৃষি উৎপাদন ও প্রযুক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেও অর্থনৈতিক ও বণ্টনের বৈষম্য, দারিদ্র, যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, উচ্ছেদ, শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্বল সরকার ও সরকারগুলির দুর্বল পরিচালনার কারণে প্রতি ১০ জন বিশ্ববাসীর একজন অভুক্ত। ৬৭.৩০ কোটি মানুষ খাদ্য সঙ্কটে। শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থা ও বিপুল খাদ্যভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও ভারত 'গুরুতর' খাদ্য সঙ্কট বিভাগে স্থান পেয়েছে যেখানে ১২৩টি দেশের মধ্যে ২৫.৮ পেয়ে ভারতের স্থান ১০২।

• **চতুর্থ শ্রম কোড ও মহিলা গিগ কর্মী :** সব ধরনের কাজ করতে পারবেন মহিলারা। পুরুষদের সমান বেতন। মাতৃত্বকালীন সুবিধা। সন্তানের সম্ভাব্য জন্মের আগের এক বছর ৮০ দিন কাজ করলে সর্বোচ্চ ২৬ সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন ছুটি।

• **বিজেপির খরচের বহর :** দলের অডিট রিপোর্টে দলের ২০২৪-২০২৫ বর্ষে ঘোষিত খরচ ৩৭৭৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৮৮% অর্থাৎ ৩৩৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকাই খরচ করা হয়েছে ভোটের প্রচারে। তার মধ্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ১১২৪ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, বিজ্ঞাপনে ৮৯৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, নেতাদের জন্য বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়ায় ৫৮৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা এবং প্রার্থীদের জন্য ৩১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। দলের আয় দেখানো হয়েছে ৬৭৬৯ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৫৪% দান বলা হয়েছে।

• **সর্বাধিক ঋণগ্রস্ত রাজ্য :** (১) তামিলনাড়ু (৯.৬ লক্ষ কোটি টাকা), (২) উত্তরপ্রদেশ (৮.৬), (৩) মহারাষ্ট্র (৮.১), (৪) কর্ণাটক (৭.৩), (৫) পশ্চিমবঙ্গ (৭.১)। ঋণবৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিহারে শীর্ষে (১) ছত্তিশগড়, (২) তামিলনাড়ু, (৩) পশ্চিমবঙ্গ। ঋণ-জিএসডিপি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্তরে।

• **বিনাশর্তের ঋণের সমস্যা :** পশ্চিমবঙ্গ থেকে মহারাষ্ট্র ভারতের প্রায় সব রাজ্যই রাজনৈতিক কারণে ভোটারদের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের বিনাশর্তে নগদ দান বা খয়রাতি প্রকল্পগুলির বিপদ সম্পর্কে অবগত করল কেন্দ্র অর্থ দফতরের বাজেট পূর্ববর্তী আর্থিক সমীক্ষা। জনমোহিনী রাজনীতিতে ভোট বৃদ্ধি ছাড়াও উপভোক্তাদের রোজগার কিছুটা বাড়লেও এই বিপুল পরিমাণের নগদ অনুদান প্রকল্পগুলি রাজকোষ শূন্য করে দিচ্ছে, পরিকাঠামো সহ অন্যান্য প্রকল্প মার খাচ্ছে। আর্থিক বৃদ্ধি মার খাচ্ছে, রাজ্যগুলির ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। উপভোক্তাদের একাংশের মধ্যে কাজের বাজারে অংশ না নেওয়া, নিজেদের দক্ষতা না বাড়ানো, নিজেদের রোজগারের জন্য তৈরি না করা, বসে থাকার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা অনন্ত নাগেশ্বরণ জানিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলি জাতীয় সরকার ছাড়াও রাজ্য সরকারগুলির কোষাগারের স্বাস্থ্য দেখে। ফলে দেশের ঋণ নেওয়ার খরচ বাড়ছে। ভারতের বণ্ড বা ঋণপত্র যা আন্তর্জাতিক সূচকের সঙ্গে যুক্ত তাতে বেশি সুদ গুনতে হচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ এ এই খাতে ১.৭ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে যা রাজ্যগুলির জিডিপির ১.২৫% ও বাজেটের ৮% পর্যন্ত। অথচ সেখানে কর্মসংস্থান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, মানব উন্নয়নে খরচ কমে যাচ্ছে। কর্জ করে বেতন, ভর্তুকির পর এখন ভাতার খরচ দিতে হচ্ছে।

• **রাজ্যে বিনিয়োগ :** কেন্দ্র শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের সূত্রে জানা যাচ্ছে যে ২০১৯ থেকে ২০২৫ অবধি পশ্চিমবঙ্গে ১৪৬টি বিনিয়োগে প্রস্তাব ছিল ৬৫,২৩৮ কোটি টাকা। কার্যকর হয়েছে ১১৫টি প্রস্তাবে ১৫,১৮৪ কোটি টাকা।

• **বাজেট পেশের পরও ভাতা বৃদ্ধি :** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাতা বৃদ্ধি এগিয়ে আনায় খরচ বাড়বে ১২৬০ কোটি টাকা। নতুন প্রকল্প ও ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে ২২,৭০০ কোটি টাকা। ধারের অঙ্ক আনুমানিক ১ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকা। পুঞ্জিভূত ধার ৮.১৬ লক্ষ কোটি টাকা।

• **আর্থিক সমস্যা ও বৈষম্য :** উৎপাদন শিল্পকর্মী হ্রাস ০.৭%। ধনীদের ১০% এর হাতে জাতীয় আয়ের ৫৮% ও সম্পদের ৬৫%। ধনীতম ১% ব্যক্তির কাছে রয়েছে ৪০% সম্পদ। দৈনিক ২০০ টাকার কম রোজগার ৮০% নাগরিকের। পারিবারিক আয় পাঁচ দশকে সবচাইতে কম।

• **ভারতের অস্ত্র ক্রয় :** স্টকহোম পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ২০২০-২০২৪ এর তথ্য অনুযায়ী ভারত তার ক্রয় করা অস্ত্রগুলি নিম্নলিখিত দেশগুলি থেকে ক্রয় করে : রাশিয়া (৩৬%), ফ্রান্স (৩৩%), ইজরায়েল (১৩%) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (০৯.৬%), ব্রিটেন (০৩%) এবং অন্যান্য (০৫.৪%)। ইজরায়েলের রফতানিকারী অস্ত্রের ৩৪% ভারতে আসে।

• **রেকর্ড চিংড়ি রফতানি :** পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবি করেছে যে রাজ্যের ৮০০ কিমি মজে যাওয়া খাঁড়ি সংস্কার করে তাতে বৃষ্টির

জল ধরে রেখে উন্নতমানের চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। গত বছর প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকার চিংড়ি রফতানি হয়েছে।

- **আর্থিক স্বাস্থ্যে পশ্চিমবঙ্গ পিছনের সারিতে :** নীতি আয়োগ ফিসকাল রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮টি বড় রাজ্যের মধ্যে প্রথম ১০টি: (১) ওড়িশা, (২) গোয়া, (৩) ঝাড়খণ্ড, (৪) গুজরাত, (৫) মহারাষ্ট্র, (৬) ছত্তিশগড়, (৭) তেলেঙ্গানা, (৮) উত্তরপ্রদেশ, (৯) কর্ণাটক ও (১০) মধ্যপ্রদেশ। শেষ চারটি রাজ্যঃ (১৫) কেরল, (১৬) পশ্চিমবঙ্গ, (১৭) অন্ধ্রপ্রদেশ ও (১৮) পাঞ্জাব।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—ভারত বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬ :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্কটগ্রস্ত কৃষি, ডেয়ারি, যন্ত্র ইত্যাদি শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য বিনা শুল্কে ভারতের বাজারে ব্যবসা করবে। অন্যদিকে ভারতীয় পণ্যকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করতে হলে এতদিনকার ২.৫% এর পরিবর্তে ১৮% শুল্ক (Tariff) দিতে হবে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারত ২০১৮ থেকে ইরান থেকে খনিজ তেল আমদানি করতে পারত না, এখন থেকে রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি করতে পারবে না। আগামী পাঁচ বছর মার্কিনের থেকে ৫০ হাজার কোটি ডলারের জ্বালানি কিনতে হবে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধাস্ত্র, কোকিং কোল, মূল্যবান ধাতু, প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ প্রভৃতি কিনতে হবে।
- **তেল থেকে মুনাফা :** ভারতের তিনটি রাষ্ট্রীয় তেল পরিশোধন ও বিক্রি সংস্থা 'ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (IOCL)', 'ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL)' এবং 'হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL)' ২০২৫-'২৬ আর্থিক বর্ষের প্রথম ছমাসে মুনাফা করেছে ৩৪,০৬৭ কোটি যা আগের আর্থিক বর্ষের সামগ্রিক মুনাফার চাইতে বেশি।
- **ফিনল্যাণ্ড পরপর নয়বার সুখীতম দেশ :** দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ জীবনের মান, সামাজিক সুরক্ষা সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, দূষণহীন প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর Gallop, The Oxford Wellbeing Research Centre ও The UN Sustainable Developmental Solution যে World Happiness Report 2026 প্রকাশ করেছে তার প্রথম ১০টি দেশ : (১) ফিনল্যাণ্ড, (২) আইসল্যাণ্ড, (৩) ডেনমার্কস (৪) কোস্টারিকা, (৫) সুইডেন, (৬) নরওয়ে, (৭) দ্য নেদারল্যাণ্ডস, (৮) ইজরায়েল, (৯) লাক্সেমবুর্গ ও (১০) সুইজারল্যাণ্ড। ফিনল্যাণ্ড বিগত ১০ বারের মধ্যে নয়বার প্রথম। অন্য দেশগুলির মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড (১১), মেক্সিকো (১২), আয়ারল্যাণ্ড (১৩), অস্ট্রেলিয়া (১৫), জার্মানি (১৭), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২৩), কানাডা (১৫), যুক্তরাজ্য (২৯) ও ভারত (১১৬)।
- **ব্যাটন পরিবর্তন:** ১৯৭৮এ মাত্র ১০ হাজার টাকা সম্বল করে বেঙ্গালুরুর বাড়ির গ্যারেজে কিরণ মজুমদার তৈরি করেন বায়োকন সংস্থা যা পরবর্তী চার দশকে হয়ে ওঠে দেশের বৃহত্তম বায়োটেকনলোজি সংস্থা। এর স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯৮৯তে পদ্মশ্রী এবং ২০০৫এ পদ্মভূষণ সম্মাননা পান। ১৯৯৮এ স্কটল্যাণ্ডের জন শ-র সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ৬৮ হাজার কোটি টাকার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার কিরণ মজুমদার 'শ বহু সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি ৭৩ বছর বয়সে নিঃসন্তান কিরণ তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ক্লেয়ার মজুমদারকে।
- **দু লক্ষ কোটি টাকার বিদায়:** বিশ্বজোড়া অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারতে শেয়ার বিক্রি করে মে মাসের শুরুতে ১৪,২৩১ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে বিদেশি লগ্নীকারীসংস্থাগুলি। অন্যদিকে ভারতীয় সংস্থাগুলির শেয়ার মূল্য কমেছে এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি। ২০২৬এর প্রথম সাড়ে চার মাসে বিদেশি সংস্থাগুলি লগ্নি তুলে নিয়ে গেছে দু লক্ষ কোটি টাকার বেশি।
- **লাভ থেকে লোকসান:** নতুন করে মধ্যএশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতের লাভজনক তেল সংস্থাগুলির দৈনিক এক হাজার কোটি টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে।
- **জুনের হাওয়া:** অশোধিত তেলের ব্যারেলের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ৮০ ডলার। হরমুজ প্রণালী এখনও বন্ধ, তাই গ্যাস আমদানি বিপাকে। রপ্তানি কিছুটা বেড়ে হয়েছে ১৮.৩৫%। চালু হতে চলেছে ভারত-ইংল্যাণ্ড অবাধ বাণিজ্য চুক্তি। অন্যদিকে পাইকারি মূল্য বেড়ে ৯.৭%। খুচরো মূল্যেরও বৃদ্ধি ৫%। কম বর্ষা হওয়ার আশঙ্কা। বেকারত্ব বৃদ্ধি। ৪৩,০৪৪ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন বিদেশিরা।
- **বৃহত্তম শেয়ার কেলেঙ্কারি:** একদা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘনিষ্ট স্বর্ণব্যবসায়ী রাজেশ মেহতার 'রাজেশ এক্সপোর্টের' ৯৯% আয় বৃদ্ধি দেখিয়ে গত পাঁচ বছরে ১৫.১৫ লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার কেলেঙ্কারি ধরা পড়ল। অথচ এখানে সরকারি সংস্থা এল.আই.সি. আদানির সংস্থার মত এখানেও দু হাজার কোটি টাকা লগ্নি করে বসে আছে।
- **আর্থিক বৃদ্ধি হার:** ২০২৪-'২৫ : ৭.১%; ২০২৫-'২৬ : ৭.৭%।
- **ট্রাম্পের শুল্ক ফতোয়া:** আগষ্ট '২৫এ ২৫%। তারপর রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য আরও ২৫% জুড়ে ৫০%। মার্কিন আদালতে শুল্ক খারিজের পর আবার ১০%। তারপর ১২.৫%।
- **লাফ দিয়ে পেট্রল ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি:** ৭ জুন কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অয়েল ঘোষিত মূল্যঃ এক লিটার পেট্রল ১১৩.৫১ টাকা, ডিজেল ৯৯.৮২। গৃহস্থালীর গ্যাস সিলিণ্ডার (১৪.২ কেজি) ৯৬৮ টাকা। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিণ্ডার ৩২৫৫.৫০ টাকা। উজ্জ্বলার ভর্তুকির সিলিণ্ডার নয় থেকে কমিয়ে চারে নিয়ে আসা হল। বিমানের জ্বালানির (এটিএফ) দাম বৃদ্ধি হল লিটার প্রতি ১১৫ টাকা। এর সঙ্গে পেট্রলে ২০% ইথানল মিশ্রণ।
- **পঞ্চায়েতে বিপুল বরাদ্দ:** পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ এল। ১২৫ দিনের কাজের 'জি-রাম-জি' প্রমুখ প্রকল্পে। যার পরিমাণ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা।

- **ধনীতম ব্যক্তি:** পৃথিবীর মধ্যে প্রথম এক লক্ষ কোটি ডলারের (৯৫ লক্ষ কোটি টাকা) মালিক হলেন স্পেস এক্স, টেসলা প্রভৃতি সংস্থার কর্ণধার ইলন মাস্ক (মোট সম্পদ ১.০৫ লক্ষ কোটি ডলার)।
- **সুইস ব্যাঙ্ক:** ২০২৫এ সুইস ব্যাঙ্কগুলিতে ভারতীয়দের জমা অর্থের পরিমাণ ৩৬৫ কোটি সুইস ফ্রাঁ অর্থাৎ প্রায় ৩৭,০০০ কোটি টাকা। তবে এতে কালো টাকা বা তৃতীয় পক্ষের রাখা টাকার কোন হিসাব নেই।
- **চার্টাড সাংসদ:** তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র চার্টাড বিমান বা হেলিকপ্টারে চড়ে ২০২২, ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫ সালে খরচ করেছেন ৩৫,১৩,৫০৯ ও ৩৭ কোটি টাকার অধিক যেখানে সাংসদরা বিনামূল্যে প্লেনের বিজনেস ক্লাসের টিকিট পান।
- **অ্যামাজনের ভারত প্রসার:** অ্যামাজনের বর্তমান সিইও অ্যাণ্ডি জ্যাসি জানিয়েছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো, দুয়ারে দ্রুত পণ্য পৌঁছে দেওয়ার কুইক কর্মাস সহ ব্যবসা সম্প্রসারণে তারা ২০৩০-র মধ্যে ভারতে ৪,৫৩,৩৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছেন।
- **রাম মন্দিরে চুরি:** অনেকদিন ধরে অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদান থেকে কয়েকশো কোটি টাকা, রুপোর ইট, সোনার গয়না প্রভৃতি চুরির ক্ষেত্রে রাম মন্দিরে নিযুক্ত রামভক্ত সেবাদারদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে। একইরকম অভিযোগ উঠেছে বদ্রীনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রে।
- **নাবালিকা বিবাহে শীর্ষে:** জুলাই ২০২৬ খর্সিয়াঙে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সংসদী য় কমিটির বৈঠকে ঘোষণা করা হল দেশের মধ্যে নাবালিকা বিবাহে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। ষষ্ঠ জাতীয় স্বাস্থ্য পারিবারিক সমীক্ষাতে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের ২০-২৪ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে ৩৬.৪%-র ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সংকলন: বুনো রামনাথ

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও অর্থ ব্যবস্থা

উজান বিশ্বাস

বড়ো পাপ হে: স্বাধীনতার আগে পরে ভারতের সবচাইতে শিল্পোন্নত রাজ্য যা কর্মসংস্থানের জন্য সারা ভারতের কর্মপ্রার্থীদের আহ্বান করত, আমাদের সেই রাজ্য বাংলা (অবিভক্ত) এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ, বিভিন্ন কারণে ক্রমশঃ রুগ্ন ও অশান্ত হয়ে তিন দশকের মধ্যেই দেশের একটি পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র সমস্যাদীর্ণ সংকটময় রাজ্যে পরিণত হল।

এর বহুবিধ কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: (১) যে হুগলী নদী নির্ভর বৃহত্তর কলকাতা - হাওড়া শিল্পাঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে তার মধ্যে চরা পড়ে নাব্যতা কমিয়ে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর দুর্বল হয়ে পড়া, বিপরীতে পূর্ব ভারতীয় উপকূলের ওড়িশার পারাদ্বীপ এবং অন্ধ্রের ভাইজাগ সমুদ্র বন্দরের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ; (২) বিভিন্ন কৃত্রিম তন্তুর আবিষ্কারের ফলে বাংলার বৃহত্তর পাট শিল্পে ধাক্কা এবং প্রাচীন চটকল গুলি রুগ্ন হয়ে পড়া; (৩) সময়ের সঙ্গে ও প্রযুক্তির পরিবর্তনে পুরনো ধাঁচের বিস্তৃত ম্যানুফ্যাকচারিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাউন্ড্রি, টেক্সটাইলস, চর্ম, ওষুধ, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পগুলির পিছিয়ে পড়া; (৪) কেন্দ্রের অবাঙালি নেতৃত্বের ধারাবাহিক বঞ্চনা ও অসহযোগিতা; (৫) কেন্দ্রের তদানীন্তন মাসুল সমীকরণ নীতি; (৬) দেশের পশ্চিম উপকূলে মুম্বাই ও কান্দলা বন্দর ও মহারাষ্ট্র - গুজরাত শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি; (৭) পূর্ব ভারত থেকে পুঁজির পশ্চিম ভারতে স্থানান্তর; (৮) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ অবধি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা; (৯) ১৯৭০ - '৭২ পর্যায়ে রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্যবাদী হিংসা এবং নিষ্ঠুর রাষ্ট্রীয় প্রতিহিংসা ও দমনপীড়ন; (১০) দায়িত্বহীন একাংশ শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আত্মঘাতী শ্রমিক আন্দোলন; (১১) সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও কর্মসংস্কৃতির ব্যাপক অবনতি; (১২) নোংরা রাজনীতি এবং ক্রমাগত বন্ধ, ঘেরাও, লক আউট, লে অফ, ক্লোজার, কর্ম দিবস নষ্ট; (১৩) এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী দুর্নীতিগ্রস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও দালালের উত্থান এবং অবশিষ্ট শিল্পগুলি ধ্বংস; (১৪) শিল্প কারখানার জমিতে প্রমোটিং এবং নির্মাণের লাভজনক ব্যবসা; (১৫) ইসলামি পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর ধারাবাহিক নৃশংস অত্যাচারের কারণে কয়েক কোটি বাঙালি হিন্দুর উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে পালিয়ে আসা এবং সামগ্রিক জনসংখ্যা, জমি, নাগরিক পরিষেবা ও অর্থনীতির উপর চাপ বৃদ্ধি।

ঈশান কোণে ঝড়-প্লাবন: এরপর ১৯৭৭ থেকে দীর্ঘ তিন দশকের বেশি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক স্থিরতা ও সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকলেও সঠিক, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রম ও শিল্পনীতি এবং উদ্যোগের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও অর্থনীতির ধারাবাহিক অবনতি চলতেই থাকে। বামফ্রন্টের শেষ দিকে জমি আন্দোলন এবং অচলাবস্থার পরিবর্তনের ডাক দিয়ে, বামফ্রন্টের অদক্ষ ও অপশাসনের সুযোগ নিয়ে, তৃণমুল নামক লুম্পেন দলটি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় চলে আসে এবং দীর্ঘ ১৫ বছর শাসন ক্ষমতা চালায়। এইসময় তাদের মন্ত্রী - নেতা - কর্মীবাহিনী র নৈরাজ্য ও সীমাহীন লুটপাট এবং তার সঙ্গে ধার করে উপভোক্তা ভোটারদের কিছু ডোল প্রদান পশ্চিমবঙ্গের রুগ্ন অর্থনীতিকে একেবারে ঋণগ্রস্ত ঝরঝরে অর্থনীতিতে পরিণত করে।

মেকি লড়াই আর কাজে ফাঁকি: বাম ও তৃণমূল শাসন মিলিয়ে এই ৪৯ বছরে আরেকটি অদ্ভুত বিষয় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে যা ভূ ভারতে কোথাও দেখা যায়না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের শাসক

দল কংগ্রেস ও রাজ্যের প্রধান শাসক দল সিপিআইএমের এবং পরবর্তীকালে বিজেপি ও তৃণমূলের প্রবল বোঝাপড়া সত্ত্বেও এই দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে রাজ্যের ভোট রাজনীতির কারণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলির মধ্যে প্রবল ও অবিরত দ্বন্দ্ব এবং যার ফলে নির্ধারিত কেন্দ্রীয় আর্থিক ও প্রকল্পগত বরাদ্দ গুলি ঠিকমত না পাওয়া। তৃণমূল সরকার আবার প্রধানমন্ত্রীর নাম যুক্ত সহ প্রতিটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিপ্রতীপে রাজ্যের সীমিত আর্থিক বরাদ্দ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নামে একের পর এক নিজস্ব প্রকল্প সৃষ্টি করে আর্থিক বোঝা বাড়ায়। তাদের ' সবজান্তা ' নেত্রী শিয়ালদা - সেন্ট্রাল - বিবাদি বাগ রুটে মেট্রো প্রকল্পের নকশা পাল্টে উক্ত মেট্রো প্রকল্পে এবং বউবাজার অঞ্চলে বিপর্যয় ও দেরি ডেকে আনে। চিংড়িহাটার সামান্য মেট্রো সংযোগের কাজ দীর্ঘদিন আটকে রেখে, এমনকি রাজ্যের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে এই কাজের বিপক্ষে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন এবং জনস্বার্থের অভাবনীয় ক্ষতি করে। কংগ্রেস আমলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া, বাম আমলে অবনমনের পথে যাওয়া যাবতীয় কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণপরিবহন, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থানের সুযোগ, বিনোদন শিল্প, সংস্কৃতি একেবারে ধ্বংস হয়ে রসাতলে চলে যায় তৃণমূল অপশাসনে। পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ওঠে সারা দেশ এমনকি বিদেশে পরিযায়ী - ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক ও কর্মচারী সরবরাহের কেন্দ্র।

জল্লাদের উল্লাস ক্ষেত্র: এরসঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, হিংসাময় নির্বাচন, আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি ও মহিলাদের বিরুদ্ধে সহ সার্বিক অপরাধের বৃদ্ধি, সর্বস্তরে দুর্নীতি ও কাটমানি, দলদাস অসহযোগী পুলিস - প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা দুর্নীতি ও নাগরিক অসহযোগিতা, সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঢেউ, জনমিতির পরিবর্তন, রাষ্ট্র পোষিত ধর্মীয় পুনরুত্থান এবং সম্প্রদায়িক বিভাজন ও একের পর এক সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এক অজ্ঞ স্বৈরাচারী খামখেয়ালি মুখ্যমন্ত্রী এবং তার তালেবর ও ডাকাত ভাইপোর ইচ্ছামাফিক রাজ্যপাট পরিচালনা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গকে এক সর্বগ্রাসী অন্ধকারে নিমজ্জিত করে ফেলে।

সব কিছু খারাপ নয়: অথচ এরকমটি হওয়ার কথা ছিল না। স্বাধীনতার পরে দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর ১৪ বছরের শাসনকালে (১৯৪৮-'৫০ প্রিমিয়ার এবং ১৯৫০ -১৯৬২ মুখ্যমন্ত্রী) পশ্চিমবঙ্গে পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়নের সমাহার ঘটে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিতর্কিত শাসনের সময়েও (১৯৭২-'৭৭) সল্ট লেক স্টেডিয়াম, দ্বিতীয় হুগলী সেতু, ভারতে প্রথম মেট্রো রেল, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম ও বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ, শিয়ালদা উড়ালপুল প্রভৃতি রূপায়িত হয়। বামফ্রন্টের শেষ লগ্নে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শহর জুড়ে উড়ালপুল গড়েন এবং সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষিজমিতে শিল্পায়নের উদ্যোগ নিয়ে বিরোধীদের বাধায় রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

পশ্চিমবঙ্গের সংক্ষিপ্ত নির্বাচনী ইতিবৃত্ত: ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে ১৮ বার নির্বাচিত সরকার (দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার সহ) ক্ষমতায় এসেছে এবং চারবার রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হয়েছে (১৯৬৯, '৭১, '৭২ ও '৭৭)। ১৯৪৭ থেকে '৬৭ মনোনীত ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে (প্রিমিয়ার ১৯৪৭-'৪৮) সরকারের পর দুবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৯৫২ ও '৫৭) এবং একবার প্রফুল্লচন্দ্র সেনের (১৯৬২) নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের সরকার নির্বাচিত হয়। এরপর কৃষি, খাদ্য, উদ্বাস্তু, শিল্প, রাজনৈতিক (১৯৬৭-'৭২ নকশাল আন্দোলন, ১৯৭০- '৭১ বাংলাদেশ যুদ্ধ, ১৯৭৫-'৭৭ জরুরি অবস্থা সহ) বিভিন্ন কারণে জনজীবনের সংকট কে ঘিরে বাম সহ বিবিধ দলের আন্দোলন-বিক্ষোভে ১৯৬৭ থেকে '৭৭ অবধি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এবং এই সময় চারটি স্বল্পায়ু সরকার গঠিত হয়। ১৯৬৭ তে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস ও বামদের নির্বাচিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার, ১৯৬৭-'৬৮ ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে মনোনীত পিডিএ সরকার, ১৯৬৯-'৭০ পুনরায় অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নির্বাচিত দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং ১৯৭০ এ আবার অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মনোনীত পিডিএস সরকার। ১৯৭২ এর বিতর্কিত নির্বাচনের পর সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে আবার জাতীয় কংগ্রেস সরকার।

দক্ষিণ ইউরোপের সান মারিনোর পর দীর্ঘতম নির্বাচিত বাম সরকারঃ ১৯৭৭ থেকে ২০১১ অবধি পাঁচ বার সিপিআইএম নেতা জ্যোতি বসু (১৯৭৭, '৮২, '৮৭, '৯১ ও '৯৬) এবং দুবার সিপিআইএম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য র (২০০১ ও '০৬) নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার গঠনের মাধ্যমে ৩৪ বছরের দীর্ঘ বাম শাসন। স্থিতাবস্থার এক রেজিমেন্টেড সমাজগণতন্ত্রী শাসন যার শেষ দিকে প্রবল অবক্ষয় ও জনবিরোধী ভূমিকা।

পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের পরিবর্তন: তারপর ২০১১-'২৬ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিন বার নির্বাচিত তৃণমূল সরকার এবং ২০২৬ এ নির্বাচিত প্রথম বিজেপি সরকার। বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন কোন নির্বাচন যে নিরপেক্ষ হয়েছে কেউ বলবেনা, তার উপর তৃণমূল আমলে নির্বাচনে হিংসা, সন্ত্রাস, বিরোধীদের খুন ধর্ষণ উৎখাত ইত্যাদির ঘটনা বহুগুণ বেড়ে যায়। আর সামগ্রিকভাবে একবারে উপরতলা থেকে নিচুতলা অবধি পুকুর চুরি, লুঠ, তোলাবাজি; বিশৃঙ্খল অপরাধময় অপশাসন, অপসংস্কৃতি এবং অনুন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গকে সব দিক দিয়ে পিছিয়ে দেয়, প্রচলিত ব্যবস্থা গুলিকে ধ্বংস করে দেয়, রাজ্যকে বিশাল ঋণের সখাত সলিলে নিক্ষেপ করে এবং দুটি প্রজন্মের ভবিষ্যত অন্ধকার করে দেয়। নেশার দ্রব্য মদ হয়ে ওঠে তৃণমূল শাসনের প্রধান রাজস্ব।

বিজেপি - আর এস এসের উত্থান: একদিকে এই অমানিশা, সেই কারণে মানুষের ক্ষোভ হতাশা, বিজেপি - আরএসএসের ধারাবাহিক প্রচার, তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের মুসলমান ভোটব্যাংককে তৈলমর্দনের বিরুদ্ধে হিন্দু ঐক্যের ডাক, অন্য কোন বিকল্পের অভাব এবং তার সঙ্গে নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে কৌশল ও 'শান্তিপূর্ণ' বল প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপি কে দুই

তৃতীয়াংশ র বেশি আসনে জয়ী করে। এসআইআর, ডিজিটাল ভোটিং, গণনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন মোটেই সন্দেহাতীত নয়। আবার এক ক্ষমতালোভী, স্বৈরাচারী, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত নেত্রী ও তার পরিবার কে নিয়ে অশিক্ষিত, সুবিধাবাদী, চোর আর সমাজবিরোধীদের দল তৃণমূল দল নির্বাচনে পরাজয়ের পর তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়তে থাকে যা বিজেপির যাত্রাকে সহজতর করে দেয়।

নতুন সরকারের নতুন বাজেট: পশ্চিমবঙ্গের এই রকম এক সংকটময় ও অতিরুগ্ন আর্থিক পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আশীর্বাদধন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের ২২ জুন বিধানসভায় ২০২৬-'২৭ আর্থিক বাজেট পেশ।

এটি ঠিকই একটি বাজেটে সব কিছু প্রতিভাত হয় না, বাজেট নিয়েও নানানরকম ছলচাতুরি থাকে। যেরকম কেন্দ্র সরকার রেল বাজেট কে মূল বাজেটে নিয়ে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করছেন যেখানে কোন জনমুখী বরাদ্দ থেকে অন্যত্র অর্থ সাইফন হচ্ছে কিংবা প্রাক্তন রাজ্য সরকার এমন সব জনবাদী প্রকল্প ঘোষণা করে বাহবা নিয়েছিলেন অথচ সেগুলির উপর যেমন প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ছিল না, তেমনই অর্থের উৎস নিয়েও প্রবল ধোঁয়াশা থেকে গেছে। এটিও ঠিক একটি বাজেটে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। আবার এটিও ঠিক যে কোন সরকার তার বাজেটের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তথাপি কোন সরকারের বাজেট তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দিশা, কর্মনীতি ও কর্মসূচি অনেকটাই নির্দেশিত করে।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ বাজেট: উচ্চশিক্ষিত ও বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্ত মোট চার লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৫.২৯ কোটি টাকার বাজেট পেশ করলেন যেখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং সামগ্রিক ভারসাম্য রাখার প্রচেষ্টা, পাশাপাশি ঋণের বোঝা কমিয়ে আয় বাড়ানোর পথ খোঁজা, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং পরিকাঠামোয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে শিল্প-বিনিয়োগের প্রচেষ্টা রয়েছে।

সরকারি শূন্য পদে এক লক্ষ চাকরির ঘোষণা: পুলিশে ২০ হাজার, শিক্ষাক্ষেত্রে ৫০ হাজার ...। ৩৩% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। বয়সের উর্ধসীমা দুবছরের জন্য ছাড়।

অন্নপূর্ণা যোজনা: মহিলাদের জন্য সর্বজনীন তৃণমূলের মাসিক ২০০০ টাকার পরিবর্তে মাসিক ৩০০০ টাকা। ঝাড়াই বাছাই করে প্রকৃত প্রাপকদের দেয়া হবে। বরাদ্দ ৩৬ হাজার কোটি টাকা।

সরকার ও সরকার পোশিত বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শ বিদ্যালয়ে রূপান্তর। এর জন্য ২১০০ কোটি। ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ঝাড়গ্রামে আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়।

বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর ও আরামবাগে চারটি নতুন জেলার সৃষ্টি।

কল্যাণীতে নতুন বিমানবন্দর এবং উড়ান প্রকল্পে পুরুলিয়া, কোচবিহার, মালদা ও বালুরঘাট বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অক্টোবর '২৬ থেকে ২০% ডি এ বৃদ্ধি। জানুয়ারিতে সপ্তম বেতন কমিশন।

মিড ডে মিলে প্রাথমিকে দৈনিক মাথাপিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ৭৮ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা। মিড ডে মিলের রান্ধুনিদের ভাতা মাসিক এক হাজার টাকা বৃদ্ধি।

আলু সংগ্রহে চাষিদের ভর্তুকি (টপ আপ) কুইন্টাল প্রতি দুশো টাকা এবং ধান সংগ্রহে অতিরিক্ত সহায়ক কুইন্টাল প্রতি মূল্য দুশো টাকা বৃদ্ধি।

অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পাঁচ হাজার টাকা করে মাসিক পেনশন।

আশা-অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও সহায়িকাদের ৫০০০; সিভিক পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, হোম গার্ড, এন ভি এফ কর্মীদের ২০০০; প্যারা টিচারদের ৫০০০; প্রাণীবন্ধু সহ পশু পালনে যুক্ত কর্মীদের ২০০০; সরকার পোশিত ও ভোকেশনাল শিক্ষকদের ২০০০ - টাকা করে মাসিক বেতন-ভাতা বৃদ্ধি।

বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বিশেষভাবে সক্ষম দের পেনশন মাসিক ৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি।

২১-৪৫ বছর বয়সী শিক্ষিত বেকারদের স্নাতক পর্যায়ে ৩০০০ এবং তার কম শিক্ষিতদের ২০০০ টাকা করে মাসিক ভাতা।

স্বাস্থ্য বাজেটে আড়াই হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৭৫৩.৭২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ। দৈনিক রোগী পিছু খাদ্যের বরাদ্দ ৫৬ টাকা ৬৪ পয়সা থেকে এক লাফে বেড়ে ১১০ টাকা। আলিপুরদুয়ারে মেডিকেল কলেজ; দার্জিলিং, ফারাক্কা ও দিঘাতে ট্রমা সেন্টার; জঙ্গিপুর বিড়ি শ্রমিক কারখানার আধুনিকীকরণ; সুন্দরবনে মোটর বোট অ্যাম্বুল্যান্স ও দ্বীপ কেন্দ্রিক প্রসূতি কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গের জন্য এআইআইএমএস। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্য ৩১০০ কোটি।

সাগরমালা প্রকল্পে পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দর এবং হুগলী নদী তে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা। ডানকুনি - সুরাত রেল পণ্য করিডর; কালনা-শান্তিপুর ভাগীরথী র উপর সেতু; কলকাতা বন্দর-হাওড়া হুগলী নদীর নিচ দিয়ে পণ্য করিডর; চিংড়িহাটা-নিউ টাউন উড়ালপুল।

কেন্দ্রের ১০০০ এবং রাজ্যের ২০০ কোটি টাকা যোগ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কে দেশের ' সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ' গড়ে তোলা।

উত্তরবঙ্গের জন্য আইআইটি ও আইআইএম; শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ও ইনডোর স্টেডিয়াম; তিস্তা সেচ প্রকল্পে ১১০০০ কোটি টাকা; চা শ্রমিকদের জন্য নতুন বোর্ড; চাঁচল, গাজল, জয়গাঁ, শিব মন্দির ও টুঙ্গিদিঘি তে নতুন পুরসভা; হেমতাবাদে ডিগ্রি কলেজ, কালিয়াগঞ্জে মহিলা কলেজ।

রাজ্যের নিজস্ব প্রশিক্ষিত বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গঠন। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাঁচিয়ে 'কার্বন ক্রেডিট' পদ্ধতিতে রাজস্ব অর্জন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের আয়ুষ্মান ভারত, কেন্দ্রীয় রেশন ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা; রাজ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

অন্যান্য আর্থিক প্রবাহ ও প্রকল্প: জলজীবন মিশনে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২৭৭৫.৪৩ কোটি টাকা; ১২৫ দিনের কাজের 'জি-রাম-জি' প্রকল্প ও গ্রামোন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ১৬,০০০ কোটি টাকা।

২০২৬-'২৭ এ ১৪,২০৫ কোটি টাকা সহ এক লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্প; শিলিগুড়ি-নয়াদিল্লি ছয় ঘন্টার বুলেট ট্রেন।

রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য চিকিৎসায়: বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি, রাজকোষ ঘাটতি এবং ঋণের হার মোট জিএসডিপি র নিরিখে যথাক্রমে ২.০৭% থেকে ১.০২%, ৩.৪০% থেকে ২.৯১% এবং ৩৮.২৯% থেকে আপাতত ৩৭.৯৮% করা। রাজ্যের মোট আয় ৮২,১১১.৬৪ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৪,২৮,৭৭৩.২৯ কোটি টাকা ও মূলধনী খাতে বরাদ্দ ২৫,৬৪৪.৭৯ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৮৬,৩০৬.০৩ টাকা। কেন্দ্রীয় অনুদান ৪৯,৩২৪.৩৪ কোটি টাকা বেড়ে ৭১,৩৯৩.১৯ কোটি টাকা।

অর্থের উৎস: মূলত কেন্দ্রীয় বরাদ্দ, কেন্দ্রিয় প্রকল্পগুলি গ্রহণের ফলে আর্থিক সাশ্রয়, উপভোক্তা যাচাই এ কড়াকড়ি, রাজস্ব এবং ঋণ।

বিরোধীদের একাংশের সমালোচনা: আয়ের উৎস অস্বচ্ছ। মিড ডে মিল সহ বিভিন্ন প্রকল্পে পি পি পি মডেলের মাধ্যমে বেসরকারিকরণ। গৃহ সহায়িকাদের বিষয় অনুল্লেখ।

২০২৬-র উইম্বলডনে বিজয়ী হলেন লিণ্ডা নভোস্কা (চেক প্রজাতন্ত্র) এবং ইয়ানিক সিনার (ইটালি)

চলে গেলেন বিশ্বের সেরা অল রাউন্ডার ক্রিকেটার

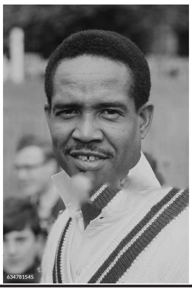

ডন ব্র্যাডম্যান স্যার গ্যারফিল্ড সোবারর্স (১৯৩৬ – ২০২৬) কে বলতেন ফাইভ-ইন-ওয়ান ক্রিকেটার কারণ তিনি ছিলেন একইসঙ্গে নির্ভরযোগ্য আক্রমণাত্মক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান, দুর্ধর্ষ ফিল্ডার, বাঁহাতি পেস বোলার, বাঁহাতি স্পিনার এবং বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলার। বারবাডোজের এক দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে স্বীয় প্রতিভায় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সম্মান অর্জন করেন। তাঁর ক্রিকেট জীবন ছিল ১৯৫৪ – '৭৪। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ছিলেন ১৯৬৫ – '৭২। ৯৩ টি টেস্ট ও ১৬০ টি ইনিংস খেলে মোট রান ৮০৩২, গড় ৫৭.৭৮, শতরান ২৬, অর্ধ শতরান ৩০, সর্বাধিক ৩৬৫ নট আউট যা ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ অবধি বিশ্ব রেকর্ড ছিল। ২৩৫ উইকেট, গড় ৩৪.০৩, সেরা ৭৩ – ৬, পাঁচ উইকেট ছয় বার। ক্যাচ ১০৯। ১৯৫৮ – '৫৯ এবং ১৯৬৬ – '৬৭ তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছিলেন।

সবুজ প্রাচীন

সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন উষর সাহেল অঞ্চলে মরু ঝড়, ভূমিক্ষয়, ক্ষরা ইত্যাদি প্রতিরোধে সেনেগাল থেকে জিবুতি ৮০০০ কিমি ধরে বৃক্ষরোপণ করে তৈরি হচ্ছে আফ্রিকার ঢাল 'দ্য গ্রেট গ্রিন ওয়াল'।

সর্বভারতীয় পরীক্ষায় অব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী

দেশে শিক্ষায় বেসরকারিকরণ এবং বাণিজ্যিকিকরণের ফলে শিক্ষার খরচও যেমন বাড়ছে, বাড়ছে দুর্নীতি। মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম থেকে পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ কেলেঙ্কারি দুটি উদাহরণ। অর্থের বিনিময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা গুলির প্রশ্নপত্র ফাঁস এখন জলভাত। বিগত নীট পরীক্ষার কেলেঙ্কারির পর 'ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)' কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে ২০ জুন থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। তাতে যোগ দেন লাদাখের শিক্ষাবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, পরিবেশ কর্মী সোনম ওয়াংচুক। তিনি অনশন শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে অনশন শুরু করেন এআইএসএ-র তিন ছাত্র নেতানেত্রী নেহা, মণীশ এবং আমিন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সোনম ২০ তারিখ থেকে সংসদের বাদল অভিযানের ডাক দেন। ১৮ তারিখ ভোরে দিল্লি পুলিশ সোনমকে জোর করে অবস্থান স্থল থেকে তুলে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। এরপর সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে সহ অন্যরা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনশন শুরু করেছেন। তাদের সংসদ অভিযানে পুলিশ নিষ্ঠুর লাঠিচার্জ করে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রবল বজ্রপাত

হিমবাহ গলার ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়ছে। দূষণের মাত্রার সঙ্গে বাড়ছে গড় তাপমাত্রা। বজ্রগর্ভ কিউমুলোনিম্বাস মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। অতিদ্রুত তৈরি হওয়া মেঘের সান্নিধ্যে এসে বাতাসে ভাসমান কণা ঘন ঘন প্রবল বজ্রপাতের অনুঘটকের কাজ করছে। হচ্ছে মুহুর্মুহু বজ্রপাত এবং মৃত্যু।

আন্তর্জাতিক

ধারাবাহিক হিংসার গ্রাসে সোনার বাংলা

বাপ্পাদিত্য রায়

"হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে। ... "
[দুর্মর - সুকান্ত ভট্টাচার্য]

২০২৪ এ ফ্যাসিবাদ অবসানের নামে তথাকথিত জুলাই বিপ্লবের পর থেকে যেসব পৈশাচিক ঘটনা ঘটে গেছে তাতে খুব পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যরা শিরোনামের সঙ্গে একমত হবেন আশা করি। সামাজিক বৈষম্য ও গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যেও যে সামাজিক স্থিতিশীলতা, আর্থিক প্রগতি, পরিকাঠামোগত উন্নতি এবং মুক্তমনা শিল্প – সংস্কৃতির পরিবেশটুকু বিরাজ করছিল সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় ছাত্র – জনতার অভ্যুত্থানে এক ঝটকায় সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। ৮ আগস্ট ২০২৪ কিছু ছাত্র নেতা, এন জি ও প্রধান, আমলা ও টেকনোক্র্যাট কে নিয়ে অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। কিন্তু এই সরকারকে নিষ্ক্রিয় রেখে প্রথম দিন থেকেই ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, খুনজখম, লুটপাট, নারীর সম্ভ্রমহানি, মুক্তমনাদের উপর এবং সংবাদপত্র অফিসে হামলা, ডাকাতি, রাহাজানি, অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি ইত্যাদি অবাধে চলতে থাকে। দেশবিদেশের পরিবর্তনকামী সহ অনেকের মনে হয়েছিল পরিবর্তনের সৃষ্টির আগের বোধহয় এই ধ্বংসলীলা।

কিন্তু তারপর যখন দেখা গেল মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা বাতিলের এই ছাত্র আন্দোলন মার্কিন, চিন, পাকিস্তান, সৌদি, কাতার, তুরস্কদের সহযোগিতায়; নিষিদ্ধ উগ্র মৌলবাদী 'জামাত – এ – ইসলাম বাংলাদেশ' (জামাত), ইসলামি জাতীয়তাবাদী 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি' (বি এন পি), কট্টর মৌলবাদী 'হেফাজতে – ইসলাম – বাংলাদেশ' (হেফাজতে) এর নেতৃত্বে এবং 'জামাত – উল – মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জে এম বি), 'আনসারউল্লাহ বাংলা টিম' (এ বি টি), 'হরকত – উল – জিহাদ – ইসলামি বাংলাদেশ' (হুজি), 'আল কায়েদা বাংলাদেশ' প্রমুখ জিহাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সশস্ত্র অংশগ্রহণে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হল; যখন যা কিছু ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা কিছু ১৯৫২ – '৫৬ এর মহান বাংলা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা কিছু বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা কিছু বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের নাম পরিবার ও কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা কিছু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভেঙ্গে – চুরে, জ্বালিয়ে – পুড়িয়ে তছনছ ও লুঠ করে নেওয়া হল; যখন দেখা গেল আইন রক্ষাকারী পুলিশদের গলা কেটে প্রকাশ্যে উল্টোদিকে ঝুলিয়ে, থানা পুড়িয়ে, জেল ভেঙ্গে সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের বের করে এনে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করে সমগ্র বাংলাদেশটিকে জল্লাদের উল্লাসক্ষেত্রে পরিণত করা হল; যখন জামাত – রাজাকারদের প্রধান কর্মসূচি ও বিনোদন হিন্দু, বৌদ্ধ সহ সংখ্যালঘুদের হত্যা, তাদের নারীদের ধর্ষণ, দেবস্থান ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ, সম্পত্তি লুঠ ও দখল, ফসল আত্মসাৎ ও উচ্ছেদ প্রভৃতির বন্যা শুরু হল; যখন শিল্পী, সাংবাদিক, প্রতিবাদী, বাউল ফকির এবং আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দলগুলির নেতা – কর্মীরা নৃশংসভাবে আক্রান্ত কিংবা নির্মম গণপিটুনি ও হত্যার শিকার হলেন; যখন গ্রামজীবনে 'ইসলামি তৌহিদি জনতা'র তালিবানি ফতোয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল; যখন দেশ গঠনের পরিবর্তে তীব্র ভারত বিরোধিতার বাতাবরণে ক্ষমতা দখলকারী নেতৃত্ব নিজেদের আখের গোছাতে মনযোগী থাকলেন; যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় লালিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের নোবেল বিজয়ী এজেন্ট, প্রাক্তন সুদের ব্যবসায়ী 'বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কে'র কর্ণধার, মহম্মদ ইউনুস উড়ে এসে অস্থায়ী সরকারের মাথায় জুড়ে বসে নৈরাজ্য ও ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে এবং বারেবারে নির্বাচন পেছিয়ে দিয়ে ক্ষমতা সম্প্রসারণে মত্ত রইলেন– তখন কারো বুঝতে বাকি রইল না বাংলাদেশকে সংশোধনের পরিবর্তে এক গভীর অমানিশার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অনেক অর্জন এবং গর্বের বিষয়ও ছিল

১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং তারপর ২০০৯ থেকে ২০২৪, দীর্ঘ ২০ বছর শাসন ক্ষমতায় থেকে হাসিনা ওয়াজেদ এবং তাঁর আওয়ামী লীগ সরকারের আচার আচরণে স্বৈরতান্ত্রিক লক্ষণগুলি জোরালোভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। বিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হচ্ছিল, সরকারের কাজকর্মের সমালোচনাকে আমল না দিয়ে বিদূষক পরিবৃত হয়ে থাকছিলেন নেতারা, বিগত দুটি সাধারণ নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল। নেতা – মন্ত্রী এবং তাদের ঘিরে এক সুবিধাভোগী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, মাফিয়া, চোরাচালানি ও তাদের পরিবারগুলিকে নিয়ে যে অভিজাততন্ত্র (Oligocracy) গড়ে উঠেছিল তারা সাধারণ মানুষকে শোষণ করে এবং দেশের সম্পদ

লুঠ করে দ্রুত অতিধনী হয়ে উঠছিল এবং বিদেশে দেশের সম্পদ পাচার করে দিচ্ছিল। বিএন পি, জামাত প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত অনেক দুষ্কৃতি, ধান্দাবাজ, দাগী অপরাধী, মাফিয়া আওয়ামী লীগে ঢুকে ক্ষমতার বৃত্তে চলে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মন্দা, দেশের মধ্যে বস্ত্র শিল্পে স্থিতাবস্থা, কোভিড অতিমারির চাপ ও ১২ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর বোঝা – সব মিলিয়ে দেশের আর্থিক সমস্যা, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাব সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করছিল। বিদেশি ঋণের বোঝাও অনেকটা চেপে বসেছিল। তিনদিক ঘেরা বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত নির্ভরতা, ভারতের সীমান্ত ও পদ্মা, তিস্তা, ফেনি, মুহুরি সহ দুই দেশের মধ্যে দিয়ে বহমান নদীগুলির জলের ভাগ নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে এবং ভারতের মাটিতে হিন্দুত্ববাদীদের বাড়াবাড়ি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা ও জনমানসে প্রবল ভারত বিরোধিতা সঞ্চারিত করে। হাসিনার তরফ থেকেও প্রতিস্পর্ধী কট্টর ভারত ও আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী উগ্রমৌলবাদী জামাতকে প্রতিহত করতে অপর ইসলামি উগ্র মৌলবাদী হেফাজতেকে মদত এবং শিক্ষা থেকে প্রতিটি বিষয়ে ইসলামি মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তারাও তাদের সাধ্যমত বাংলাদেশের তালিবানিকরণ এবং সমাজজীবনে মৌলবাদ ও তৌহিদি ইসলামিক জনতা নামক ধর্মীয় দুর্বৃত্ত দের স্থাপন করার কাজ করে চলেন।

এতদসত্ত্বেও আগের জমানার সময় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক মুক্ত অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় নেমে বাংলাদেশ দৃষ্টি আকর্ষণকারী অগ্রগতি ঘটায়। জন্ম লগ্নের ৮০% দারিদ্রকে দূর করে দারিদ্রের হার ১৮% এ নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। বিশ্বের দ্রুততম এগিয়ে চলা অর্থনীতি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশের উন্নত বস্ত্রশিল্প ফুলে ফেঁপে ওঠে, কারখানাগুলিকে পরিবেশ বান্ধব করার ক্ষেত্রেও সাফল্য আসে। বাংলাদেশের জি ডি পি একটি পর্যায়ে ভারতকেও ছাড়িয়ে যায় এবং মানব উন্নয়ন সূচকে চিনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। উপকূল অঞ্চল সহ বিপর্যয় মোকাবিলায় সাফল্য অর্জিত হয়। সড়ক, রেল, সেতু, ফেরি সহ পরিকাঠামো গঠনে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে যার মধ্যে পদ্মা নদীর উপর কুষ্টিয়া ও পাবনার মধ্যে লালন শাহ সেতু, ঢাকার মুন্সিগঞ্জ ও ফরিদপুরের মাদারিপুর – শরিয়তপুরের মধ্যে পদ্মা মাল্টিপারপাস সেতু, যমুনা নদের উপর টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতু, চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর নিচে আণ্ডারপাস, ঢাকা মেট্রো ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গবেষণা, গণ পরিবহন সহ অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটে। পাবনা জেলার রূপপুরে রাশিয়ার সাহায্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু একেবারেই প্রয়োজন ছিলনা বিদেশী ও অশুভ শক্তির প্ররোচনায় এই রকম আত্মঘাতী ধ্বংস লীলার এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের পাকিস্তানিকরণ ও তালিবানিকরণের। কেন এমন হল এবং বারবার কেন বাংলাদেশ এরকম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের শিকার তার অনুসন্ধানে আমাদের এই প্রাথমিক এবং সংক্ষিপ্ত অন্বেষণ। এর জন্য নিকট অতীতের কিছু বিষয় আমাদের ছুঁয়ে যেতে হবে।

সোনার বাংলা

আগের বেশ কিছু প্রতিবেদনে আমরা আলোচনা করেছি যে পারস্য, সুমের বা ব্যাবিলনিয়, মিশর, চিন, গ্রিস - মিনোয়ান - এশিয়া মাইনর এর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা উন্নত প্রাচীন সভ্যতা। প্রাচীন ভারতে গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বদ্বীপ দক্ষিণবঙ্গ - চন্দ্রদ্বীপ - সমতট তুলনায় নবীন হলেও বারেন্দ্রভূমি, পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় সম্বলিত উত্তরবঙ্গ অবশ্যই প্রাচীন সভ্যতার অংশ। নদীমাতৃক বর্ষামুখর অতিউর্বর এই সমতলের উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের সুখ্যাতি চতুর্দিকে। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এখানকার সোনালী পাট ছিল সারা বিশ্বে সমাদৃত। এখানকার বৈচিত্র্যময় কৃষি ও কৃষিজাত, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতদ্রব্য, ক্রান্তীয় সুস্বাদু ফলফলাদি, বিভিন্ন প্রজাতির উপাদেয় মৎস্যর উৎপাদন ও যোগান অফুরন্ত হলেও এই দেশটি সকল দেশের সেরা ছিল বিভিন্ন ধরনের শিল্পে। এর মধ্যে উন্নত মানের সূক্ষ্ম কার্পাস দিয়ে বাংলার তন্তুবায় শিল্পীদের নির্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রের চাহিদা ছিল সারা বিশ্বে। সেই প্রাচীনকাল থেকে নারায়ণগঞ্জ, বলাগড় প্রভৃতি স্থানের দক্ষ কারিগরদের তৈরি বিশাল বাণিজ্যতরী গুলিতে ভেসে বাংলার প্রসিদ্ধ পাটনি মাঝিদের নৌচালনায় সওদাগররা সোনারগাঁ, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপি প্রমুখ বন্দর থেকে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করে প্রচুর লাভ করে ফিরতেন। বাংলার রেশম শিল্প ছিল আরেকটি বিশ্ব বিখ্যাত শিল্প। যার লোভে আর্মেনীয়, পর্তুগিজ, ডাচ, দিনেমার, ফরাসি, ব্রিটিশ প্রমুখ ইউরোপীয়রা কাশিমবাজার, ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় কুঠি নির্মাণ করেছিলেন।

মধ্যযুগে সুলতানি আমলেও ভারত বা হিন্দুস্তান ছিল সবচাইতে ধনী ও প্রাচুর্যময় দেশ এবং সুবে বাংলা ছিল সবচাইতে ধনী ও প্রাচুর্যময় প্রদেশ। এখান থেকে প্রচুর রাজস্ব আসত। তাই ব্রিটিশ সহ ঔপনিবেশিকরা ভারত ও বাংলা দখল করতে এত লালায়িত ছিলেন এবং ভারত ও বাংলাকে শোষণ ও লুঠ করে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য বিশ্বের সব চাইতে ধনী দেশ হয়ে যায়। বাংলার শিল্প ও কৃষিজাত উৎপাদনগুলি নিয়ে ব্যবসা করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফুলে ফেঁপে উঠলেও তাদের নিম্নমানের বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পের বাজার বাড়াতে বাংলার

অসাধারণ বস্ত্র, রেশম ইত্যাদি শিল্পকে ধ্বংস করে দেয় তারা। এর উপর ইউরোপ, চিন সহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য বলপূর্বক নীল, আফিং, চা প্রভৃতি চাষ করিয়ে বাংলার কৃষকদের রক্তশূন্য করে দেয়। তার উপর জমির অত্যধিক রাজস্ব আদায় সত্ত্বেও সহযোগী অত্যাচারী জমিদার - নায়েবদের অত্যধিক খাজনা আদায়ের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করে অতুল ঐশ্বর্যশালী ভারত ও সোনার বাংলাকে করে তোলে চির দুর্ভিক্ষের দেশ।

ব্রিটিশরা কিন্তু সহজে এসব করতে পারেননি। প্রতি পদে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন কৃষক, কারিগর এবং জনজাতি যোদ্ধা দের থেকে। ব্রিটিশ ও সহযোগী ভারতীয়দের রচিত ইতিহাসে এই বিদ্রোহগুলি উপেক্ষিত হলেও এরমধ্যে কয়েকটি বিদ্রোহের অভিঘাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। যেমন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, উলগুলান, ওয়াহাবি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মহা বিদ্রোহ। এরমধ্যে অবিভক্ত বাংলায় কৃষক – কারিগরদের সংগঠিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩ – ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ), তন্তুবায়দের আন্দোলন (১৭৭০ – '৮০), নীল বিদ্রোহ (১৭৭৮ -১৮০০ এবং ১৮৩০ – '৪৮), রেশম চাষিদের সংগ্রাম (১৭৮০ – ১৮০০), আফিম চাষিদের প্রতিরোধ (১৭৮০ – ১৭৯৩), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮২ – '৮৩), খুলনা যশোর ও বাখরগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৪ – '৯৬), দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮ –'৯৯), ময়মনসিংহের কৃষক ও জনজাতি বিদ্রোহ (১৭৭৫ – ১৮২৭), চব্বিশ পরগনার ওয়াহাবি বিদ্রোহ (১৮৩১), ফরিদপুরের ফরাজি বিদ্রোহ (১৮৩৮ – '৪৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীল বিদ্রোহ সফল হলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা অন্য বিদ্রোহ গুলিকে ছলে বলে কৌশলে দমন করতে সমর্থ হন। ১৭৬৯ – '৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) এর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত ভয়াল দুর্ভিক্ষের পরও অকৃপণ প্রকৃতি বাংলাকে অচিরেই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। এখানকার ধান, পাট, রেশম, নীল, কাঠ ইত্যাদি বিক্রি করে ও রাজস্ব সংগ্রহ করে ব্রিটিশরা অত্যন্ত ধনী হয়ে ওঠেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়েও বাংলার বালাম সহ উৎকৃষ্ট চাল, শস্য, সব্জি ইত্যাদি এবং কলকাতা শিল্পাঞ্চলের প্রস্তুত সরঞ্জাম ছিল দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অন্যতম রসদ। এমনকি পাকিস্তান গঠনের পরেও পাকিস্তানের অর্থনীতিতে রপ্তানি থেকে মূল রাজস্ব যোগাতো পূর্ব বাংলার পাট ও চা। তাই আক্ষরিক অর্থেই বাংলা বিশেষত নদীমাতৃক অতিউর্বর পূর্ব বাংলা সেই প্রাচীন কাল থেকেই ছিল সোনার দেশ। যৌবনে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এবং পাবনার শাহজাদপুরের পদ্মা ও যমুনা সান্নিধ্যে কাটানো বিশ্বকবি তাইতো একে সোনার বাংলা আখ্যা দিয়েছেন। আর তাইতো পাক তানাশাহীর থেকে স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ তার জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্বকবির অপূর্ব 'সোনার বাংলা' গানটি।

সাম্প্রদায়িকতার বিষ এবং আড়াআড়ি ধর্মীয় বিভাজন

মধ্যযুগে মধ্যএশিয়া থেকে ভারতভূমিতে তুর্ক – আফগান আগ্রাসন এবং ইসলামের প্রবেশের পর বিভিন্ন ধারার হিন্দু ধর্ম ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্মগুলির সঙ্গে ইসলামের সংঘাত চললেও এবং বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের বিষয়টি থাকলেও সমাজের মূল বিষয় ছিল কতিপয় ধনী ও ক্ষমতাশালী রাজা – সুলতান – বাদশা – জমিদার কর্তৃক ব্যাপক গরীব শ্রমজীবী কৃষক, কারিগর এবং সাধারণ প্রজা – রায়তদের শোষণ ও অত্যাচার এবং মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক ব্যাপক সংখ্যক নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষদের শোষণ ও অত্যাচার। যত না নিম্ন বর্ণের মানুষ বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তার চাইতে বেশি ধর্মান্তরিত হয়েছেন উচ্চ বর্ণের রাজা – জমিদার – ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অত্যাচারে এবং সমাজ থেকে বিতাড়নের ফলে। ভারতীয় উপমহাদেশের বেশিরভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের পূর্বপুরুষ, পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্না থেকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মুজিবর রহমানের পূর্বপুরুষ, ধর্মান্তরিত। সাধারণ গ্রামজীবনে দরিদ্র শ্রমজীবী হিন্দু – মুসলমান কৃষকরা একসাথে মিলেমিশে বাস করতেন। প্রতিটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিরোধী কৃষক বিদ্রোহে হিন্দু – মুসলমান কৃষক – কারিগর যোদ্ধারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের সঙ্গে রাজ্যহারা হিন্দু – মুসলমান নৃপতি – সেনাপতি এবং কাজ হারানো হিন্দু – মুসলমান সিপাইরা যুক্ত হয়ে ১৮৫৭ – '৫৮ র মহা বিদ্রোহ সংঘটিত করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত নাড়িয়ে দেন এবং শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি থেকে ব্রিটিশদের সাময়িকভাবে অপসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তারপর থেকে ব্রিটিশ শাসকরা ভীত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সংস্কারের পাশাপাশি ভারতীয়দের ঐক্য ধ্বংস করতে সচেষ্ট হন। এইকাজে তাদের সহায়ক হন সহযোগী হিন্দু – মুসলমান রাজা – নবাব – জমিদার এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত, পীর মওলানা সহ দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী শক্তি। আর তখন থেকেই ব্রিটিশের তাস আলিগড়ের সৈয়দ আহমেদ খান থেকে পাঞ্জাবের লালা আর আর্য সমাজীরা। আর সেই সময় থেকেই অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু – মুসলমান, মুসলমান – হিন্দু, মুসলমান – শিখ, মুসলমান – পারসি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। ব্রিটিশ কর্তৃক একদিকে জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা; অন্যদিকে মোহামেডান এসোসিয়েশন, মুসলিম লীগ গঠন এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশরা সামগ্রিক দমনের সঙ্গে ধর্মীয় বিভাজন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর বেশি জোর দেন। ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, উত্তর – পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধ প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে এবং এতদিনকার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সামাজিক অবস্থানটি ভেঙ্গে পড়তে থাকে। পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হতে থাকে। এই কাজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, জামায়েত – ই – ইসলামি, রাজাকার প্রভৃতি উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন গুলিকেও আগেপরে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস,

উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফফর খানের মত সর্বজনগ্রাহ্য নেতা এবং পাঞ্জাবে ধর্মনিরপেক্ষ 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি' ক্ষমতায় থাকায় তখনকার মত পরিস্থিতির বেশি অবনতি হয়নি। বাংলায় ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি' এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশনে'রও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস খিলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করাতেও উত্তেজনার প্রশমন ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ প্রশাসন কিছুটা নমনীয় হয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আপোষ করেন এবং অ্যানি বেসান্ত ও তিলকের নেতৃত্বে নরমপন্থী হোমরুল আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেন। গান্ধী, প্যাটেল প্রমুখ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সৈন্য সংগ্রহে নামেন।

কিন্তু ব্যর্থ হলেও বাঘাযতীন, রাসবিহারী প্রমুখের নেতৃত্বে জার্মানির সাহায্যে দেশ জুড়ে বিপ্লব ও সেনা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা, বাংলা ও পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধি, চৌরিচৌরার ক্ষোভের রোষানল, কাঁকড়ি ডাকাতি, জালিয়ানয়ালাবাগ গণহত্যা নিয়ে দেশজোড়া প্রতিবাদ, একের পর এক উদীয়মান কৃষক ও গণ আন্দোলন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিব্রত করে তোলে। বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও দাঙ্গা সৃষ্টির কৌশলে তারা জোর দেন। একদা দাদাভাই নৌরজীর শিষ্য, তিলকের উকিল, ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস নেতা, আপাদমস্তক সাহেবী বোলচালে অভ্যস্ত, দ্বিতীয়বার এক তরুণী পার্সি রমণীকে বিবাহ করা মহম্মদ আলি জিন্নাকে গান্ধী - নেহরু কংগ্রেসের মধ্যে কোণঠাসা করায় ব্রিটিশরা কাজে লাগান। জিন্নাকে গান্ধীর সমান গুরুত্ব দিয়ে তারা মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসাবে মান্যতা দেন এবং তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বত্র অংশিদারিত্ব দাবি করান। ব্রিটিশরা আরও চেষ্টা চালান আম্বেদকার, ডি. রাজা প্রমুখদের মাধ্যমে দলিতদের এবং দেশীয় রাজাদের নিয়ে প্যারামাউন্ট স্টেট্স নামে আরও দুটি বিভাজনের। আম্বেদকার একটি পর্যায়ে নমনীয় হয়ে পুনে প্যাক্ট করে গান্ধীর সঙ্গে রণকৌশলগত বোঝাপড়া করেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে মতান্তর ছিল। ব্রিটিশদের হিন্দু - মুসলমান বিভাজনের কৌশলটিই বেশি ফল দিতে থাকে।

১৯২৯ এ নেহরু রিপোর্টের পাল্টা জিন্না ১৪ পয়েন্ট দাবি রাখেন যেখানে কেন্দ্রিয় আইনসভায় সংখ্যালঘু থাকা মুসলমানদের জন্য ১/৩ ভাগ আসন সংরক্ষণ এবং পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান - মুসলমান অধ্যুষিত প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অধিক ক্ষমতা প্রদানের কথা ছিল। ইসলামিক দার্শনিক, কবি ও আমলা মহম্মদ ইকবাল ১৯৩০ এ মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলিকে একত্রিত করার প্রস্তাব দেন। ১৯৩৩ এ চৌধুরী রহমত আলি প্রথম পাকিস্তানের কথা বলেন। জিন্নার নেতৃত্বে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে'র ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন দাবি ব্রিটিশের সমর্থন সত্ত্বেও সার্বিকভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনা। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জয়লাভ করে। কিন্তু ১৯৩৯ এ কংগ্রেস সরকারগুলির পদত্যাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটনা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের দাবি সামনে আনে, কংগ্রেস সেভাবে এর বিরোধিতা করেনা, হিন্দু মহাসভা সমর্থন করে। ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে ১৯৪০ এর লাহোর সম্মেলনে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে স্বাধীন দেশ গঠনের আহবান জানান। বাংলার অপর দুই মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল হাসিম পশ্চিম ও পূর্বের দুটি পৃথক দেশ এবং এইচ. এস. সুরাবরদি শরৎ বসুর সঙ্গে স্বাধীন 'ইউনাইটেড বেঙ্গল' এর দাবি তোলেন। ঐ ১৯৪০ এই 'অল ইন্ডিয়া আজাদ মুসলিম কনফারেন্স' দিল্লিতে সম্মেলন করে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁদের নেতা আল্লাবক্স সাব্রুকে গুপ্ত ঘাতক দিয়ে সিন্ধে হত্যা করিয়ে শুভ প্রচেষ্টার মৃত্যু ঘটানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে (১৯৩৯ - ১৯৪৫) কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, সি পি আই ও হিন্দু মহাসভা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের পাশে থাকে এবং নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বাধীনতা অভিযানের বিরোধিতা করে। ১৯৪২ এর জনপ্রিয় ও সুব্যাপ্ত 'ভারত ছাড়ো' গণ আন্দোলনের বিরোধিতা করে মুসলিম লীগ, সি পি আই ও হিন্দু মহাসভা।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির জমিদার মুসলমান নেতারা মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফল করলেও পাঞ্জাব, সিন্ধ ও বাংলায় মুসলিম লীগ ভাল ফল করে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। সিন্ধ ও বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের সহযোগী ছিল হিন্দু মহাসভা। এই মুসলিম লীগ এবং মুসলিম লীগ - হিন্দু মহাসভা সরকারগুলি ব্রিটিশ ও কংগ্রেসের সহযোগিতায় একের পর এক দাঙ্গা লাগাতে থাকে। পাঞ্জাবে হিন্দু - মুসলমান ও মুসলমান - শিখ ভয়াবহ দাঙ্গায় ১০ লক্ষের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং এক লক্ষের বেশি নারী ধর্ষিতা হন। দুই প্রান্তে এক কোটির বেশি উদ্বাস্তুর স্রোত বইতে থাকে। ভয়ঙ্কর দাঙ্গা ঘটে বাংলা, যুক্ত প্রদেশ (উত্তর প্রদেশ), দিল্লি, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে। এক নোয়াখালিতেই ব্যাপক হিন্দু নিধন ও হিন্দু নারীর সম্ভ্রমহানির ফলে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুর স্রোত বইতে শুরু করে। ঐ '৪৬ এই খোদ কলকাতার বুকে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও নৈরাজ্যের মধ্যে ব্রিটিশের পরিচালনায় নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস, জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ, বিড়লা, ইস্পাহানিরা ১৯৪৭ এ দেশটি ভাগ করে ফেলেন।

বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি

১৯০৫এ একজোট হয়ে বাঙালির উত্তাল গণ আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশ শাসকরা পূর্ব বাংলার মুসলমান নবাব, জমিদার, বড় ব্যবসায়ীদের বোঝাতে সক্ষম হন যে মুসলমান প্রধান পূর্ব বাংলা পৃথক প্রদেশ হলে তাদের হাতেই ক্ষমতা থাকবে। তারাও বাংলার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ষড়যন্ত্রে সামিল হয়ে পড়েন। তখন থেকেই মুনাফায় ফুলে ফেঁপে ওঠা মুসলমান পাট ব্যবসায়ীরা যুক্ত প্রদেশ, বিহার থেকে অবাঙালি উর্দুভাষী পীর, লাঠিয়াল, দুষ্কৃতি দের পূর্ব বঙ্গে

নিয়ে আসতে থাকেন। তারাই সেই থেকে বিগত ১০০ বছর ধরে পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ঘটে চলা অগুন্তি হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় নেতৃত্ব দেন এবং তারাই মুসলিম লীগ, জামাত, রাজাকার প্রভৃতি সংগঠনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের উচ্চবর্ণের রাজা জমিদার ও স্বচ্ছল ভদ্রলোক বাবুদের নেতৃত্বে স্বদেশী, বয়কট, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য প্রভৃতি আন্দোলন পূর্ব বাংলার ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র মুসলমান, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, কৈবর্ত, মাঝি প্রমুখ শ্রমজীবী কৃষক কারিগরদের ছুঁতে পারেনা। উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতাদের শোষণ, অত্যাচার, অবহেলা এই বৃহৎ জনসমষ্টিকে তাঁদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে অনেকক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়। বরং ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকে তাঁদের আকৃষ্ট করে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন। কিছুটা প্রথমদিকে 'ওয়ারকারস পেজেন্ট পার্টি' এবং শেষের দিকে 'কমিউনিস্ট পার্টি'। বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেও হিন্দু জাতীয়তাবাদী অভিমুখ ছিল এবং সেটি ছিল বৃহত্তর কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, গরীব সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। সিরাজগঞ্জের কৃষক আন্দোলনের বিপরীতে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীরা হিন্দু জমিদারদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৩০ এর দশকে রাসমণি হাজং, মণি সিং, আবদুল ভাসানি প্রমুখের নেতৃত্বে ময়মনসিংহর বিস্তৃত অঞ্চলে একের পর এক শক্তিশালী কৃষক বিদ্রোহ এবং আন্দোলন সংঘটিত হয়। রাসমণি হাজং যুদ্ধ করতে করতে ব্রিটিশ সৈন্যের গুলিতে মারা যান, মণি সিং ছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা। চিনপন্থী সমাজতান্ত্রিক আবদুল ভাসানি ছিলেন অসম ও পূর্ব বাংলার কৃষক, ভাষা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা এবং ১৯৪৯ এ 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র প্রতিষ্ঠাতা। প্রবীণ মণি সিং এবং ভাসানি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নেন।

১৯৩৭ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস কিছুতেই কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে জোট করলনা। ফলে সরকার গড়তে কৃষক প্রজা পার্টিকে মুসলিম লীগের হাত ধরতে হল। নবাব জমিদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন মুসলিম লীগ জোট সরকারকে কিছুতেই কৃষকদের স্বার্থে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হতে দিলনা। বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের সরকার ফেলে দিয়ে ব্রিটিশ সমর্থনে মুসলিম লীগের খাজা নিজামুদ্দিন এবং সুরাবরদির প্রধানমন্ত্রীত্বে বাংলায় পরপর দুটি মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হল। তাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা যোগ দিল। এরপর উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভাগচাষী আধিয়ারদের যে শক্তিশালী তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬ - '৪৮) শুরু হয়েছিল ব্রিটিশের সাহায্যে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা জোট সরকার এবং স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকার সেটিকে নির্মমভাবে দমন করে। ইতিমধ্যে পূর্ব বাংলা জুড়ে মুসলিম লীগ পেশীবল দেখাতে শুরু করেছে, দ্বিজাতি তত্ত্বের মগজ ধোলাই গ্রাস করে ফেলেছে মুসলমান সমাজের এক বড় অংশকে। 'নারা - য়ে - তকবির, আল্লা - হু - আকবর' ও 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগানে দুষ্কৃতীরা মুহুর্মুহু হিন্দুদের উপর আক্রমণ, হত্যা, হিন্দু নারী ধর্ষণ, লুঠপাট ইত্যাদি শুরু করে দেয়। তাদের নেতৃত্ব দেয় পূর্বোক্ত উর্দুভাষী 'বিহারি' মুসলমান ও রাজাকাররা। বেশিরভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দু ঘর - বাড়ি, জমিদারি - ব্যবসা, পেশা - চাকরি ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় পালিয়ে এলেন, ভুলে গেলেন তাদের ফেলে আসা দেশ ও সেখানে পড়ে থাকা নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকদের। কিন্তু গরীব, মাটি ও জমির সঙ্গে সংপৃক্ত নমঃশূদ্র, রাজবংশী, সাঁওতাল, গারো, চাকমা, মারমা দলিত ও জনজাতি কৃষকরা থেকে গেলেন। মতুয়া নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেও সেইসময়কার অবিসংবাদী তপসিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেশভাগের প্রবল বিরোধিতা করে ব্যর্থ হয়ে শ্রেণীশত্রু বর্ণহিন্দুদের নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তে শ্রেণীমিত্র মুসলমানদের সঙ্গে নিজভূমি পূর্ব বাংলায় থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী হিসাবে জিন্না মনোনীত মুসলিম লীগের তরফে যোগ দিলেন। সেই পর্যায়ে মুসলমানরা নমঃশূদ্র দের আক্রমণ করেনি। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় জাপানি আক্রমণের ভয়ে ব্রিটিশরা পূর্ব বাংলা কে পূর্বরণাঙ্গন স্থির করে সমস্ত মজুত খাদ্য সরাতে, সেতু - নৌকা ভাঙ্গতে শুরু করে দিল। চার্চিল - ইস্পাহানি সৃষ্ট ভয়াল দুর্ভিক্ষ পূর্ব বাংলার ৩০ লক্ষ গরীব হিন্দু - মুসলমান কৃষকের প্রাণ নিল। তারপরেই ঘটল ম্যালেরিয়া ইত্যাদির মহামারী। নানা উপায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা বাঙ্গালির কোমরটাই ভেঙ্গে দিলেন। এরপর মুসলিম লীগের সাহায্যে ভয়ানক দাঙ্গা ঘটিয়ে বাংলাকে আবার বিভাজন করে পূর্ব বাংলাকে তারা পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বড়দাদা শরৎচন্দ্র বসুর মত কতিপয় বাদে উচ্চবর্ণের ক্ষমতালিপ্সু কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও সিপিআই নেতারা বাংলা ও দেশভাগ সমর্থন করলেন।

পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা, বাঙালি ও হিন্দু বিরোধিতা

রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও মৃতদেহের স্তূপের উপর র‍্যাডক্লিফের কলমের আঁচড়ে দেশ এবং বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ ভাগের পর স্বাধীনতার নামে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এর অধীন ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ এবং ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি ডোমিনিয়ন তৈরি হল। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং প্রেসিডেন্ট - স্পিকার হলেন মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলি জিন্না, প্রধানমন্ত্রী হলেন মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি লিয়াকত আলি, সংবিধান সভার চেয়ারম্যান এবং আইন ও শ্রম মন্ত্রী, পরে তার সঙ্গে সংসদ ও কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রী, হলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ব্রিটিশের আশকারায় পরাধীন ভারতে এতদিন প্রতাপ দেখানো জিন্না কিন্তু তাঁর সাধের পাকিস্তানে অভীষ্ট অঞ্চলগুলি পেলেন না। 'পোকায় কাটা পাকিস্তানে' হতাশ তিনি এবার স্বপ্নের কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করলেন। পাকিস্তানে যুক্ত হতে ইচ্ছুক হায়দ্রাবাদ ও জামনগর সহ বেশিরভাগ করদ রাজ্য ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেও কাশ্মীর রাজ্য ভারত বা পাকিস্তানে না যেতে চেয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখতে

চাইছিল। জিন্না সেনা ও মিলিশিয়া পাঠিয়ে কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ দখল করে নিতে পারলেও (আজাদ কাশ্মীর) ভারতীয় সেনা কাশ্মীর উপত্যকায় পৌছনোর আগে তাদের আটকে দিল এবং নেহরু - প্যাটেলদের চাপ ও কূটনীতিতে কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল (জম্মু ও কাশ্মীর)। সেই থেকে কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ এবং একের পর এক যুদ্ধ - সংঘর্ষ। জিন্না দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন। তিনি পাকিস্তান গঠনের এক বছর এক মাসের মধ্যে মারা যাওয়ায় লিয়াকত আলির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক বাঙালিবিদ্বেষী পাঞ্জাবী রাজনীতিক ও আমলারা পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করলেন। তাদের প্রশ্রয়ে পূর্ব বাংলায় মৌলবাদী মুসলিম লীগ ও রাজাকার দুষ্কৃতীরা নমঃশূদ্র সহ হিন্দুদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করল। পাক প্রশাসন ও পুলিশ দাঙ্গাকারীদের মদত দিল। যোগেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করলে লিয়াকত পাঞ্জাবী চক্র তাঁকে কোণঠাসা করে দিল। তিনি বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করে ১৯৫০ এ ভারতে চলে এলেন। ওদিকে পূর্ব বাংলায় মৌলবাদী ইসলামি দুষ্কৃতীদের ঘটিয়ে চলা উপর্যুপরি দাঙ্গায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, সম্পত্তি দখলের আতঙ্কের পরিবেশে নমঃশূদ্র, রাজবংশী, মাহিষ্য, কৈবর্ত প্রমুখ হিন্দু সম্প্রদায় সব হারিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে অনবরত ভারতে চলে আসতে থাকল। তাদের পরিবারের বহু যুবতী ও কিশোরীদের দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে যৌন দাসী করে রাখল এবং বলপূর্বক ধরমান্তকরণ করল। ১৯৫০ এর নেহরু - লিয়াকত চুক্তি বাস্তবে কোন কাজ করল না। ১৯৪১ এ লাহোরে প্রতিষ্ঠিত কট্টর ইসলামি সংগঠন 'জামায়েত - ই - ইসলামি' র কর্ণধার মৌলানা আব্দুল আলা মউদুদি এবং মৌলানা সাবির আহমেদ ওসমানি ১৯৪৯ এর মধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তাঁদের কট্টর ধর্মীয় অনুশাসনে বদ্ধ করে ফেললেন। ফলে সেই থেকে পাকিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদের দিকে অভিযাত্রা এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি দের হয় বিতাড়িত করার অথবা ধর্মান্তরিত করার একমাত্রিক কর্মসূচি। আবার এই ধর্মীয় উগ্রবাদ ১৯৫১ তে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও জিন্না পরবর্তী মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট লিয়াকত আলিকে হত্যা করে। লিয়াকত আলি তাঁর সময় থেকেই পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। সেইথেকে মোল্লা, মার্কিন আর মিলিটারি, তিন 'ম' পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে গেল। ১৯৪৯ -'৫০ এ পূর্ব পাকিস্তানের চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে সাঁওতাল ভাগচাষীদের যে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল পাক পুলিশ ও আনসার বাহিনী সেটিকে নির্মমভাবে দমন করে এবং তার নেত্রী ইলা মিত্রকে গ্রেফতার করে গণধর্ষণ সহ বীভৎস অত্যাচার চালায়।

সমগ্র পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পীড়নের পাশাপাশি পাক শাসকরা বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দমন করতে উঠে পড়ে লাগলেন। এর বিরুদ্ধে এবং উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং মাতৃভাষা বাংলার উপযুক্ত মর্যাদা ও সরকারিভাবে উর্দুর সঙ্গে পাকিস্তানে সহযোগী ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে পূর্ব বঙ্গ জুড়ে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ অবধি ভাষা আন্দোলন চলল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আব্দুল ভাসানি, ফজলুল হক, মুজিবর রহমান, সামসুল হক, মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্তকুমার দাস, আব্দুল মতিন, সওকত আলি, আবুল কাশেম, রৌশন আরা, সারা তাইফুর প্রমুখ। ১৯৫২ এর ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতজন ছাত্র শহীদ হন। আন্দোলনের চাপে পাকিস্তানের অবাঙালি প্রশাসন সাময়িকভাবে পিছু হটে। ১৯৫৩ তে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' ধর্মনিরপেক্ষ 'আওয়ামী লীগে' রুপান্তরিত হয়। ১৯৫৪ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে জোট করে আওয়ামী লীগ মোট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে ২২৩ টি আসনে জয়লাভ করে। রসরাজ দত্তের 'ই বি এস এফ' ২৭ টি ও বসন্ত দাসের 'পি এন সি' ২৪ টি আসনে জয়লাভ করে। 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ' পায় মাত্র নয়টি আসন। হক সাহেবের মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথমে আদমজী জুট মিলে পরে অন্যত্র বাঙালি ও উর্দুভাষী বিহারি মুসলমানদের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ হয় এবং ১৫০০ মৃত্যু ঘটে। পাক প্রশাসন ব্যাপক ধরপাকড় করে সন্ত্রাস নামায় এবং এই সুযোগে বিধানসভা ভেঙ্গে দেয় ও প্রাদেশিক সরকারকে ফেলে দেয়।

১৯৪৮ এ জিন্নার মৃত্যু এবং ১৯৫১ তে লিয়াকত আলি হত্যার পর ১৯৫৬ ও '৫৮ অবধি যথাক্রমে খাজা নিজামুদ্দিন, গুলাম মহম্মদ ও ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল এবং খাজা নিজামুদ্দিন, মহম্মদ আলি বোগড়া, চৌধুরি মহম্মদ আলি, হাসান সুরাবরদি, ইব্রাহিম চুন্দ্রিগর ও ফিরোজ নুন প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব সামলান। ইস্কান্দার মির্জা সাময়িক প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৫৬ তেই পাকিস্তানের শাসকরা 'ওয়ান ইউনিট স্কিম' ঘোষণা করে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন, ইস্ট বেঙ্গলের নাম পরিবর্তিত হয়ে ইস্ট পাকিস্তান করা হয়, পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করা হয় এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। প্রথম দুবছর ইস্ট পাকিস্তানে একজন গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রী রাখলেও ১৯৬০ থেকে একজন পশ্চিমা প্রশাসক এবং ১৯৬৯ থেকে একজন পশ্চিমা সামরিক প্রশাসক বসিয়ে ১,৪৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই প্রদেশটির সঙ্গে উপনিবেশের এবং এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মত আচরণ করা হয়। সেই সঙ্গে তাদের সহযোগী মৌলবাদী মুসলিম লীগ, জামাত, রাজাকার নেতা - কর্মীদের উৎপীড়ন এবং হিন্দু সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

তারই মধ্যে ১৯৫৮ তে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জেনারেল আয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করেন ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন এবং ১৯৬৫ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিন্নার ভগিনী ফতেমা জিন্নাকে কায়দা করে হারিয়ে দিয়ে নিজের আসন পাকা করে নেন। ১৯৬৫ তেই মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 'অপারেশন জিব্রাল্টার' নামক ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালালে ভারতীয় সেনাবাহিনী

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে ধরে আয়ুব খান ১৯৬৬ তে তাসখন্দে চুক্তি করে সমঝোতা করেন। চুক্তির পরেরদিনই ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তাসখন্দে রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। ১৯৬২ তে আয়ুব খান সর্বজনীন ভোটাধিকার কেড়ে নেন। তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক ও বিমাতৃসুলভ শাসনে পূর্ব পাকিস্তানে জনঅসন্তোষ সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহমান ১৯৬৬ তে স্বায়ত্বশাসন, গণতন্ত্র সমেত ১১ দফা দাবি পেশ করেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করেন। এর প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হন, সনজীদা খাতুনরা রবীন্দ্রসঙ্গীত করতে করতে পথে নামেন। ১৯৬৮ - '৬৯ জুড়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয় যাকে পুরোমাত্রায় সমর্থন করে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি। যদিও ১৯৬৬ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন শুরু হয় যা এখনও ঘটে চলেছে। মুজিবর রহমান সহ বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতাদের গ্রেফতার করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় সোপর্দ করা হয়। সেনা - পুলিশের গুলিতে বাঙালি সামরিক অফিসার জাহিরুল হক ও ফজলে হক সহ ৬৮ জনের মৃত্যু হয়।

১৯৬৯ তে ইস্ট পাকিস্তান ছাত্র লীগ, ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (মতিয়া), ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (মেনন), ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন প্রমুখ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, গণতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন সহ ছয়টি দাবি পেশ করে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন যা সেনা - পুলিশের সঙ্গে রাস্তার লড়াই এ পর্যবসিত হয়। বহু আন্দোলনকারী হতাহত হন। ঐ বছরেই 'ডেমোক্রেটিক একশান কমিটি' মুজিব সহ নেতাদের মুক্তির দাবিতে জোরালো আন্দোলন শুরু করে। বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে গঠিত 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী' বিদ্রোহ করে। পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে আয়ুব খান আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। বিরোধী নেতা মুজিবর রহমান, খান আব্দুল ওয়ালি খান প্রমুখকে ছেড়ে দিতে হয়। এরপর ১৯৭০ এ ইয়াহিয়া খান 'লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক' ফরমান জারি করেন। ১৯৭০ এ পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা হয়। মোট ৩০০ টি আসনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩২ টি ও পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৮ টি আসন ছিল যার মধ্যে ১৩ টি (৭ ও ৬) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। আওয়ামী লীগ ১৬৯ টি আসন (প্রাপ্ত ভোট ৩৯.২০%) এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' ৮৬ টি আসন (১৮.৬৩%) লাভ করে। মুসলিম লীগ ও জামাত মানুষের ভোটে পরিত্যক্ত হয়। বালুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আওয়ামী লীগ একক গরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসক এবং রাজনীতিকরা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন না। মার্শাল ল এর অধীনে আরও দমনপীড়ন নামিয়ে আনলেন। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। তখন ১৯৭০ এর এক জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল ভাসানি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তিনি গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও নির্বাচন বয়কট করেছিলেন। ১৯৭০ এ ভোলায় এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৭১ এর ৩ মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে মুজিবর রহমান স্বাধীনতার দাবি জানান এবং অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেন। ২৫ মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করা হলে ২৬ মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যা বাঙ্গালি সামরিক অফিসার জিয়াউর রহমান বেতার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জানান। ক্ষিপ্ত পাক সামরিক শাসকরা সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। ২৬ মার্চ রাত থেকে পাক সেনারা পূর্ব পাকিস্তানে 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু করে। তাদের সঙ্গে ঐ হত্যালীলার সহযোগী ও পথপ্রদর্শক ছিল মুসলিম লীগ, জামাত, রাজাকার, আল বদর, আল শামস … সমস্ত হার্মাদের দল। প্রথমে বেছে বেছে বাঙালি বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, অধ্যাপকদের নৃশংস অত্যাচার করে হত্যা করা হল। আব্দুর রহমান, আলিম চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গোবিন্দ চন্দ্র দেব, আলতাফ মামুদ, গোলাম মুস্তাফা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, কালাচান্দ রায়, হরিনাথ দে, মুনির চৌধুরী, সেলিনা পারভিন, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সহস্রাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নির্মূল করা হয়। এবার গ্রাম শহরে নির্মূল করা শুরু হয় আন্দোলনকারী, আওয়ামী সমর্থক, হিন্দুদের। মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা জেনারেল ওসমানির নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলে প্রতিরোধ শুরু করেন। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও তারপর

জেনারেল হামিদ খান ও জেনারেল টিক্কা খানের পরিচালনায় পাক বা খান সেনা ও রাজাকারদের অত্যাচারে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়, চার লক্ষ নারী গণ ধর্ষিতা হন, ৩০ হাজার মুক্তি যোদ্ধার মৃত্যু ঘটে, এক কোটির অধিক উদ্বাস্তু ভারতে চলে আসেন। পাক সেনা - রাজাকার রা মিলে পূর্ব বাংলাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ভারত উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়, মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করে, তাজউদ্দীন আমেদের প্রধানমন্ত্রীত্বে ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিল অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান 'অপারেশন চেঙ্গিস খানে'র অধীনে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করলে ভারত - পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান ভারতের আটটি বিমানঘাঁটি আক্রমণ করলে ভারতের জল, স্থল ও বিমানবাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারে পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করে দেয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সাহস ও দক্ষতা দেখিয়ে ব্রেজনেভের নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশকে কাছে টেনে নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হুমকি এবং মাওয়ের চিনের চাপকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হন। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে এবং ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ এর দক্ষ পরিচালনায় ভারতীয় সেনানীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানকে ধরাশায়ী করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে ৯০ হাজার পাক সেনাকে নিয়ে জেনারেল নিয়াজী ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট - জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার

কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ মুক্ত হয়। বেশিরভাগ উদ্বাস্তু ফিরে যান। ১৯৭২ এর 'সিমলা চুক্তি' অনুসারে ভারত দখলে থাকা সমস্ত পাক জমি এবং পাক বন্দীদের ফেরত দেয়। ১৯৭২ এর জানুয়ারি মুজিবর রহমান পাকিস্তানের জেল থেকে ঢাকা ফিরে বীরের সম্বর্ধনা পান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দীন আমেদের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭২ এর ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৩ এর নির্বাচনে এতই মুজিবরের জনপ্রিয়তা ছিল যে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রায় একচ্ছত্র জয়লাভ (২৮৮ / ২৯৩) করে।

স্বাধীনতার আনন্দ ও আবেগ ছিল, দেশগঠনের বাসনা ও উদ্যোগ ছিল, মুজিবর রহমানের মত জনপ্রিয় শক্তিশালী নেতা ছিলেন, হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বহু বছর বাদে কিছুটা নিশ্চিন্তে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু পাক হানাদার আর রাজাকাররা দেশটি ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে, অর্থনীতি তলানিতে, এত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য নেই। ডাঃ জাফরুল্লা চৌধুরীর 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র', ডঃ ফজল আবেদের 'ব্র্যাক' প্রমুখ এগিয়ে এলেও এত মানুষের খাদ্য - বস্ত্র - বাসস্থান জোগানোর এবং চিকিৎসা করার পরিকাঠামো নেই, ভারত সহ বিদেশী সাহায্যে আর কত চলে? উপকূলের একের পর এক ঘূর্ণিঝড় এবং কলেরা প্রভৃতি মহামারী বাংলাদেশকে পঙ্গু করে দিল। মুজিবর রহমান বিরোধী রাজনৈতিক, সংগ্রামী, সাহসী নেতা হিসাবে যতটা দড়, দেশ শাসক, পরিচালক ও প্রশাসক হিসাবে ততটা দক্ষতা দেখাতে পারলেন না। বরং তাঁর অদক্ষ পরিচালনা, স্বজনপোষণ, তাঁকে ঘিরে একদল মোসাহেব এবং তাঁর পুত্র ও আত্মীয়দের দুর্নীতি, দাপট আর বাড়াবাড়ি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। প্রবল আর্থিক সংকট ডেকে আনে। ১৯৭৪ এ বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিরোধী রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, সোশালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি ভারতের মত কেউ রুশ, কেউ চিন, কেউ ভারত, কেউ মুজিবপন্থী, কেউ মুজিববিরোধী বহুধা বিভক্ত। এরমধ্যে সেরাজুল আলম, হাসানুল হক ইনু, আবু তাহেরদের নেতৃত্বে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল'(জাসদ), 'পূর্ববঙ্গ সোশালিস্ট পার্টি', রোমান্টিক বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে 'প্রলেতারিয়ান পার্টি অফ ইস্টবেঙ্গল'(সর্বহারা দল), 'ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি', 'বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনিস্ট)' প্রমুখ ছাড়াও 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ)', 'বাংলাদেশ জাতীয় লীগ' প্রমুখ দল সরকার বিরোধী জোরালো আন্দোলন শুরু করে। জাসদের সশস্ত্র 'গণ বাহিনীর' নেতৃত্বে ১৯৭২ - '৭৫ বিপ্লব সংঘটনের প্রচেষ্টা হয়, যা সেনা ও পুলিশ কঠোরভাবে দমন করে। ভারতের মাওবাদীদের মত মূলত দক্ষিণ বাংলাদেশে সর্বহারা দল কার্যকলাপ চালাত। তাদের মধ্যেও ভাঙ্গন ঘটে। সিরাজ সিকদারকে 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' গ্রেফতার করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৯৭৩ এ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরি প্রমুখ জনজাতিদের নিয়ে গঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি (পি সি জে এস এস)' এর সশস্ত্র 'শান্তি বাহিনী' আত্মপ্রকাশ করে। পরিস্থিতির সামাল দিতে মুজিবর রহমান ১৯৭৪ এর ডিসেম্বর 'জরুরি অবস্থা' জারি করেন এবং ১৯৭৫ এর জানুয়ারি মাসে তাঁর আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ', 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর)', 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল লীগ', 'গণমুক্তি ইউনিয়ন', 'জন সংহতি সমিতি' দলগুলিকে নিয়ে 'বাংলাদেশ পিজেন্টস ওয়ার্কার্স পিপলস পার্টি (বাকশাল)' গঠন করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের নামে একদলীয় সমাজতন্ত্র, বিরোধীদের মতে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র, চালু করেন। ঐসময় সংবিধানের চতুর্থবার সংশোধন করে 'বাকশাল' বাদে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট ক্যাপ্টেন হুদা, মেজর নুর, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শারিফুল হক ডালিম, রাশেদ চৌধুরি প্রমুখ এক ঝাঁক জুনিয়র সামরিক অফিসার এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তারা ভোরে মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেন। কেবল মুজিব কন্যা হাসিনা এবং রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। একদা মুজিব সহযোগী ষড়যন্ত্রকারী খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ ক্ষমতায় বসেন। ৩০ আগস্ট বাকশাল এবং মুজিব প্রণীত বাকশালী আইনকানুন বাতিল করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সহ সামরিক শীর্ষ কর্তারা গৃহবন্দী হন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এই ঘটনার মাধ্যমে সি আই এ এবং আই এস আই -র সাহায্যে বাংলাদেশ থেকে সোভিয়েত ও ইন্ডিয়া ব্লককে হটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করে। নভেম্বরে আরেকটি অভ্যুত্থান এবং তারপর আরও কয়েকটি অভ্যুত্থান ঘটে। বারবার পরিবর্তন ঘটে বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রে। জাসদ, জেনারেল জিয়া সহ অনেককে মুক্ত করে 'সিপাহী - জনতা বিপ্লবে'র মাধ্যমে বাংলাদেশে মার্ক্সীয় শাসনের আরেকটি ব্যর্থ চেষ্টা করে। ১৯৭৫ এ - ই জেনারেল জিয়া ক্ষমতা দখল করে জাসদ সহ রাজনৈতিক দলগুলিকে কড়া হাতে দমন করেন এবং মার্শাল ল জারি করেন। মেজর জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বদলে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির - রহমানির - রহিম' বাক্য বসিয়ে বাংলাদেশকে মুলত ইসলামি রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং শিক্ষায় ইসলামি ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেন। তিনি 'ইন্ডেমনিটি অরডিনান্স' জারি করে মুজিব হত্যাকারীদের ছাড় দেন এবং মেজর ফারুক, মেজর রশিদ, মেজর ডালিম দের বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করেন। আবার একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হন (১৯৭৫ - '৮১) যদিও আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানেই তাঁর প্রাণহানি ঘটে। জিয়ার সময় আর্থিক উদারীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির কিছুটা উন্নতি ঘটে, তিনি ১৯ দফা আর্থিক সংস্কার নীতি পেশ করেন। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রবর্তন করেন। তিনি ১৯৭৭ থেকে সামরিক শাসকের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট হন, ১৯৭৮ এর নির্বাচনের আগে 'বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বি

এন পি)’ গঠন করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৭৬ এ পদ্মা সহ বাংলাদেশের নদীগুলির শুকিয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ কে দায়ী করে সেটি ভেঙ্গে দেওয়ার দাবিতে ভাসানির নেতৃত্বে বিশাল লং মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর কয়েকটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং কয়েক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ১৯৮২ তে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেনা প্রধান হুসেইন মহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলেন এবং সামরিক আইন লাগু করে তাঁর স্বৈরশাসন জারি করলেন। ১৯৮৩ তে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে ‘জাতীয় পার্টি’ গড়ে তুলে ১৯৮৬ ও ১৯৯০ এর দুটি বিতর্কিত নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এরশাদের শাসনে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, সরকারি সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ, বিরোধীদের গুমখুন, এরশাদের নিজস্ব নানা অপকীর্তি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি ঘটে এবং যার জন্য ব্যাপক স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণ আন্দোলন চলতে থাকে। বহু তরুণ আত্মাহুতি দেন। ১৯৮৯ এ এরশাদ বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। অন্যদিকে তাঁর সময়েই ১৯৮৩ তে জন ওষুধ নীতি, ১৯৮৪ তে বাংলাদেশে কৃষকের অধিকার সহ ভূমি সংস্কার অরডিনান্স এবং ১৯৮৭ তে মাদক নিষিদ্ধ করে কড়া আইন প্রবর্তন হয়। অবশেষে ১৯৯০ তে এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। তারপর কিছুদিন অন্তর্বর্তী সরকার থাকার পর ১৯৯১ এর নির্বাচনে জামাত কে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে।

সমকালের বাংলাদেশের দুটি বড় ঘটনা ১৯৭১ এর গণহত্যার মূল চক্রী জামাত আমীর গোলাম আজম এবং অন্যান্য রাজাকারদের জিয়া বাংলাদেশে সসম্মানে পুনর্বাসন করার পর শহীদ জননী জাহানারা বেগম এর নেতৃত্বে ‘ঘাতক - দালাল নির্মূল কমিটি’র উত্তাল গণআন্দোলন এবং ২০১৩ তে সংঘটিত আব্দুল কাদের মোল্লা সহ ১৯৭১ গণহত্যার ঘাতকদের শাস্তির দাবিতে শক্তিশালী শাহবাগ ছাত্র আন্দোলন। ১৯৯০ এর এরশাদ অপসারণের পর বাংলাদেশী লব্জে গোলাপি ও আলাপী দুই বেগমের যুগ। জিয়াপত্নী বেগম খালেদা জিয়ার শাসনকাল ১৯৯১ - ‘৯৬ ও ২০০১ - ‘০৬ এবং মুজিবর কন্যা শেখ হাসিনার কার্যকাল ১৯৯৬ - ২০০১ ও ২০০৯ - ২০২৪। এরশাদ স্বৈরশাসন অবসানের জন্য একসঙ্গে আন্দোলনে নামলেও ২০০১ থেকে বিএনপি - জামাত এর সঙ্গে আওয়ামী লীগের নিরন্তর বিবাদ ও সংঘর্ষে বাংলাদেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যা ১৯৯৪ তে চরমে পৌঁছে এক সাংবিধানিক সংকটে পরিণত হয়। ১৯৯৪ তে নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন কে দেশ থেকে তাড়ানো হয়। আওয়ামী লীগের বয়কটের মধ্যে বিএনপি ১৯৯৬ এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জিতলেও বিরোধীদের তুমুল আন্দোলনে সরকার পড়ে গিয়ে তদারকি সরকারের তত্ত্বাবধানে ভোট হয়ে ১৯৯৬ এর জুনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনকালে পাকিস্তান, চিন ও মার্কিনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়। এরশাদের কারাবাস হয়। মৌলবাদী কার্যকলাপ বাড়ে। ১৯৯২ তে ভারতের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় এবং অন্য সময়ে হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা, হিন্দু দেবস্থান ভাঙ্গা ইত্যাদি চলতে থাকে। প্রথম হাসিনা সরকারের সঙ্গী ছিল জাতীয় পার্টি, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ইত্যাদি। এরশাদ মুক্তি পান। প্রায় আড়াই দশক ধরে মিলিটারি, পুলিশ ও বাঙালি মুসলমান বসতকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ চলার পর ১৯৯৭ এ ‘শান্তি বাহিনীর’ সঙ্গে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি’ সম্পাদিত হয়। এই পর্বে বিএনপি - জামাতের প্রবল বিরোধিতা এবং বাংলাদেশ জুড়ে অশান্তি ও হিংসায় হাসিনা সরকারও সঙ্কটে পড়ে যায়। অবশেষে মার্কিন হস্তক্ষেপে তদারকি সরকারের অধীনে ২০০১ এর নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে। পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার এসে ১৯৭১ এর ঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করার পর থেকে রাজাকারদের একাংশ ভারতে এসে বাম জমানায় কলিমুদ্দিন শামস প্রমুখ এবং পরবর্তীতে তৃণমূলের সুলতান আলম, ইদ্রিস আলি প্রমুখ নেতাকে ধরে কলকাতার বন্দর এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। আবার ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ থেকে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ ও অভিবাসন চলতেই থাকে।

দ্বিতীয় খালেদা সরকারের সময়েও বিরোধী আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন বেড়ে যায়। বিশিষ্ট লেখক হুমায়ুন আজাদ তাঁর ‘পাক সার জামিন সাদ বাদ (২০০৩)’ গ্রন্থে বিষয়টি তুলে ধরলে ২০০৪ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তাঁকে কুপিয়ে মারার চেষ্টা হয়। ঐ বছরেই হাসিনার সভায় গ্রেনেড হামলায় আইভি রহমান সহ বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী মারা যান। তার আগে ২০০১ এ রমনা বটমূলে ‘ছায়ানটের’ অনুষ্ঠানে গ্রেনেড হামলা হয়। ২০০৫ এ সারা দেশে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী দল ‘জে এম বি’ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। আলফা সহ উত্তরপূর্ব ভারতের জঙ্গি সংগঠনগুলির আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। অবস্থা চরমে উঠলে ২০০৬ থেকে ২০০৮ অবধি তদারকি সরকারের অধীনে জরুরি অবস্থা চলে। তারমধ্যেও ২০০৭ এ ছাত্র - মিলিটারি বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। ২০০৯ এর নির্বাচনে বামদের ও জাতীয় পার্টিকে নিয়ে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বিরোধী আন্দোলন, বাংলাদেশ রাইফেলস বিদ্রোহ, বিদ্যুৎ সংকট, বস্ত্র শিল্পে সমস্যা, ষ্টক এক্সচেঞ্জে ধ্বস প্রভৃতি সমস্যা অতিক্রম করে হাসিনা সরকার ১৯৭২ এর সংবিধান পুনরস্থাপিত করতে, অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে, ডিজিটাল বিকাশে সফল হয়। পাশাপাশি ১৯৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়। যুদ্ধাপরাধীদের সংগঠন হিসাবে জামাতকে ২০১২ তে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি, ২০১৩ তে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয় দাস, আশিকুর রহমান, নিলয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্লগারদের হত্যা করে। ২০১৪ তেও ব্যাপক হিংসার মধ্যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জেতে। এই পর্বে ২০১৫ তে শিক্ষাক্ষেত্রে ভ্যাট তুলে দেওয়ার এবং ২০১৮ তে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে কোটা তুলে দেওয়ার দাবিতে ও পথ নিরাপত্তার দাবিতে তিনটি বড় মাপের ছাত্র

আন্দোলন সংগঠিত হয়। ২০১৭ থেকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের স্রোত আসতে থাকে মায়ানমার থেকে। ২০১৯ ও ২০২৪ এর ভোট বিরোধীরা কারচুপির অভিযোগে বয়কট করেন। দুবারই হাসিনার সরকার গঠিত হয়। এই পর্বে ২০২০-'২১ কোভিড অতিমারির থাবা, ২০২১ এ সারা দেশ জুড়ে হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ২০২৩ এ ডেঙ্গু মহামারি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাংলাদেশের মূল দ্বন্দ্বগুলি এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

১২০৪ এ তুর্ক - আফগান সেনাপতি বখতিয়ার খলজির আক্রমণ থেকে যে ধারাবাহিক হিংসার সূচনা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং তার সহযোগী রাজা - নবাব - জমিদারদের সময়ে শোষণ - লুণ্ঠনের সময়ে যার তীব্রতা বৃদ্ধি এবং জাতীয়তা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথগামী করতে যার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণ করা হয়, দ্বি জাতি তত্ত্ব - দাঙ্গা - রক্তপাত - দেশভাগের পর তানাশাহী পূর্ব পাকিস্তান হয়ে মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে বাংলাদেশের সৃষ্টি - বিগত ৫৫ বছরে তা কিছুতেই থামেনি। ১,৪৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ১৭.৬৪ কোটি জনসংখ্যার দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত জনবহুল এই ছোট দেশটিতে প্রথম থেকেই দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক - সামাজিক - সাংস্কৃতিক ধারা নিয়ত সংঘর্ষরত। (১) বাঙালি, ধর্মনিরপেক্ষ, ভারতবন্ধু জাতীয়তাবাদ - যার অন্যতম উদ্গাতা আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী দলগুলি। (২) পাকিস্তানপন্থী, কট্টর ইসলামি, উগ্র ভারতবিরোধী, প্যান - ইসলামিজম বা খিলাফত পন্থীধারা - যার প্রবক্তা জামাত, হেফাজত এবং অন্যান্য ইসলামি দল ও সংগঠনগুলি। এর পাশাপাশি আরেকটি শক্তিশালী ধারা বাংলাদেশের মাটিতে জিয়াযুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়ার দীর্ঘ শাসনে দৃঢ় স্থান করে নিয়েছে - (৩) ইসলামি, ভারতবিরোধী, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ - যার দাবিদার বি এন পি। বিগত ১০০ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং নির্মম অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ, উচ্ছেদ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ এবং ভারতে উদ্বাস্তুর স্রোতের পরেও বর্তমান বাংলাদেশে ৯১.০৪% মুসলমান জনসংখ্যার সঙ্গেই রয়েছে ৭.৯৪% হিন্দু, ০.৬০% বৌদ্ধ, ০.৩০% খ্রিস্টান এবং ০.০২% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা। হিন্দুর সংখ্যা এখনও এক কোটি ৪০ লক্ষ। তাই ২০২৪ এর তথাকথিত জুলাই বিপ্লবে ছাত্র - জনতাকে সামনে রেখে মার্কিন - পাক পরিকল্পনায়; চিন, সৌদি, কাতার, তুরস্ক, ব্রিটেনের প্রশ্রয়ে; স্বভাবসুলভ নিষ্ঠুর হত্যা ও ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে জামাত ও ইসলামি মৌলবাদী শক্তির বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর থেকে পুনরায় হিন্দুরা টার্গেট। ভালুকার নিরপরাধ বস্ত্র শ্রমিক দিপু দাসের মত হিন্দু পুরুষদের প্রতিদিন মধ্যযুগীয় বর্বরতায় হত্যা করা এবং নারীদের গণধর্ষণ ও অত্যাচার করে ধর্মান্তকরণ চলছে। চলছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যা কিছু অর্জন সেগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া, পাকিস্তানের সঙ্গে মহব্বত। তীব্র ভারত বিরোধিতা এবং বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির তালিবানীকরণ। শিল্পী, সাংবাদিক, প্রতিবাদী, বাউল - ফকিরদের আক্রমণ। যার অঙ্গ হিসাবে 'জলের গান' এর বাদ্য মিউজিয়াম ধ্বংস ও কোনক্রমে প্রাণ হাতে রাহুল আনন্দের দেশত্যাগ। 'ছায়ানট', 'উদীচী'র মত বিশ্ববন্দিত সংস্থার এবং 'প্রথম আলো' ও 'দ্য মর্নিং স্টারের' মত নির্ভীক সংবাদপত্র অফিস তছনছ করা। ৩০ কোটি টাকা খরচ করে জামাতের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র শিবিরের' প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ দখল করা। আওয়ামী লীগকেই নিষিদ্ধ করে দিয়ে তার নেতা - কর্মীদের উপর পৈশাচিক আক্রমণ নামিয়ে আনা। ইউনুস সরকারের প্রতিনিধি এবং জামাত নেতাদের ঘন ঘন মার্কিন, চিন ও পাক সফর এবং পাক ও চিনা আধিকারিকদের বাংলাদেশে গতায়াত। ভারতের চিকেন নেক সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি। মার্কিন সেনার চট্টগ্রামে এসে মহড়া, সেন্ট মারটিন দ্বীপে ঘাঁটি গড়ার পরিকল্পনা এবং রাখাইন - পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তে কালো মেঘের ঘনঘটা। এই অশান্তি ও নৈরাজ্যে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা পড়েছেন সবচাইতে বেশি বিপদে। জামাত, মৌলবাদীদের নিরন্তর আক্রমণ; এতদিনকার আশ্রয় আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতি; প্রতিরোধের আহবায়ক চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মিথ্যা মামলায় কারান্তর; ভারতের মোদী সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকারের অমানবিক আচরণ, নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা, আক্রান্ত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য সীমান্ত সিল করে দেওয়া এবং আদানি সহ সহযোগী বড় ব্যবসায়ীদের বিদ্যুৎ, পিঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মুনাফা লাভের ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

হাসিনা অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, বুঝতে পারেননি যারা এতদিন তাঁর কাছ থেকে বেআইনি সুবিধা নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, তাঁকে ঘিরে স্তাবকতায় ভরিয়ে রেখেছেন, তাঁদের অনেকেই মার্কিন ডিপ স্টেটের হয়ে কাজ করছেন। নিজের আত্মীয় সামরিক বাহিনীর প্রধানও বিপদের সময় পাশে দাঁড়ালেন না। চিন সফরের সময় দেশে তাঁর অনুপস্থিতি কাজে লাগানো হল। যুক্তরাজ্য সহ পশ্চিমি দেশগুলি যারা তারেক রহমান সহ খুনী - অপরাধী সবাইকে আশ্রয় দিয়েছে, তারাও বিপদে সাহায্য তো দূরের কথা আশ্রয় পর্যন্ত দিলনা। আর নিজেকে বিশ্বগুরু রূপে তুলে ধরা ও রাজকোষের অর্থে অবিরত বিশ্বভ্রমণরত নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর বিজেপি সরকার? শুধুই বাগাড়ম্বর এবং চূড়ান্ত গোয়েন্দা ও কূটনৈতিক ব্যর্থতা। চিনের দখল করা জমির এক ইঞ্চিও উদ্ধার করতে না পেরেও তাদের ভারতে ঢালাও ব্যবসা করতে দেওয়া, পাকিস্তান যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি, নেপাল - মাল দ্বীপ - শ্রীলঙ্কা - মায়ানমার - ভুটান প্রতিবেশী বলয়ে উপর্যুপরি ব্যর্থতার পর বাংলাদেশে মুখ থুবড়ে পড়া। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে না পেরে হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দিয়ে বিড়ম্বনা আরও বাড়ানো।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশে কবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। ছাত্র নেতারা যে সুষ্ঠ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিলেন তাদের যোগ দেওয়া সরকারের শীর্ষ ব্যক্তি ইউনুস বেআইনিভাবে ক্ষমতায় থেকে যেতে বারবার সেটিই বানচাল করে দিয়েছেন। বিষয়টি খুবই দৃষ্টিকটু পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় অবশেষে ১২ ফেব্রুয়ারি'২৬ এ আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচনের কথা

ঘোষণা করেন। তাই ইউনুস লন্ডনে গিয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে সম্ভবত বোঝাপড়াও করেন। সম্ভবত মুখ্য নিয়ামক মার্কিন এবং ভারত, চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া হয়। হাসিনা জমানায় আর্থিক দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগে ৮৪ টি মামলায় অভিযুক্ত লন্ডনে পালিয়ে থাকা তারেকের ১৭ বছর পর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, পৌঁছেই ইউনুসের সঙ্গে দ্বিতীয় বৈঠক এবং সমস্ত অভিযোগ ও মামলা থেকে ঝটপট মুক্তি। নিহত ভারতবিরোধী 'ইনকিলাব মঞ্চে'র জনপ্রিয় নেতা ওসমান হাদির "দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা - '' স্লোগানের পরিবর্তে তারেকের মুখে "দিল্লি নয়, পিণ্ডি (রাওয়ালপিণ্ডি) নয়, অন্য কোন দেশ নয়, সবার আগে বাংলাদেশ" স্লোগান। অন্যদিকে ক্ষমতার আস্ফালনে মশগুল অনেকটাই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একদা জনতার নয়নের মণি ছাত্র নেতারা 'জাতীয় নাগরিক পার্টি (জে এন পি)' তৈরি করে নির্বাচনে জামাতের হাত ধরেন। তাদের থেকে একটি অংশ বেরিয়ে গিয়ে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 'নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন' তৈরি করেন। ক্ষমতার দুই দাবিদার বি এন পি ও জামাত দুজনেরই লক্ষ্য ছিল ৩৫% আওয়ামী লীগ এবং ৮% হিন্দু ভোট, তাই তারা নির্বাচনের ঠিক আগে আওয়ামী লীগকর্মী এবং হিন্দুদের প্রতি নমনীয়তা দেখায়।

২০২৬ এর জাতীয় নির্বাচন

বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়েই গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে অশান্তি ও হিংসার মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং 'জুলাই সনদ' নিয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। তুলনামূলক কম ভোট দান (৬০%) ও অনেক জায়গায় কারচুপি সত্ত্বেও হাসিনার সময়ে শেষ তিনটি 'রাতের নির্বাচন' যেখানে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারেননি এবার তাঁরা ভোট দিতে পারেন। যাবতীয় সরকারি ও বিদেশী সাহায্য সত্ত্বেও জামাত জোট ক্ষমতা দখল করতে পারেনা। বি এন পি বিপুল ভোটে দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে (মোট আসন: ৩৫০ (৫০ টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত)। ৩০০ টি আসনের মধ্যে ভোট হয়েছে ২৯৯ আসনে। আসন ঘোষণা: ২৯৬, বি এন পি জোটের জয়: ২১২ আসন, বি এন পি একার: ২০৯। বি এন পি র একটি শক্তিশালী জনভিত্তি ছিলই, তার উপর আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে মহিলা, হিন্দু এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের একাংশ কম বিপজ্জনক মনে করে তাদের ভোট দেয়। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রবর্তিত Unconditional Cash Transfer পরিবার পিছু মাসিক ২,৫০০ টাকার 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রকল্পটিও ভোটারদের প্রভাব ফেলে। যেমন জামাতের 'বেহেস্তের টিকিট' নামক খয়রাতি বিলি। জামাত জোট বিজয়ী না হলেও ৭৭টি আসন নিয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে (২০০২ এর নির্বাচনে বি এন পি র জোট হিসাবে জামাত পেয়েছিল ১৮ টি আসন)। রংপুর ও খুলনা ডিভিশনে এবং পশ্চিমের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভাল ফল করে। ইউনুস নির্বাচনের ঠিক আগে চুপিসাড়ে মার্কিন প্রভুদের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে আসেন এবং রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোনভাবে ক্ষমতার বৃত্তে থেকে যেতে সচেষ্ট হন। নির্বাচন পর্বে এবং জয়ী হওয়ার পরেও বি এন পি নেতৃত্ব দায়িত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন এবং সংযম দেখিয়েছেন। বিক্ষিপ্ত কিছু হিংসার ঘটনা ঘটেছে। তারেক রহমান আইনের শাসন, সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও দেশ গঠনের কথা বলেছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পথ এবং বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ভারত, চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে ভারসাম্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম:

জিয়াযুর রহমানের শাসনের সময় মিলিটারির কভারে ৫০ হাজার সমতলের বাঙালাদেশী মুসলমানকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় যারা জনসংখ্যা বাড়িয়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরি, কুকি, ব্রু সহ জনজাতিদের সংখ্যালঘু এবং সবদিক দিয়ে কোনঠাসা করে দেয়। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জনজাতি হত্যা, নারী নির্যাতন, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সেই জনজাতি সংগঠনগুলি আন্দোলনরত।

বাংলাদেশ কোন পথে?

নির্বাচনের পরপরই জামাত নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। জে এন পির ছাত্র নেতারা ছায়া মন্ত্রীসভা গড়ে নতুন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি, তাদের প্রস্তুত জুলাই সনদের অবিলম্বে কার্যকর এবং 'আধিপত্যবাদী' ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। সবচাইতে বড় কথা ইসলামি পাকিস্তানের মত বর্তমান টলমলে বাংলাদেশের তিন প্রধান স্তম্ভ মার্কিন, মোল্লা ও মিলিটারি কি চাইবেন সেটি। এই অনিশ্চিত কঠিন পরিস্থিতিতে তারেক রহমান এবং তার দল ও সরকার কতটা দক্ষতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবেন তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দীর্ঘদিন প্রবল কষ্টের মধ্যে থাকা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এখন অপেক্ষা নৈরাজ্যের অবসান হয়ে গণতন্ত্র ফেরে কিনা সেটি প্রত্যক্ষ করার।

তবে যাই ঘটুক না কেন পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, সংস্কৃতিবান, সর্বংসহা, সংগ্রামী মানুষ যারা বিগত ১০০ বছর ধরে অশুভ শক্তির হিংসার সঙ্গে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত লড়াই করে চলেছেন প্রকৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের উপর ভরসা করাই যেতে পারে।

"হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলাদেশের প্রাণ।''
[দুর্মর - সুকান্ত ভট্টাচার্য]

২১.০২.২০২৬

মার্কিন ইরান ভঙ্গুর চুক্তি

গ্যাব্রিয়েল লোপেজ

অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরান যুদ্ধকে মার্কিনের ভিয়েতনাম যুদ্ধের (১৯৫৫-'৭৫) সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। সারা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ও দখলদারি করা এবং উন্নত সামরিক শক্তির মাধ্যমে অপর বা ছোট দেশগুলিকে বিপর্যস্ত করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামকে বোমা, নাপাম মেরে বিধ্বস্ত করে ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করলেও সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন সমর্থিত ভিয়েতকং কমিউনিস্ট গেরিলারা অভূতপূর্ব গেরিলা লড়াইয়ে স্থলযুদ্ধে তাদের পরাস্ত করে এবং শেষমেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম ছেড়ে কার্যত পালিয়ে আসে।

ইরানের ক্ষেত্রেও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬এ আলোচনা চলাকালীন আকস্মিক মার্কিন ও ইজরায়েলি বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও ধর্মগুরু আয়াতুল্লা আলি খামেনেইকে পরিবারের অনেকের সঙ্গে এবং ৪০ জন নেতা ও জেনারেলকে হত্যা করতে পারলেও এবং তারপরেও ভয়ঙ্কর সব আঘাত এনেও ইরানকে পরাস্ত করতে পারেনা। রাশিয়া, চিন ও উত্তর কোরিয়া সমর্থিত ইরানের শিয়া ধর্মীয়-সামরিক বাহিনী 'ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ড কর্পস (আই আর জি সি)' দেশের ৩২টি অঞ্চলে ছড়িয়ে পাহাড়-মরুভূমির লুকোনো ঘাঁটিগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের আঘাতে মার্কিন সমরসজ্জা, ইজরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের ২১টি ঘাঁটি ও মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন মিত্র দেশগুলিতে জোরালো প্রত্যাঘাত করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। নামীদামী বিশাল মার্কিন রণতরীগুলিকে ওমান উপসাগরের দক্ষিণে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করে। পারস্য উপসাগর দখলে রেখে এবং বিশ্বের অন্যতম তেল ও গ্যাস যাওয়ার রাস্তা হরমুজ প্রণালীকে আটকে বিশ্ব শক্তি ও অর্থব্যবস্থাকে গভীর সমস্যায় ফেলে দেয়। এছাড়াও 'হেজবোল্লা'র মাধ্যমে ইজরায়েলকে আক্রমণ করে এবং 'হুথি'-র মাধ্যমে বার-এল-মানদেব প্রণালীতে বাণিজ্যতরীগুলিতে হামলা চালিয়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জাহাজ পরিবহন ও বিশ্ব অর্থনীতিকে বিরাট ধাক্কা দেয়। অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ ও একের পর এক মার্কিন সেনার মৃত্যু দেশের মধ্যেও ট্রাম্প প্রশাসনকে সমালোচনার মধ্যে ফেলে দেয়।

উপকূল বা স্থল অভিযান তো দূরের বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাহরিনে অবস্থিত তাদের পঞ্চম নৌবহর সহ ঘাঁটিগুলিও ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র নিশানা থেকে বাঁচাতে পারেনি। বাঁচাতে পারেনি নিরাপত্তা নিয়ে তার উপর নির্ভরশীল ইরাক, কুয়েত, বাহরিন, কাতার, আমীরশাহী, সৌদি, ওমান, জর্ডান মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিকে এমনকি ইজরায়েলকেও। এর আগে ১২ জুন ২০২৫ মার্কিন ও ইজরায়েল যৌথ বিমান হামলা চলিয়ে ইরানকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতাদের হত্যা করেও ক্ষমতা থেকে শিয়া-সামরিক শক্তিকে সরাতে পারেনি। এবারও বারবার বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে এই শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও সরাতে পারেনি। বরং এই শিয়া-সামরিক শক্তি আরও সংহত হয়েছে এবং শিয়া ধর্মসেনা 'আই আর জি সি' ইরানের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের ধারণা ছিল ভেনেজুয়েলার মত এক টোকায় ইরানের বর্তমান সরকারকে ফেলে দিতে পারবে। ধারণাও ভুল ছিল, তাই হয়ও নি। তাই লেজেগোবরে হয়ে ট্রাম্পের হুঙ্কার, হুমকি ও আস্ফালন বেড়েছে যাকে ইরান পাত্তা না দিয়ে ব্যঙ্গ করেছে এবং পাল্টা হুমকি দিয়ে গেছে। এর সঙ্গে মার্কিনের হয়েছে প্রচুর অর্থ খরচ। তথাপি ভিয়েতনাম ও আফগানিস্তানের মত এখান থেকে তাদের পুরোপুরি সরা সম্ভব নয় কারণ এখানকার তেল ও গ্যাস যার উপর নির্ভর পেট্রোডলার। এছাড়াও এখানকার ১০টি দেশে ছড়িয়ে তাদের নানারকম লাভজনক ব্যবসা।

এই যুদ্ধে চেষ্টা করেও ট্রাম্প রাশিয়া ও চিনের সমর্থন পাননি, জাপান কৌশলে এড়িয়ে গেছে। ন্যাটোভুক্ত স্পেন ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ইংল্যাণ্ড ও ইটালি ট্রাম্পের কথা শোনেনি। ফ্রান্স ও জার্মানি ট্রাম্পের সমালোচনা করেছে। ট্রাম্প এক ঘরে হয়ে পড়েছেন এবং ইজরায়েল সর্বত্র নিন্দিত হয়েছে। এর উপর হরমুজ অবরোধের ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম হু হু করে বেড়েছে। অন্যদিকে ইরান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটকে পড়ায় রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়িয়েছে এবং চিন তাইওয়ান দখলের জন্য হাত আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় ট্রাম্প প্রশাসন পাকিস্তানের আসিম মুনিরকে ধরে একটি শান্তি চুক্তি করে ট্রাম্পের বাক্যবাগীশতা বজায় রেখে ইরান যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে।

পাক মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইরান মার্কিনকে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দিতে রাজি হয় নি, হরমুজ প্রণালী নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছে এবং লেবানন যুদ্ধকে আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছে। এছাড়াও মার্কিন-ইজরায়েলের আক্রমণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, ভবিষ্যতে আক্রমণ না করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইরানের আটকে রাখা সম্পদগুলি ছেড়ে দেওয়া প্রভৃতি দাবি রেখেছে। আলোচনা ভেস্তে গেছে।

আবার দুপক্ষের বাদানুবাদ, হুমকি-পাল্টা হুমকি, যুদ্ধের পর মার্কিনের দিক থেকে পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন ইজরায়েলকে ইরান আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত রেখে পাকিস্তান, ওমান ও কাতারকে ধরে ১৫ জুন সুইজারল্যাণ্ডের ইরানের সঙ্গে শান্তি বৈঠক করে ৬০ দিনের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে। অবশ্য এর

মধ্যেও অবিরত ট্রাম্পের মুখ চলেছে এক দুপক্ষ বারবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

১৯৭৯-র ইসলামিক বিপ্লবে মার্কিন ইরান থেকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর নানাভাবে ইরানের উপর হামলা চালিয়েছে এবং ইরান সেগুলি প্রতিরোধে ব্যস্ত থেকেছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল মধ্য প্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়াকে পরিচালনা করেছে। মার্কিনের এই ইরান যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে মার্কিনের পরিবর্তে ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। ইজরায়েল কূটনৈতিক দিক থেকে আরও কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। সে শক্তিশালী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবোল্লাহ-র থেকে দক্ষিণ লেবাননের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজের নিরাপত্তা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আর ফাঁদে পা আটকে যাওয়া ট্রাম্প প্রশাসন হরমুজ জট এবং এই ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে মরীয়া পথ খুঁজছে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের মহার্ঘ তেল, গ্যাস ও পেট্রোডলারের ব্যবসা ছেড়ে পুরোপুরি চলে আসতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে ১২ জুলাই থেকে দুপক্ষের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

কেন — বেতোয়া আন্দোলনে ধরপাকড়

মধ্যপ্রদেশের কেন নদীর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বেতোয়া নদীকে খালের সঙ্গে সংযুক্ত করে ৪৪,৬০৫ কোটি টাকার দেশের প্রথম আন্তঃনদী প্রকল্প করতে চলেছে সরকার। ঘোষিত উদ্দেশ্য সেচ, পানীয় জল এবং জল বিদ্যুতের জোগান। কিন্তু পরিবেশের প্রভাব, উচ্ছেদ বিরোধিতা, উচ্ছেদ হওয়া গ্রামবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে অমিত ভাটনগরের নেতৃত্বে ভুক্তভোগী গ্রামবাসী রা ছত্তরপুর জেলার কুপি গ্রামে অনশন করছিলেন। আন্দোলনের ১৪ দিনের মাথায় পুলিশ এসে তাঁদের ধরপাকড় করে নিয়ে যায়।

হাইড্রোজেন পাওয়ারড ট্রেন

হরিয়ানার জিন্দ থেকে সোনিপাত অবধি ৩৫৬ কিমি দেশের মধ্যে প্রথম পরিবেশবান্ধব দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাইড্রোজেন পাওয়ারড ট্রেন চালু হল। এরজন্য ডিজেল বা ওভারহেড তার থেকে টানা বিদ্যুতের প্রয়োজন নেই। এই ট্রেনের সঙ্গে থাকা পাওয়ার কারে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল থাকে। সেখানে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ তৈরি হয়। বর্জ্য বা উপজাত হিসাবে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়।

ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট উৎক্ষেপণ

প্রতিরক্ষা, বিমান নির্মাণ সহ অন্য বিষয়ে আগেই সুত্রপাত হয়েছে। এবার ভারতে প্রথম বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তনী ৩৫ বছরের পবন কুমার চন্দনের হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রিক 'স্কাইরুট অ্যারোস্পেস' অন্ধ্রের শ্রী হরিকোটা থেকে 'বিক্রম ১' মহাকাশযান সফলভাবে উৎক্ষেপণ করল গত ১৮ জুলাই।

ভারতে ডেঙ্গু টিকা

অবশেষে ভারত সরকারের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া প্রাণঘাতী ডেঙ্গু রোগের টিকা QDENGA কে ছাড়পত্র দিল। চার থেকে ৬০ বছর বয়সীদের এই টিকা দেওয়া যাবে।

চাঁদিপুরা ভাইরাস

মহারাষ্ট্র, গুজরাতে বেশ কিছু শিশুমৃত্যুর কারণ জানা গেল চাঁদিপুরা ভাইরাস। সাধারণত বর্ষাকালে মাছিবাহিত এই রোগ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে প্রাণঘাতী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

খেলার জগৎ

খেলার যে খবর খবরের কাগজে থাকে না

নিলয় সামন্ত

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সাবজুনিয়র লিগে পাঁচ ম্যাচে ৭৫ গোল খেয়ে মহামেডানের দল তুলে নেওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দুই প্রধানের কাছে মোট ৩৭ গোল খেয়েছে সাদা-কালোর খুদেরা।

সমস্যাটা শুধুমাত্র মহামেডানের নয়। হয়তো আগামী ভবিষ্যৎকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের দল। আজকাল জেলার স্তরেও বেশ কয়েকটা ফুটবল একাডেমি চলছে রমরমিয়ে। অনেক ফুটবল একাডেমির কোচ আবার অতীত দিনের নামী ফুটবলার।

এমনই এক কোচিং সেন্টারের কর্ণধার তথা এককালের দিকপাল ফুটবলার জানালেন তার একাডেমিতে গোলকিপার পজিশনে খেলতে বাধা দিচ্ছেন অভিভাবকরাই। তার কথায় ১০ বছর বয়সে যে বাচ্চাটাকে তিনি গোলকিপার হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হঠাৎ করেই ১৪ বছর বয়সে তার অভিভাবক এসে জানালো তাকে আর গোলকিপার খেলানো যাবে না। কারণ চোট পেয়ে গেলে পরীক্ষা দেওয়ার অসুবিধে আছে।

এটা কোন একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। এমন ঘটনা অধিকাংশ ফুটবল একাডেমিতেই। অতীতে যৌথ পরিবারে ছোটদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়রা তেমন চিন্তা করতেন না। শিশু তার আপন খেয়ালে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারত নিজেকে। শাসন একটা থাকতো যাতে সে বিপথে চলে না যায়। এর বাইরে আর কোন কিছুতেই বাধা ছিল না।

কিন্তু এখন সবধন নীলমণি একটি সন্তান। সে খেলবে, নাকি নাচ-গান করবে, না শুধুই পড়াশোনা করবে, এসবই স্থির করে সে নিজে নয় তার অভিভাবকেরা। তাই অনেককে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে হয়। সব সময় যে সেই ফল ভালো হয় তা কিন্তু নয়। অভিভাবকেরা নিজেরাই নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলেন নিজেরই অজান্তে।

আজকাল একটা প্রবণতা হয়েছে সন্তানকে ক্রিকেটার বানানোর। ক্রিকেট কফিন পিঠে নিয়ে সন্তানের হাত ধরে অভিভাবকেরা আজকাল পাড়ি দিচ্ছেন দূর দূরান্তে। লক্ষ্য একটাই সন্তানকে বিরাট কোহলি কিংবা ঝুলন গোস্বামী তৈরি করা। কিন্তু অচিরেই সেই ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

একটা সময় আমি অ্যাথলেটিক্স এর কোচিং দিতে যেতাম ডায়মন্ড হারবার ছাড়িয়ে বাগারিয়া, কচুবেড়িয়া, শ্যাম বসুর চক, কুলপি এই সমস্ত অঞ্চলে। সেখানে দেখতাম ভালো ফল করা মেয়েদের খেলা শেষ হয়ে যেত ১৫-১৬ বছর বয়সে। কারণ তারপর তাদের বিয়ে হয়ে যেত। তাই আর খেলার সুযোগ থাকতো না।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বাবা-মায়েরা ওই বয়সে ছেলেদেরও আর খেলতে দিতে চাইছেন না। তাদের মত হল ওই সময়টা পড়ার সময়। ওই সময় খেললে পড়ার ক্ষতি হবে। যাদের খেলায় মন বসে গিয়েছিল তারা পড়ায় মন ফেরাতে বেশ সময় নিচ্ছে। ফলে খেলোয়াড়ও যেমন হওয়া হচ্ছে না ঠিক তেমনি পড়াশোনা তেও আশানুরূপ ফল মিলছে না।

কিন্তু এইসবের বাইরেও অনেকে জেদ করে সন্তানকে খেলা চালিয়ে যেতে বলে। তাতে সংসারে অশান্তিও হয় বিস্তর। যেমন, কেউ যদি ভলিবলের মরশুমে ধর্মতলার ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন কোর্টে যান, তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে পাঁচটা কোর্টের জালের বাইরে বহু দর্শক। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই দর্শক কুলের মধ্যে শুধুমাত্র দর্শক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ তারা সবাই কোন না কোন ভাবে ভলিবলের সঙ্গে যুক্ত। বংশপরম্পরায় খেলাটাকে তারা ভালোবেসে আসছেন।

এমনই এক অগাধ ভলিবল প্রেমীর দেখা মিলল এক সন্ধ্যায় ময়দানে রাজ্য ভলিবল সংস্থার মাঠে । তিনি রোহিত ব্যানার্জি। বলা ভালো ডাক্তার রোহিত ব্যানার্জি।

একদিকে ডাক্তারি, অন্যদিকে ভলিবল প্রেম- দুইয়ের মাঝে চিরবস্থান তাঁর। বজবজে জগন্নাথ গুপ্ত মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে ইন্টার্নশিপ করছেন। বারো ঘণ্টা ডিউটির পর বুধবার বিকেলে ভলিবল সংস্থার মাঠে খেললেন অসাধারণ এক ম্যাচ বেলেঘাটা বালকবৃন্দের ক্লাবের বিরুদ্ধে। কখনও বক্লার, কখনও লিফ্টার। ছয় ফুট দু' ইঞ্চির রোহিত সিঁথির রাসবিহারী বসু আদর্শ ব্যায়াম সমিতিকে তুললেন দ্বিতীয় ডিভিশনে।

রোহিতের স্বপ্ন ছিল পেশাদার ভলিবলার হওয়ার। কিন্তু তা আর হয়নি ঠিকই। তারপরেও পড়াশোনা ও ভলিবলের মধ্যে সুন্দর এক সহাবস্থান তাঁর। সাঁতরাগাছি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ভলিবলের জাতীয়স্তরে অনেক ট্রফি তাঁর ক্যাবিনেটে। জাতীয় জুনিয়র ভলিবলে তিনি বাংলার হয়ে একাধিকবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

রোহিতের এই পারফরম্যান্স দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাঁর রক্তে ভলিবল। বাবা রানা ব্যানার্জি সিঁথির টিমের কোচ। ম্যাথমেটিক্সে অনার্স পাশ করে তিনি এখন কেন্দ্রীয় অডিটর্স জেনারেল

অ্যাকাউন্টসে কর্মরত। তিনি বাংলার হয়ে একাধিক ম্যাচ খেলেছেন ভলিবলে। খেলেছেন অফিস টিমের হয়ে একাধিক ম্যাচও। বর্তমানে তিনি চাকরির পাশাপাশি ব্যস্ত ক্লাব কোচিংয়ে। মা মিতা ব্যানার্জি ভারতীয় মহিলা টিমের হয়ে খেলেছেন একাধিক ম্যাচ। তিনি দক্ষিণ পূর্ব রেলের মেয়েদের ভলিবল টিমের কোচ।

রোহিতের রক্তে তাই ভলিবল। কিন্তু কতদিন? রোহিতের মন্তব্য, "জানি না কতদিন পারবো? এক বছরের ইন্টার্নশিপ করতে হবে। তারপরে নিট পিজি'র জন্য প্রস্তুতি নেবো। অর্থোপেডিক্স নিয়ে এম এস করার ইচ্ছে আছে। সেটা আরও কঠিন পরীক্ষা। সেই চাপের জন্য প্রথম ডিভিশনে ভলিবল লিগে আর খেলছি না। কারণ সেখানে আরও চাপ। সেজন্য বাবার পরামর্শ মতো তৃতীয় ডিভিশনে খেললাম। পরেরবার কী করবো, তা এখন বলতে পারছি না।''

বিশ্বের পাঁচটি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে একটি নিট (ডাক্তারির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা)। রোহিত প্রথম দু'বার ব্যর্থ হলেও তৃতীয়বার ৫০ হাজারের মধ্যেই নিজের নাম রাখতে পেরেছেন। সুযোগ পেয়েছেন কলকাতার আশপাশেই।

ডাক্তারি পড়ুয়া অথবা ডাক্তার হয়ে যাওয়া খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাংলায় এই প্রথম এমন নয়। ১৯৪৮ লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন টি আও। তিনি তখন আর.জি.কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়তেন। পরে তিনি ডাক্তার হয়েছেন। এ ছাড়াও আরও অনেক নাম আছে। কিন্তু বাংলার ভলিবলে এ রকম চরিত্র খুঁজে পেলাম না। প্রবীণ ভলিবল কর্তারা কেউ মনে করতে পারলেন না। রোহিত তাই ব্যতিক্রমী রাজ্য ভলিবলে। দুঃখ একটাই ভারতীয় টিমের জার্সি তাঁর গায়ে উঠলো না। কারণ জাতীয় ভলিবল ফেডারেশনের অস্তিত্ব এখন আদালতের অন্দর মহলে।

রোহিত ডাক্তারি পড়ছেন। কিন্তু ময়দানে ডাক্তারের হাল কিরকম সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক। একজন ফুটবলার শুয়ে আছেন। ছাতা দিয়ে তাঁর ভাঙ্গা পায়ে সাপোর্ট দেওয়া। এক বিকেলে সমাজ মাধ্যমে সেই ছবি ভাইরাল।

সংশ্লিষ্ট ফিজিওকে রীতিমতো কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকদের দল। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিলেন নেট নাগরিক কুল।

ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে রেলওয়ে এফসি'র ফুটবলার তারক হেমব্রম প্রতিপক্ষ ফুটবলারের ট্যাকেলে ছিটকে পড়েন। মাঠে দৌড়ে গিয়ে ফিজিও বুঝতে পারেন, তারকের পা ভেঙেছে, তিনি উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে হাতের সামনে পাওয়া দুটো ছাতা দিয়ে পায়ে একটা ব্যান্ডেজ করে হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে সেই ফুটবলার নামী বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কিন্তু কেন দুটো ছাতা দিয়ে ব্যান্ডেজ করা হল? এই প্রশ্ন তুলেছেন খোদ ক্রীড়া সাংবাদিকরা। প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শহরের অন্যতম ফিজিও পুষ্পকেতু কোনার। যিনি আইএসএলে অতীতের এটিকে টিমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছিলেন দেশের বহু ফুটবলারের ব্যক্তিগত ফিজিও। সেই পুষ্পকেতু ধন্যবাদ দিচ্ছেন রেলওয়ে এফসি'র ফিজিওকে। তাঁর কথায়, "উপস্থিত বুদ্ধি তিনি কাজে লাগিয়েছেন। হাতের সামনে ছাতা পেয়েছেন, তা দিয়েই ব্যান্ডেজ করেছেন। অতীতে সোজা এবং শক্ত গাছের ডাল দিয়ে পা ভেঙে গেলে বেঁধে দিতো। এখানে স্টেডিয়ামের সেই ফিজিও'র কাজে কোনও ভুল দেখছি না। বরং সমর্থন করছি। সকলের খারাপ লাগতে পারে, ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েও ছাতা কেন? আধুনিক ব্যবস্থাপনা কেন নেই? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। সে জন্যই বলছি না। শুধু বলতে চাই, কী ভাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি এই বয়সেও খেলে যাচ্ছেন? উত্তর একটাই, ক্রীড়া বিজ্ঞান। আমাদের দেশে এ নিয়ে বহু সেমিনার হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ হয়নি।''

এ বার অনেকেই আইএফএকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। চিকিৎসক রাখতে হবে টিমের সঙ্গে, এই দায়িত্ব টিমের। টিমগুলোর সেই আর্থিক ক্ষমতা নেই। তাই অনেককষ্টে একজন ফিজিওকে রাখেন। খোলা মাঠে নিচের ডিভিশনগুলোতে সেই ব্যবস্থাটুকুও করতে পারে না ক্লাবগুলো, অবশ্যই আর্থিক কারণে। সে সব নিয়ে লেখার অবশ্যই কেউ নেই। বলারও কেউ নেই। দেখভালের লোক তো নেই-ই।

যাই হোক এবার জাম্প কাট। একেবারে ভারতের সবথেকে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটের ময়দানে যাওয়া যাক। এই গত বছরের কথা, হঠাৎ একটা রব উঠল, ইডেনের টিকিট কোথায় গেল?

ময়দান জুড়ে দিনভর চর্চা। খোদ সাংবাদিকরা পর্যন্ত তদন্তে নেমেছেন। অনেকেই দেখলাম বাধ্য হয়ে ফেসবুকে লিখেছেন। উগড়ে দিয়েছেন ক্ষোভ।

সাংবাদিকদের কাজ টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেওয়া নয়। যথাযথ ভাবে ঘটনার তদন্ত করা।

টিকিট হাহাকার আছে বলে সাংবাদিকদের ম্যাচ কভার করা নিয়ে কোনও অসুবিধে থাকার কথা নয়। কারণ সাংবাদিকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে। মাস খানেক আগে অনলাইনে ফর্ম ভরতে হয়। সেই ভিত্তিতে ম্যাচ কভার করার জন্য কার্ড পৌঁছে যায়। যে কার্ড দিয়ে গোটা আইপিএল কভার করা যায় অনায়াসে।

সমস্যা সেখানে নয়, বিনা পয়সার টিকিট সাংবাদিকদের হাতে নেই। রাগ, ক্ষোভ দুঃখ এখানেই। তবে এটা সত্যি দামের টিকিট নাকি পাঁচ মিনিটেই শেষ। ৯০০ টাকার টিকিটের রং কেউ দেখেননি। প্রশ্ন এখানেই, দামের টিকিটগুলো কোথায় গেল? হাওয়ায় উবে গেল! প্রশ্ন আছে উত্তর নেই।

এখানে সিএবি'র কার্যত কোন ভূমিকা নেই। দামের টিকিট কন্ট্রোল করছে কেকেআর। আর দরকার মতো কেকেআর কমপ্লিমেন্টারি টিকিট সিএবিকে তুলে দেয়, ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠনকে দেওয়ার জন্য। সিএবি'র ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অনেকটা পোস্ট অফিসের মতো।

কিন্তু সকলেই দায়ী করছে সিএবিকে।

অবাক করা বিষয় হচ্ছে, সিএবি'র হাতেও টিকিট নেই। সিএবি'র কর্তারাদের অবস্থা অনেকটা কেয়ারটেকারের মতো। কেকেআরের

মালিক শাহরুখ খান এখন ব্যস্ত টাকা তুলতে। আকাশছোঁয়া টিকিটের দাম। সেই টিকিটও উধাও।

সাংবাদিকদের গায়ের জ্বালা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট না পাওয়ায়। কাজের সুবাদে টিকিট বিলোতে হয় তাঁদেরও। কিন্তু সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনের কর্তব্যে তাঁরা অবিচল থাকে না। সিএবি'তে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার খেলানো নিয়ে রীতিমতো বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। থানা পুলিশ পর্যন্ত হয়েছে। জালিয়াতি হয়েছে ক্রিকেটারদের আধার কার্ড পর্যন্ত। অধিকাংশ কাগজ জেনেশুনে চুপ করে থেকেছে। কিছু কাগজ বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে লিখেছে। পাছে সিএবি'র কর্তারা চোটে না যান। কোনও ক্রিকেট রিপোর্টার সিএবি'র কর্তাদের বিরুদ্ধে লেখেন না। বিভিন্ন ইউ টিউবার ব্যাপারটি নিয়ে শোরগোল তোলেন। ইউটিউবারদের হারানোর কিছু নেই। কেউ এঁদের ধর্তব্যের মধ্যে রাখেন না। কিন্তু খবর তো খবরই।

অতীতে তাও লেখা হতো সিএবি'র বিরুদ্ধে। এখন লেখাই হয় না। পাছে অমুকে রাগ করে যদি টিকিট না দেন।

কয়েক মাস আগের ঘটনা, বিভিন্ন কর্তাদের গতিবিধি নজরে রাখার জন্য একজন ইউটিউবার কে ভাড়া করেছিলেন কোনও এক কর্তা। তিনি বেশ কয়েকদিন নিষ্ঠা ভরে কাজটি করেছিলেন। কিন্তু পালে একদিন বাঘ পড়ল। সেই সাংবাদিককে ধরা হল। রীতিমতো জেরা পর্ব চলল। কিন্তু পেশায় সাংবাদিক, তাই ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু তারপর থেকেই গেটের মুখে খাতা কলম নিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের টিম বসে গেল। সাংবাদিকরা সিএবি'র ঢুকতে গেলে কার কাছে যাবেন, সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করা হতো। তারপরে সেই নিরাপত্তা রক্ষী সংশ্লিষ্ট কর্তাকে ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করতেন, অমুক সাংবাদিক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি অনুমতি দিলেই তবেই সেই সাংবাদিক সিএবি'র অন্দরে ঢুকতে পারতেন। লজ্জার একশেষ ! না, তা নিয়েও কোনও সংবাদপত্রে এক লাইনও লেখা হয়নি।

এখানে এক সাংবাদিকের মন্তব্য যথেষ্ট। আমি এক ক্রিকেট সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম, হ্যাঁরে, এ সব কাণ্ড নিয়ে লিখছিস না কেন? আমার চেয়ে বয়সে ছোট সেই সাংবাদিকদের সাফ কথা, "আমি লিখতেই পারি। কিন্তু দুই দিন বাদে আমার সম্পাদক দুটো কমপ্লিমেন্টারি টিকিট চাইবেন। তখন দিতে না পারলেই গর্দান যাবে আমার।"

সেই সাংবাদিকদের নামটা অবশ্যই প্রকাশ করলাম না। আর যাই হোক কাউকে বিপদে ফেলার ইচ্ছে নেই আমার। শত হলেও "পাপী পেট কা সওয়াল হ্যায়"

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, আমাদের সময় অল্পবিস্তর লেখা হতো। কিন্তু কর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হতো না। এখন মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তফাৎটা এখানেই। সমালোচনা সহ্য করার মতো ক্ষমতা কোনও "শাসক গোষ্ঠীর" নেই। এমনটাই জানালেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

এবার আসা যাক অন্য এক গল্পে, পরিযায়ী শ্রমিকের কথা জানি সকলেই। কিন্তু পরিযায়ী খেলোয়াড়ের কথা এখন কানেও আসেনি। শুনবেন কিছুদিন পরেই। আমাদের এখানকার খেলোয়াড়রা রাজ্যে ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন ভিনরাজ্যে। অধিকাংশের গন্তব্য ওড়িশা। বাকিদের কেউই বেঙ্গালুরু, কেউ নয়াদিল্লি। কেউবা পুনেতে।

কারণ একটাই, পরিকাঠামোর অভাব বাংলায়। জাতীয় স্তরে সাফল্য পেলে পুরস্কার অর্থ চালু নেই এ রাজ্যে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরস্কার অর্থ অন্য রাজ্যের তুলনায় নামমাত্র।

ওড়িশার সোনালী হাতছানি টানছে বাংলার খেলোয়াড়দের। আমাদের রাজ্যের একমাত্র অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক পাশের রাজ্য ওড়িশা চলে গিয়েছেন। সল্টলেক সাই সেন্টারকে বিদায় জানিয়ে। কারণ সাই সেন্টারের জিমন্যাসিয়ামটিতে এসি নেই। ফলে প্রচন্ড গরমে নাজেহাল হতে হয় জিমন্যাস্টদের। আর রাজ্যে সরকারের কোনও অত্যাধুনিক জিমন্যাসিয়াম নেই। ফলে ওড়িশার অত্যাধুনিক জিমন্যাসিয়াম এখন প্রণতিদের স্থায়ী ঠিকানা। বাকি জিমন্যাস্টরাও পা বাড়াচ্ছেন সে দিকে। স্রেফ পরিকাঠামোর কথা ভেবে।

বাংলার সাঁতারুদের ঠিকানা বহুদিন ধরেই বেঙ্গালুরু অথবা নয়াদিল্লির সাঁতার অ্যাকাডেমি। ঘটি-বাঁটি বিক্রি করে বাংলার সাঁতারুদের বেঙ্গালুরুতে যাতায়াত দীর্ঘদিন ধরেই। তাঁরা জাতীয় মিটে নামেন কর্ণাটকের হয়ে। দিল্লিতে থাকা বাংলার সাঁতারুরাও নামেন অনেক সময় দিল্লির হয়ে।

বাংলার অ্যাথলেটিক্সের অবস্থা আরও করুণ। গত এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্না বর্মণ এশিয়াডের পরে অবসর নেওয়ায় সল্টলেক সাই সেন্টারে ট্র্যাকে বাতি জ্বালানোর মতো অ্যাথলিট নেই। তিনিও অবসরের পর কোচিং বা ক্রীড়া সংগঠনে না এসে তৃণমূল দলের হয়ে রাজনীতিতে যোগ দিলেন। থাকছেন না কোচরাও। প্রথম সারির কোচরা অবসরের পর ঠিকানা বদলে চলে গিয়েছেন ভিন রাজ্যে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা দেখে। বহু কোচ যোগ দিয়েছেন ওড়িশাতে। যেখানে একের পর এক পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। একেবারে বিশ্বমানের। হকিতে ১৯ নম্বর অ্যাস্ট্রোটার্ফ তৈরি হচ্ছে ওড়িশার। সেখানে বাংলায় এখন সম্পূর্ন হয়নি একটি অ্যাস্ট্রোটার্ফ। যুবভারতীতে অ্যাস্ট্রোটার্ফ তৈরির কাজে সবে হাত দিয়েছে রাজ্য সরকার। কবে শেষ হবে কেউ জানে না।

অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের সময় রাজ্য সরকারের মধ্যে যে উদ্যোগ দেখেছিলাম, সেই উদ্যোগ কিন্তু উধাও। পরিকাঠামো তৈরিতে কোনও নজর নেই। সরকারি মহলে ঘোরাঘুরি করলে জানা যাবে, খেলার পরিকাঠামো তৈরি করে খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দিলে ভোট আসবে না। ভোট আসবে লক্ষীর ভাণ্ডার থেকে। ফলে রাজ্যে কাজ না পেয়ে বিভিন্ন কাজের শ্রমিকরা যেমন ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছেন স্রোতের মতো, এখানে খেলোয়াড়দের বাংলার ছাড়ার ধূম অনেকটা একই রকম। পার্থক্যে শুধু সংখ্যায়।

বাবা-মায়ের সামান্য অর্থ নিয়ে বাংলা ছেড়ে হায়দরাবাদে গোপীচাঁদের অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বাংলার, এমন

খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম নেই। কয়েক'শ উদাহরণ দেওয়া যায়। সেখানে বাড়ি ভাড়া করে মায়ের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে অনেকেই।

তিনটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী সিকদারকে তাঁর একমাত্র ছেলেকে শুটার বানাতে গিয়ে হায়দরাবাদে থাকতে হয় বছরের অধিকাংশ সময়ে। বাংলার অন্যতম শুটার মেহুলি ঘোষ হায়দারবাদে গগন নারাংয়ের কোচিংয়ে চলে গিয়েছেন। সেখানে যাওয়ার অন্যতম কারণ পরিকাঠামোর। জয়দীপ কর্মকার শুটিং অ্যাকাডেমিতে নেই সেই পরিকাঠামো। বাংলায় অন্যত্র শুটিংয়ের পরিকাঠামো সেই মহাভারতের আমলের।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের পাশেই টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি। একেবারে আধুনিকমানের। শুরু হয়েছিল ঝড়ের গতিতে। কিন্তু এখন সেই রমরমা নেই আর। বাংলার টেবল টেনিসের তারকারা এখন কেউ হায়দরাবাদে। কেউ চেন্নাইতে।

এশিয়াডের পরেই গোয়াতে জাতীয় গেমস। সেখানে দল পাঠাতে হবে। রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার শেফ দ্য মিশন ঠিক হয়ে গিয়েছে। বহুদিন আগেই। কিন্তু জাতীয় অলিম্পিক কমিটির কোনও চিঠি নাকি এখনও পায়নি রাজ্যের অলিম্পিক সংস্থা। ফলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া করার আর কিছু নেই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার অন্যতম কর্তা বাংলারই কল্যাণ চৌবে। রাজনীতিতে তিনি বিজেপির ছত্রছায়ায়। আর বাংলায় রাজ্য অলিম্পিক সংস্থায় রাজ্যের প্রাক্তন শাসক তৃণমূলের লোকজন। ফলে 'খেলায় রাজনীতি নয়', কথাটি উচ্চারণ করলেও ছবিটা কিন্তু বলছে একেবারে অন্যকথা।

কল্যাণের ভারতীয় ফুটবল সংস্থা এশিয়াড টিম পাঠালো বহুকষ্ট করে। কিন্তু প্র্যাক্টিস ছাড়াই টিম চিনে পৌঁছে গেল। অতীতে যা ভাবা যেত না। আমার সাংবাদিকতা জীবনে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

এই আমাদের ক্রীড়া। এই আমাদের ক্রীড়ানীতি।

একসময়ের ডাকসাইটের ক্রীড়া সাংবাদিক রূপায়ণ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, সেদিন বিকেলে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস মালদায় পৌঁছাল মিনিট পাঁচেক পরে। হাওড়া যাবে। ই টু কম্পার্টমেন্টের কাছে মাছির ঝাঁকের মতো জটলা। তার মধ্যেই একটা টুপি পরা মাথা কোনওমতে কামরায় উঠতে পারল। জটলায় একবার আওয়াজ উঠল।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মালদা এসেছিলেন সকালের বন্দে ভারতে। একই কামরায় তিনি ফিরে গেলেন আট ঘণ্টা কাটিয়ে।

মালদার কৃতিত্ব, সৌরভকে এতদিন পরে ট্রেনে ওঠানো। সৌরভ কবে শেষ ট্রেনে উঠেছেন, এটা ভুলে গিয়েছেন কাছের লোকেরাই। খুঁজেটুঁজে জানা গেল, বছর আটেক আগে সৌরভ রাতের গৌড় এক্সপ্রেসে মালদা আসেন একবার। শহর ছুঁয়ে গাড়িতে যান বালুরঘাট।

মালদার ব্যর্থতা, এই শহর সৌরভকে আনায় সফল অবসরের ১৭ বছর পরে। সৌরভ আজও বাংলার সেরা বিজ্ঞাপনী ব্র্যান্ড। সেটা সৌরভের যত বড় সাফল্য, তত বড় ব্যর্থতা বাংলার। আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে নয়া রোল মডেল তৈরিতে ফেল।

সামনে সিএবি নির্বাচন। সেখানে বাঙালির দাদা আবার প্রেসিডেন্ট হতে চান। দুর্জনেরা বলেন, এজন্যই তাঁর জেলা ভ্রমণ শুরু। তাই এতদিনে মালদায় চোখ। তারপর গেলেন বাঁকুড়াতেও।

কলকাতা ময়দানে আজ বন্ধু, ভাই, দাদারা পরিণত শত্রুপক্ষে। সিএবি টু মোহনবাগান, সর্বত্র উলটপুরাণের চূড়ান্ত। সৌরভ বনাম অভিষেক, সৃঞ্জয় বনাম দেবাশিসে দুটো চমৎকার পরিবার ভাঙার উপক্রম। আবার নবান্নের হস্তক্ষেপ অনিবার্য। সে কথায় না হয় পরে যাওয়া যাবে। খেলার প্রেক্ষিতে মালদা, উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক লজ্জাবৃত্তান্তে আসি। যা যাবতীয় যুক্তি, নিয়মকে হারিয়ে খেলায় উত্তরের বৃহত্তম লজ্জা।

মালদা শহরে গেলে আজও দেখবেন, সৌরভকে স্বাগত জানিয়ে পুরোনো পোস্টার-ব্যানারের ছড়াছড়ি। মালদায় প্রথম আবির্ভাব, এই ছিল ট্যাগলাইন। দিনকয়েক আগে আরও বেশি অন্য তোরণ ছিল শহরের অলিগলিতে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিশাল কাটআউট। কী না? রাজ্য গেমস হচ্ছে শহরে। আপাতত গেমস হয় নেতাজির নামে। মালদার একটা গেটেও নেতাজির ছবি দেখিনি হতভাগ্য আমি।

সে না হয় হল। তারপরেও যা হয়েছে, সব কিছু আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।

রাজ্য গেমস খায়, না মাথায় দেয়, গুরুত্বটা কী, যাঁদের ধারণা নেই, সেই প্রিয় পাঠকদের জন্য দু'লাইন লেখা উচিত। ভারতে জাতীয় গেমস যেমন হয় অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমসের ছাঁচে, রাজ্য গেমস দু'বছর অন্তর হয় জাতীয় গেমসের ছাঁচে। অলিম্পিক বা এশিয়াডে বুঝবেন, বিশ্ব বা এশিয়ায় কোন দেশ খেলায় কত নম্বরে। জাতীয় গেমস দেখায়, কোন রাজ্য কত নম্বরে। এবার উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে সার্ভিসেস, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রথম পাঁচে। বাংলা সোনা জয়ের বিচারে ৮ নম্বর, মোট পদকের বিচারে ১৩ নম্বরে। অন্যবারের তুলনায় ভালোই ফল বলতে হবে। সে বিচারে রাজ্য গেমস রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। যা এক লহমায় বলে দেয়, খেলায় কোন জেলার কী দশা।

মালদায় রাজ্য গেমস করতে গিয়ে একেবারে ল্যাজেগোবরে বাংলা অলিম্পিক সংস্থা ও মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ক্ষতের মতো ফুটে উঠেছে কর্তাদের ব্যর্থতা। নিয়ম হচ্ছে, প্রতিদিনই পদকতালিকা প্রকাশ বাধ্যতামূলক। হায় মালদা, সেটাই সেখানে মেলেনি। বোঝা কঠিন, কোন জেলা ভালো করল, কোন জেলা ব্যর্থ। গেমস শেষ সেই ১০ এপ্রিলে। এতদিনেও স্থানীয় সংগঠকরা চূড়ান্ত পদকতালিকা পাঠাতে পারেননি রাজ্য অলিম্পিক সংস্থায়।

বিওএ কর্তারা আরও সরেস। তাঁরা মালদা গেমসের চেয়ারপার্সন করেছিলেন স্বরূপ বিশ্বাসকে। টালিগঞ্জে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ শেষ করে স্বরূপ এবার মহান দায়িত্ব নিয়েছেন বাংলার খেলাকে ডোবানোর। এমনিতে তিনি আইএফএ-র ভাইস প্রেসিডেন্ট। পদের

গুরুত্ব কিছু নেই। তাতে কী হয়েছে? সাম্প্রতিক অতীতে মুখ্যমন্ত্রীর দাদা-ভাই যেমন নিজেরা ঝগড়া করে বাংলার খেলার মারাত্মক ক্ষতি করেছেন, ক্রীড়ামন্ত্রীর ভাইও সে পথে হাঁটছেন। কীসের মধুর টানে ইনি রাতারাতি খেলাপ্রেমী হলেন, তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের জানা উচিত। মুখ্যমন্ত্রীর দাদার খেলার প্রেম তবু বহুযুগের। এবং স্বরূপদের ক্ষমতার অভিধানে ধৈর্য বলে কিছু নেই। তিন বছরে প্রেসিডেন্ট হতে চাইবেন কোনও সংস্থার। সিনেমায় যে টান পড়িয়াছে! সমস্যা হল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসল খবরই পৌঁছায় না।

বিওএ কর্তাদেরও বলিহারি, তাঁরা কীভাবে রাজ্য গেমস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোককে এত বড় দায়িত্ব দেন? এখানেও শুনলাম, ভোটের খেলা। বিওএ-তে মুখ্যমন্ত্রীর দাদা-ভাইয়ের যুদ্ধে স্বরূপ এবং বিশ্বরূপ দে বড় ভূমিকা নেন দাদাদের জেতাতে। তাই পুরস্কার। বিশ্বরূপ-সৌরভের আগের ঝামেলা নেই। না মিটলে বিশ্বরূপকে সিএবি নির্বাচনে সাহায্য করা হত। এবার তাঁকে জাতীয় গেমসে দায়িত্ব দিয়েছিল বিওএ।

রাজ্য গেমসের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলোর দিকে এখনও যাইনি। মালদায় যে প্রতিযোগীরা গিয়েছিলেন, তাঁদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। খাবার দেখলে চোখে জল এসেছে। জল পর্যন্ত ছিল না প্রথম দিকে। বাথরুমে যেতে হয় গ্লাসে জল নিয়ে। থাকার অনেক জায়গায় খড় পেতে শোয়া। ১৯৭১ সালের বিখ্যাত 'ধন্যি মেয়ে' ছবিতে ফুটবলাররা গ্রামে খেলতে গিয়ে খড়ের ওপর ঘুমোতেন। ৫৪ বছর পরেও এমন দশা। অনেক তরুণ ছেলেমেয়েকে দেখেছি রাতে মালদার রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভালো খাবারের খোঁজে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাথা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বা স্বরূপ বিশ্বাসদের কোনও মাথাব্যথা দেখিনি। মাথাব্যথা দেখিনি, সফল ক্রীড়াবিদদের নামগুলো সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরতে। তা হলে কী লাভ রাজ্য গেমস করে?

স্বরূপ-কৃষ্ণেন্দুর যুগলবন্দির গেমসে জেলাগুলো যেমন পদকতালিকায় অবস্থান জানাতে পারেনি, চ্যাম্পিয়নরা জয়ের সার্টিফিকেট পর্যন্ত পাননি। আজও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওগুলো পেতে। গেমসের হিসেবের তো কোনও পিতামাতা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বিওএ অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান) ও ক্রীড়ামন্ত্রীর ভাইয়ের এত বোঝাপড়ার অভাব ভাবলেও অবাক লাগে।

শুনলাম, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে গেমস চলাকালীন ৫ এপ্রিল কলকাতায় বিওএ অফিসে গিয়েছিল একটা হিসেব। সেখানে দাবি ছিল, খরচ ৪৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩০০ টাকা। এমন অগোছালো, অরাজকতার গেমসে এত খরচ কী পথে হয়, প্রশ্নে বিওএ অফিসে তোলপাড়। আগে কোনও গেমসে এত খরচ হয়নি। অথচ অধিকাংশ অ্যাথলিটের দিনে ভাত-সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি-ডাল-টকদই জুটেছে। ওই হিসেবে চোখ বুলিয়ে দেখি, ভিআইপিদের (কারা এঁরা?) থাকার খরচ ২১ লক্ষ ৩৭০০ টাকা, মাঠের প্রস্তুতিতে ৫ লক্ষ ৭৬০০ টাকা, প্যান্ডেল ৫ লক্ষ ২০ হাজার, বিদ্যুৎ ৪ লক্ষ ৭০ হাজার, পানীয় জল ২ লক্ষ ৫ হাজার, ফ্লেক্স-হোর্ডিং ৫ লক্ষ ৩০ হাজার।

একজন তারকাও কিন্তু যাননি। জাতীয় গেমসে বাংলার সফলরাও। রাজনীতির মাথারা খেলায় জড়িয়ে থাকলে কিছু করার নেই। অনেক অনুনয়-বিনয় করায় টাকার অঙ্ক এক লাফে ৪৩.৩৬ লক্ষ থেকে ৩৬.৯৯ লক্ষে নেমেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিই এত খরচ হলে এক ধাক্কায় এত কমে কী করে? এ তো আর শিক্ষকদের কাছে টাকা নিয়ে চাকরির প্রস্তাব নয় যে, দরদাম করলেই কমে যায়।

২২ এপ্রিল ২০২৫ মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব (এই পদে এমন রাজনীতিক কেন) হিসেবে কৃষ্ণেন্দু যে হিসেব দেন, তাতে ৩৬ লক্ষ ৯৯ লক্ষের মধ্যে কোথায় কী খরচ শুনবেন? ফের কপালে উঠবে চোখ। বিছানা, বালিশ, বেডশিট ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৯০০ টাকা। প্যান্ডেল-চেয়ার-টেবিল ৭ লক্ষ ২৫ হাজার। মাইক ২ লক্ষ ৯০ হাজার। ডিজি ২ লক্ষ ৫০ হাজার। জেনারেটর ১ লক্ষ ৫০ হাজার। মেটাল হ্যালোজেন দেড় লক্ষ। মাহেশ্বরী ভবন ৬৬ হাজার। হোটেল ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৯০০। গেট ৩ লক্ষ। বড় ফ্লেক্স ৮০ হাজার। ছোট ফ্লেক্স ৯১ হাজার ২০০।

হিসেবের নীচে আলাদা করে সংযোজন কিছু খরচ। বাস ও জ্বালানির ২ লক্ষ ১০ হাজার। বাস, গাড়ি মিলিয়ে আবার ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার। খাবারের ৩৭ লক্ষ। পরিবহণ ও খাবারের খরচ কৃষ্ণেন্দু বহন করবেন বলে নোটে বলা হয়েছে। তাদের দাবি, বিওএ দিয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ। দ্বিতীয় দাবি, ৯ এপ্রিল প্রথম বাজেট দেওয়া হয়েছিল ৩০ লক্ষের। এত বিলের বিস্তারিত তথ্য কিন্তু বিওএ পায়নি এই লেখা পর্যন্ত।

বিওএ-র এক কর্তা আক্ষেপ করলেন, 'আগে উত্তরবঙ্গে গেমস করে আমাদের লাভ হয়েছিল। এখন তো স্পনসর থাকলেও শুধু ক্ষতি।' একবার কোচবিহারের রবি ঘোষ, মালদার তপন শিকদার খেলা ভালোবেসে কোনও টাকা না নিয়ে গেমস করেছিলেন দু'বার। নিজেদের উদ্যোগে। জিটিএ-র মতো সংস্থা নিজেরা দু'লাখ টাকা দিয়েছিল বিওএ-কে। এখন উলটপুরাণ।' বিওএ কর্তার বিস্ময়, মমতা-অরূপের ছবি দেওয়া গেটগুলো তো স্পনসরড। তা হলে তার জন্যও টাকা দেখানো কী করে?

আরও আছে ভাই। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল, অব্যবস্থার প্রতীক মালদা গেমসের জন্য অনেক বিশেষ টি শার্ট হয়েছিল। কলকাতা-মালদায় সে সব বিতরণ করল কারা, কোথায়ই বা করল, কেউ জানে না। অনেক শার্ট চলে গিয়েছে নিউ আলিপুরের ক্লাবে। খেলার অনেক দামি অ্যাপারেটাস কলকাতা থেকে মালদা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল টাকা খরচ করে। সেসব জিনিসপত্র দীর্ঘদিন মালদায় পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। ফেরানোর কোনও চেষ্টাই ছিল না।

তবে নিরাশা জনক এত খবর থাকলেও এর মধ্যে ভালো খবরও আছে। এখন কবাডির সঙ্গে সঙ্গে **খোখোর**ও বিশ্বকাপ হচ্ছে। ভারত বিশ্বকাপ জিতছে **রোল বলের** মত অনামী খেলাতেও। যারা এইসব খেলায় অংশ নিচ্ছে তারা খুব সহজেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে

পারছে আর সেই সঙ্গে পাচ্ছে স্বর্ণপদক। যা তাদের সরকারি চাকরি পেতে সাহায্য করছে। যেখানে সাধারণ মানুষ পাকাপাকি সরকারি চাকরি পাচ্ছে না।

তবে শুধু খেলোয়াড় নয়। যারা খেলা ভালবাসে যেমন, একটি মেয়ে ভীষণ ক্রিকেটের ফ্যান। ক্রিকেটের নানান পরিসংখ্যান তার মুখস্ত। সে এখন আইপিএলে পরিসংখ্যানবিদের কাজ করে তিন মাসেই কোটি টাকার উপর রোজগার করছে। এছাড়া নানান ধরনের সাপোর্টিং স্টাফ যারা নিজেরা খেলছে না কিন্তু খেলায় সহযোগিতা করেছে তারা খুব ভালো মতোই উপার্জন করতে পারছে।

খেলা নিয়ে পড়াশোনারও এখন অনেক সুযোগ-সুবিধা খুলে গিয়েছে। দেশে খেলার পাঁচ পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে গিয়েছে। সেখানেও নানান রকম পড়াশোনা বা পেশা তৈরির সুযোগ রয়েছে। তাই খেলা এখন আর শুধুমাত্র বিনোদন নয় খেলা অনেকের ভবিষ্যতও গড়ে দিতে পারে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের কাণ্ডকারখানা

ফালকাও

আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বের সবচাইতে বড় প্রদর্শনী অলিম্পিক্স কে ছাপিয়ে গেছে বিশ্বের সবচাইতে জনপ্রিয় ক্রীড়া ফুটবলের বিশ্বকাপ। যার জন্য বিশ্বের অজস্র অনুরাগী প্রতি চারবছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। বিশ্বের ২২ টি দেশ এখন অবধি বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে। ২০০২ এ প্রথম জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে আয়োজন করে। এবার ২০২৬ এ আয়োজন করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা তিনটি দেশ মিলে ১৬ টি শহরে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১, মেক্সিকো ৩ ও কানাডা ২)। এরআগে মেক্সিকো ১৯৭০ ও ১৯৮৬ তে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৪ তে এককভাবে বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করেছিল। ১৯ জুন ২০২৬ মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজটেকা স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান এবং মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন হয়। ১৯ জুলাই ফাইনাল হল নিউ ইয়র্ক -নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে।

১৯৩০ থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে ২০২৬ এর বিশ্বকাপের আগে অবধি মাত্র আটটি দেশ বিজয়ী হতে পেরেছে। ব্রাজিল পাঁচ বার, জার্মানি ও ইতালি চার বার করে, আর্জেন্টিনা তিন বার, উরুগুয়ে ও ফ্রান্স দুবার করে এবং ইংল্যান্ড ও স্পেন এক বার করে। প্রাক্তন ফুটবল ফেডারেশন সভাপতির নামে ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ অবধি চ্যাম্পিয়ন ট্রোফি টিকে বলা হত জুলে রিমে ট্রোফি। ১৯৫৮, '৬২ ও '৭০ এ তিনবার জিতে ব্রাজিল চিরকালের জন্য এটির অধিকারী হয়। তারপর থেকে নতুন ট্রোফি টির নাম হয় ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রোফি। ইভেন্ট টির নাম হয় 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ'। স্প্যানিশে 'কোপা মুন্ডিয়াল ডি লা ফিফা' এবং ফ্রেঞ্চ এ 'কুপে দু মুণ্ডে ডি লা ফিফা'।

এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৮। তার মধ্যে এশিয়া-অস্ট্রেলেশিয়া অঞ্চল থেকে (নিয়ামক সংস্থা: AFC) নয়টি দেশ, আফ্রিকা থেকে (CAF) ১০ টি দেশ, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে (CONCACAF) ছয়টি দেশ, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে (CONMEBOL) ছয়টি দেশ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে (OFC) একটি দেশ এবং ইউরোপ থেকে (UEFA) ১৬ টি দেশ বিশ্বকাপ নির্ধারক আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। ইতালির মত ফুটবলের মহাশক্তি এবার নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে নি। আঞ্চলিক নিয়ামক সংস্থা গুলি ফিফার অধীন এবং সহযোগী। ফিফা (FIFA) পুরো কথাটা 'ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনস'। ১৯০৪ এ প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার বর্তমান সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ড এর জুরিখে। এই ধনী সংস্থার বর্তমান সম্পদ ৬,৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৩-'২৬ বিশ্বকাপ পর্যায়ে প্রকল্পিত রাজস্ব ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফিফার সর্বোচ্চ নিয়ামক কাঠামো ফিফা কংগ্রেস ২১১ টি সদস্য দেশের প্রতিনিধি সম্বলিত। এছাড়াও কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য রয়েছে ফিফা কাউন্সিল, জেনারেল সেক্রেটারিয়েট সহ বিভিন্ন বিভাগ। ২০১৬ থেকে ফিফার প্রেসিডেন্ট রয়েছেন বর্তমানে ৫৬ বছর বয়সী সুইস-ইতালিয়ান জিয়ানি ইনফানতিনো।

ফিফা আয়োজিত এই বিশ্বকাপে তিন আয়োজক দেশের রাষ্ট্র প্রধানের উপস্থিতিতে করা লটারিতে ৪৮ টি দেশ নিম্নলিখিত ১২ টি গ্রুপে বিভক্ত হয়:

(১) গ্রুপ 'এ': মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র

(২) গ্রুপ 'বি': কানাডা, সুইজারল্যান্ড, বসনিয়া অ্যাণ্ড হার্জেগোভিনা ও কাতার

(৩) গ্রুপ 'সি' : ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ড ও হাইতি

(৪) গ্রুপ 'ডি': মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, প্যারাগুয়ে ও তুরস্ক

(৫) গ্রুপ 'ই': জার্মানি, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েদর ও কুরাকাও

(৬) গ্রুপ 'এফ': দ্যা নেদারল্যান্ডস, জাপান সুইডেন ও তিউনিশিয়া

(৭) গ্রুপ 'জি': বেলজিয়াম, ইজিপ্ট, ইরান ও নিউজিল্যান্ড

(৮) গ্রুপ 'এইচ': স্পেন, কেপ ভার্দে, উরুগুয়ে ও সৌদি আরব

(৯) গ্রুপ 'আই': ফ্রান্স, নরওয়ে, সেনেগাল ও ইরাক

(১০) গ্রুপ 'জে': আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া ও জর্ডান

(১১) গ্রুপ 'কে': কলম্বিয়া, পর্তুগাল, ডি আর কঙ্গো ও উজবেকিস্তান

(১২) গ্রুপ 'এল': ইংল্যান্ড, ঘানা, ক্রোয়েশিয়া ও পানামা

এবারের বিশ্বকাপের নতুনত্ব ছিল: (১) দুই অর্ধের মাঝামাঝি তিন মিনিটের হাইড্রেশন ব্রেক, (২) প্রতি ম্যাচে সর্বাধিক পাঁচ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় পরিবর্তনে (অতিরিক্ত সময় খেলা চললে সর্বাধিক ছয় জন) সময় হ্রাস (সর্বাধিক ১০ সেকেন্ড), (৩) গোল কিক, থ্রো ইনে সময় নষ্ট আটকানো (পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে), (৪) কোন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে আহত বা অসুস্থ হলে দ্রুত মেডিকেল টিমের মাধ্যমে মাঠের বাইরে শুশ্রূষার জন্য নিয়ে যাওয়া এবং মাঠে ফেরার ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক মিনিট গ্যাপ রেখে ফেরা, (৫) নিখুঁত সিদ্ধান্তের জন্য VAR (Video Assistant Referee) এর পরিধি বৃদ্ধি, (৬) লিপ রিডিং আটকে মুখ ঢাকা দিয়ে প্রতিপক্ষ কে অপশব্দ বলার ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ ইত্যাদি।

এবার অ্যাডিডাস এর যে ট্রিয়ন বলে খেলা হচ্ছে তাতে মাইক্রোচিপ লাগানো থাকছিল ম্যাচের সূক্ষ্মতম গতিবিধি জানার জন্য। বলগুলিতে হাওয়া দেওয়ার পরিবর্তে ৯০ মিনিট ধরে ওয়ারলেস চার্জে বসাতে হত। ঐ বলে টানা ছয় ঘন্টা খেলা সম্ভব। খেলোয়াড়দের বুট সরবরাহকারী নাইকে, অ্যাডিডাস এবং পুমা বৃহৎ ক্রীড়া সরঞ্জাম সংস্থাগুলি সুস্পষ্ট টেলি সম্প্রচারের জন্য সমস্ত বুটের রঙ গোলাপি করে দিয়েছিল।

এবার টুর্নামেন্টের প্রধান স্পনসর অ্যাডিডাস, অ্যারামকো, কোকা কোলা, হুন্ডাই কিয়া, লেনোভো, কাতার এয়ারওয়েজ, ভিসা এবং আরও অনেক বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থা এবং টুর্নামেন্ট জুড়ে এদের প্রবল দাপট। স্টেডিয়ামে র মধ্যে কেবল কোকা কোলা, ম্যাকডোনাল্ডস, লেস প্রমুখ স্পনসর সংস্থাই খাদ্য পানীয় বিক্রি হচ্ছিল এবং সর্বত্র তাদের লোগো ও প্রচার।

প্রতিটি গ্রুপে প্রত্যেক দেশের মধ্যে খেলা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক দেশ কে তিনটি করে ম্যাচ খেলতে হয়েছে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন নির্ধারিত শহরের নির্ধারিত স্টেডিয়ামে। প্রতি গ্রুপে ছয়টি করে মোট ৭২ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জিতলে তিন পয়েন্ট, ড্র করলে এক পয়েন্ট, হারলে শূন্য এইভাবে গ্রুপ এ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারিত হয়েছে। এরপরও কোন দুটি দলের পয়েন্ট সমান হলে গোল পার্থক্য দেখা হয়েছে। তারপরও পয়েন্ট সমান হলে কোন দলের কতজন হলুদ ও লাল কার্ড কতবার দেখেছেন ইত্যাদি সূচক দেখার সিদ্ধান্ত ছিল।

গ্রুপ লীগে বেশ কিছু অঘটন ঘটেছে। ইকোয়েদর জার্মানিকে পরাজিত করেছে এবং ইজিপ্ট বেলজিয়ামের সঙ্গে, কেপ ভার্দে স্পেন ও উরুগুয়ের সঙ্গে, ডি আর কঙ্গো ও কলম্বিয়া পর্তুগালের সঙ্গে, ঘানা ইংল্যান্ডের সঙ্গে এবং জাপান দ্য নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনের সঙ্গে ড্র করেছে। সেনেগাল ফ্রান্সকে একটি ও নরওয়েকে দুটি, জর্ডান আর্জেন্টিনাকে একটি এবং মরক্কো ব্রাজিল কে একটি করে গোল দিতে সক্ষম হয়েছে। বড় দলের মধ্যে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনা ধারাবাহিকভাবে সফল। স্টারদের মধ্যে সফল মেসি, হালান্ড, এম ' বাপে, দেম্বেলে প্রমুখ। এরমধ্যে হ্যাটট্রিক সহ প্রতি ম্যাচে গোল সহ ছয়টি গোল দিয়ে মেসি গ্রুপ লিগে সর্বাধিক গোলদাতা। খেলেছেনও সারা মাঠ জুড়ে ফুল ফুটিয়ে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া - আলজিরিয়া ৩ - ৩ ড্র এর ম্যাচ ফিক্সিং করে ইরানকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ এসেছে। ৯১ মিনিটে দ্যাভিশন সানচেজের হেডে পর্তুগালের বিরুদ্ধে করা গোল বাতিল করে কলম্বিয়া কে পরাজিত করার অভিযোগ উঠেছে। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ভিনিসিয়াসের গোল বাতিল করা নিয়েও রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকেছে।

এবার প্রতিটি গ্রুপ থেকে প্রথম স্থানাধিকারী দুটি দল নিয়ে ২৪ টি দল এবং ১২ টি গ্রুপের থেকে প্রথম আটটি তৃতীয় দল মোট ৩২ টি দল পরবর্তী নক আউট পর্যায়ে পৌঁছেছে। যে ৩২ টি দল পরবর্তী নক আউটে পৌঁছেছে তারা হল: (১) মেক্সিকো, (২) দক্ষিণ আফ্রিকা, (৩) সুইজারল্যান্ড, (৪) কানাডা, (৫) বসনিয়া অ্যাণ্ড হার্জেগোভিনা, (৬) ব্রাজিল, (৭) মরক্কো, (৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (৯) অস্ট্রেলিয়া, (১০) প্যারাগুয়ে, (১১) জার্মানি, (১২) আইভরি কোস্ট, (১৩) ইকুয়েদর, (১৪) দ্যা নেদারল্যান্ডস, (১৫) জাপান, (১৬) সুইডেন, (১৭) বেলজিয়াম, (১৮) ইজিপ্ট, (১৯) স্পেন, (২০) কেপ ভার্দে, (২১) ফ্রান্স, (২২) নরওয়ে, (২৩) সেনেগাল, (২৪) আর্জেন্টিনা, (২৫) অস্ট্রিয়া, (২৬) আলজিরিয়া, (২৭) কলম্বিয়া, (২৮) পর্তুগাল, (২৯) ইংল্যান্ড, (৩০) ক্রোয়েশিয়া, (৩১) ঘানা এবং (৩২) ডি আর কঙ্গো।

নক আউট পর্ব থেকে আরম্ভ হল আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ৩২, ১৬, ৮, ৪, ২ মোট পাঁচটি নক আউট পর্যায়। ম্যাচ ড্র হলে অতিরিক্ত সময়, তাতেও না হলে টাই ব্রেকার, তাতেও না হলে সাডেন ডেথ যতক্ষণ না কেউ জিতছে। ম্যাচের ক্লান্তি, চোট আঘাত, বিস্তর ট্রাভেল, এতদঞ্চলের আবহাওয়া ইত্যাদির মধ্যে, মানসিক শক্তি ও খেলার ফর্ম ধরে রেখে, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আটটি ম্যাচ খেলে তারপর ফাইনালে পৌঁছনো খুব কঠিন ব্যাপার।

৩২ এর নক আউটে রুদ্ধশ্বাস একেকটি ম্যাচে কানাডা ১-০

গোলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে, ব্রাজিল ২-১ গোলে জাপানকে, প্যারাগুয়ে ৫-৪ গোলে জার্মানিকে, মরক্কো ৪-৩ গোলে দ্য নেদারল্যান্ডসকে, নরওয়ে ২-১ গোলে আইভরি কোস্টকে, ফ্রান্স ৩-০ গোলে সুইডেনকে, মেক্সিকো ২-০ গোলে ইকুয়েদরকে, ইংল্যান্ড ২-১ গোলে ডি আর কঙ্গোকে, বেলজিয়াম ৩-2 গোলে সেনেগালকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২-০ গোলে বসনিয়াকে, স্পেন ৩-০ গোলে অস্ট্রিয়াকে, পর্তুগাল ২-১ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে, সুইজারল্যান্ড ২-০ গোলে আলজিরিয়াকে, ইজিপ্ট ৫-৩ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে, আর্জেন্টিনা ৩-২ গোলে কেপ ভার্দেকে এবং কলম্বিয়া ১-০ গোলে ঘানাকে পরাজিত করে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। এর মধ্যে কিছু নির্ধারিত সময়ে, কিছু অতিরিক্ত সময়ে, কিছু ট্রাইব্রেকারে এবং প্যারাগুয়ে-জার্মানি ম্যাচটি সাডেন ডেথে মীমাংসা হয়।

বহু অঘটনই ঘটে যায় যেমন ফুটবল দৈত্য জার্মানি ও দ্য নেদারল্যান্ডস এর পরাজয় ও বিদায় এবং প্যারাগুয়ে ও মরক্কোর জয়। আইভরি কোস্ট, ডি আর কঙ্গো, সেনেগাল আগে গোল দিয়ে দুর্দান্ত খেলে জিতে থেকেও অভিজ্ঞতার অভাবে শেষে হেরে যায়। মেসি, এম বাপে, হালান্ড, ভিনিশিয়াস, কেন যথারীতি গোলের মধ্যে থাকেন। ফ্রান্সের ওলিজে, বারকোলা, দুয়ে নতুন নায়ক হিসাবে উঠে আসেন। প্যারাগুয়ে ও কঙ্গোর গোলরক্ষক গিল ও পাসি অবিশ্বাস্য সব সেভ করেন, যেমন প্রশংসিত হন কেপ ভারদের বর্ষীয়ান গোলরক্ষক জোজিনহো। অন্যদিকে শেষ মুহূর্তে সেনেগালের বিরুদ্ধে পেনাল্টি দিয়ে বেলজিয়ামকে এবং অফ সাইডের অভিযোগে ক্রোয়েশিয়ার তিনটি গোল বাতিল করে এবং একটি পেনাল্টি দিয়ে সি আর সেভেনের পর্তুগালকে জেতানোর অভিযোগ আসে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে কেপ ভার্দের বিপক্ষে মেসির গোলটিও ছিল অফসাইড থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর এই গরমে এতদিন ধরে এতগুলি ম্যাচ খেলার ধকল খেলোয়াড়দের মধ্যে চোখে পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যখন আধুনিক ক্রীড়ার এই মহাযজ্ঞ চলছে তখন বিশ্বজুড়ে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর নেতৃত্বেই চলছে বিভিন্ন আঞ্চলিক যুদ্ধ, শুল্ক যুদ্ধ এবং চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অস্থিরতা। রাশিয়া - ইউক্রেন, মার্কিন- ইরান, ইজরায়েল- হেজবোল্লা, পাকিস্তান - আফগানিস্তান, মায়ানমার, আফ্রিকার সাব-সাহারান ও সাহেল দেশগুলিতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ চলছে। ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের পর নতুন লক্ষ্য কিউবা। ভেনেজুয়েলা সহ বিভিন্ন প্রান্তে ভয়াল সব প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ ও বিপর্যয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও অভিবাসীদের নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের witch hunting। এই বিশ্বকাপেও ইরান এবং বেশ কিছু আফ্রিকান দেশ ভিসা ইত্যাদির সমস্যায় পড়েছে।

এছাড়াও ঘটে চলেছে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ। ১৬ টি শহরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলা চলায় প্রচুর বিমান ভ্রমণ, জ্বালানি খরচ ও দূষণ। শুধু গ্রুপের তিনটি ম্যাচ খেলতেই ইংল্যান্ড দল, সপোর্ট স্টাফ, সাংবাদিক, ফিফা অফিসিয়াল, প্রচুর সমর্থক কে ১৭২১ মাইল করে বিমান যাত্রা করতে হয়েছে। এই বিপুল কার্বন নিঃসরণ প্রচুর ক্ষতি। এছাড়াও সম্প্রচার, স্ট্রিমিং, ডেটা ফিড, বেটিং সেন্টার, ডেটা সেন্টার, স্যাটেলাইট, অসংখ্য দর্শকের যাবতীয় বৈদ্যুতিন যন্ত্র—সব কিছুতেই প্রয়োজন বিপুল শক্তির। ডিজিটাল ফুট প্রিন্ট তো দূরের কথা পরিবেশ রক্ষা নিয়ে ফিফাও বহুজাতিক বাণিজ্যিক দৈত্যদের প্রভাবে নির্বিকার।

১৬ নক আউট বা প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে কানাডা–মরক্কো ম্যাচে কানাডা দ্রুতগামী ফুটবলে প্রবল আক্রমণ শুরু করে এবং অনেকগুলি গোলের সুযোগ হাতছাড়া করে। অভিজ্ঞ মরক্কো খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করে ধীর করে দেয়। তারপর দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের রাশ নিয়ে তিনটি গোল দিয়ে ৩–০ তে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়। ফ্রান্স– প্যারাগুয়ে ম্যাচে ফ্রান্সের ঢেউয়ের মত আক্রমণ প্যারাগুয়ে রক্ষণে ভিড় বাড়িয়ে রুখে দিতে থাকে। এছাড়া এম'বাপেকে কড়া ট্যাকলিং ও ফাউল করে তাঁর খেলার ছন্দ নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে। শেষে পেনাল্টি বক্সে এম'বাপেকে ফাউল করায় ফ্রান্স একটি পেনাল্টি পায় এবং সেটি থেকে গোল দিয়ে এ'মবাপে ফ্রান্স কে ১–০ গোলে জিতিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দেন। ব্রাজিল–নরওয়ে ম্যাচে আবার প্রমাণ হল গতানুগতিক রক্ষণভাগ আর বেশিক্ষণ বলপায়ে রেখে ধীরলয়ের ব্রাজিলের এই ফুটবল শক্তিশালী ইউরোপীয় দলগুলির শক্তিশালী রক্ষণব্যবস্থা, প্রবল শারীরিক সক্ষমতা এবং দ্রুতগামী প্রতি আক্রমণমূলক আধুনিক লক্ষ্যভেদী ফুটবলের সঙ্গে পেরে উঠছে না। একদা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল পরপর ছয়টি বিশ্বকাপে ব্যর্থ। তাছাড়া এদিন একটি পেনাল্টি সহ গোলের প্রচুর সহজ সুযোগ তারা মিস করে। বিপরীতে নরওয়ে প্রাধান্য নিয়ে দ্রুতগামী ফুটবল খেলে। তাদের ৬'৫" দীর্ঘ তারকা স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ড ম্যান মারকিং এর মধ্যেও দ্বিতীয়ার্ধে ঠাণ্ডা মাথায় দুটি চোখ জোড়ানো গোল উপহার দেন। নরওয়ের গোলরক্ষক অরজান নিল্যান্ড কয়েকটি অবধারিত গোল বাঁচান। ২–১ গোলে জিতে নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়। ইংল্যান্ড–মেক্সিকো খেলাটি প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় ও উপভোগ্য হয়। মেক্সিকো বেশ কিছু গোলের সুযোগ নষ্ট করে। ইংল্যান্ডের ফিনিশিং ছিল ভাল। তারা ৩–২ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়। ইংল্যান্ডের হয়ে বেলিংহাম দুটি এবং কেন একটি গোল করেন।

ফুটবলের দুই মহারথী দুই ইউরোপীয় প্রতিবেশী দেশ স্পেন ও পর্তুগালের ম্যাচ আক্রমণ প্রতিআক্রমণের তীব্র লড়াই এ উপভোগ্য

হয়ে ওঠে। পর্তুগালের আধিপত্য ছিল বেশি যদিও সি রোনাল্ডো এদিনও অফ ফর্মে থাকেন। শেষ মুহূর্তে ইনজুরি টাইমে করা গোলে স্পেন ১–০ গোলে পর্তুগাল কে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যায়। বেলজিয়াম–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের আগে আরেকটি কাণ্ড ঘটে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো কে লাল কার্ড দেখা মার্কিন ফুটবলার বালোগুনের শাস্তি তুলে নিতে বলেন। ফিফা নজিরবিহীনভাবে বালোগুনের শাস্তি তুলে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের দেশের মাঠে লড়াকু ফুটবল খেললেও অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বেলজিয়াম খেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং দুই অর্ধে দুটি করে গোল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কে ৪–১ এ হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পোঁছয়। চোটের জন্য সুপার সাব হিসাবে খেলা বেলজিয়ামের বর্ষীয়ান স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু এদিনও একটি গোল করেন। আর্জেন্টিনা–ইজিপ্ট ম্যাচ টি ছিল সবচাইতে উত্তেজক। সালে, জিজো দের নেতৃত্বে দ্রুতগামী ফুটবল খেলে ইজিপ্ট আর্জেন্টিনার রক্ষণ কে তছনছ করে দেয়। তাদের ইব্রাহিম ও জিকো দুই অর্ধে একটি করে চমৎকার গোল দেন। ইজিপ্টের করা একটি গোল ভারের মাধ্যমে বাতিল হওয়ায় বিতর্ক হয়। মেসি এদিন তার এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস করেন। শেষ ১৩ মিনিট ঘুরে দাঁড়িয়ে আর্জেন্টিনা তিনটি গোল করে ৩–২ এ ম্যাচ জিতে যায়। মেসি আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় গোলটি করেন। যদিও ইজিপ্ট আর্জেন্টিনার প্রথম গোল অফসাইডে এবং পেনাল্টি বক্সে সালাকে ফাউল করা সত্ত্বেও পেনাল্টি না দেওয়া নিয়ে অভিযোগ করে। কলম্বিয়া–সুইজারল্যান্ড ম্যাচে দুপক্ষের রক্ষনাত্বক কৌশলের খেলার মধ্যেও কলম্বিয়া প্রাধান্য রাখলেও গোল মিস করায় খেলা গোলশূন্য হয়ে শেষ হয়। ট্রাইব্রেকারে সুইজারল্যান্ড ৪–৩ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যায়।

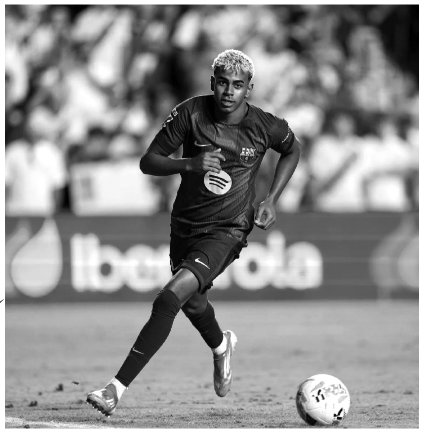

কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য রেখে ফ্রান্স ২–০ গোলে মরক্কো কে হারায়। প্রথমার্ধে একটি পেনাল্টি মিস করলেও দ্বিতীয়ার্ধে এম'বাপে একটি অসাধারণ গোল করেন। তারপরেই আরেকটি চমৎকার গোল দেন দেম্বেলে। ইউরোপের দুই বড় ফুটবল শক্তি স্পেন ও বেলজিয়ামের মধ্যে খেলা খুবই প্রতিদ্বন্দিতাময় হয়। খেলায় স্পেনের প্রাধান্য ছিল। সুপার সাব মেরিনো এদিনও স্পেনের হয়ে শেষ লগ্নে দ্বিতীয় গোল করেন। স্পেনের তরুণ তারকা লেমিনে ইয়ামাল এদিন চমৎকার খেলেন। স্পেন ২–১ এ বেলজিয়ামকে হারায়। নরওয়ে–ইংল্যান্ড ম্যাচে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আগ্রাসী দ্রুতগামী নরওয়ে কে পাওয়া যায়না। হাল্যান্ড কে ইংলিশ রক্ষণ বোতলবন্দী করে রাখে। ইংল্যান্ড ক্রমশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তথাপি শেল্ডেরুপের একটি দুর্ধর্ষ গোলে নরওয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। দ্রুত গোল শোধ করে দেন ইংল্যান্ডের তারকা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। অতিরিক্ত সময়ে এই বেলিংহামের গোলে ইংল্যান্ড ২–১ গোলে নরওয়ে কে হারায়। বেলিংহাম বিশ্বকাপের নক আউট পর্যায়ে পরপর দুটি ম্যাচে জোড়া গোল করেন। আর্জেন্টিনা–সুইজারল্যান্ড ম্যাচ নির্ধারিত সময়ে ১–১ থাকায় অতিরিক্ত সময় গড়ায়। ঐ সময় দুই গোল দিয়ে আর্জেন্টিনা ৩–১ এ সুইজারল্যান্ড কে পরাজিত করে। এদিনও আর্জেন্টিনার প্রথম গোলটি নিয়ে সুইজারল্যান্ডের অভিযোগ থাকে। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠে স্পন্সরদের চাপে এবং বাণিজ্যের স্বার্থে ফিফা মেসি ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে পক্ষপাতিত্ব করে চলেছে।

এই বিশ্বকাপের সেরা দুই দল ছিল ফ্রান্স এবং স্পেন, তার মধ্যে এম'বাপে, দেম্বেলে, ওলিসে সম্বলিত ফ্রান্স ছিল বেশি ওজনদার। কিন্তু ফ্রান্স–স্পেন সেমিফাইনালে উনাই সিমন, পেদ্রো পোরো, মার্ক কুকুরেলা, ফ্যাবিয়ান রুইজ, রদ্রি, ওলমে, ল্যামিনে ইয়ামল, মাইকেল ওয়াজারজাবাল রা এম'বাপেদের বোতলবন্দী করে এবং ছোট ছোট দ্রুত পাশ, দ্রুত জায়গা বদল এবং দ্রুত প্রতিআক্রমণের তিকিতাকা ফুটবল খেলে ফ্রান্সকে নাস্তানাবুদ করে দিল। দিদিয়ের দে'শ কে রণকৌশলে টেক্কা দিলেন লুই দে লা ফুয়েন্তা। প্রথমার্ধে পেনাল্টিতে করা একটি গোল এবং দ্বিতীয়ার্ধে যৌথ আক্রমণ থেকে করা আরেকটি গোলে ফ্রান্সকে ২–০ গোলে হারিয়ে স্পেন ফাইনালে উঠল।

অপর সেমিফাইনালে নিস্তরঙ্গ প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের প্রাধান্য ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একটি দ্রুতগামী আক্রমণে ইংল্যান্ড একটি চমৎকার গোল করে এগিয়ে যায়। এরপর আর্জেন্টিনা গোল করার জন্য ইংল্যান্ডের অর্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক হওয়ায় তাদের সুবিধা হয়ে যায়। ইনসাইডে এতক্ষণ বোতলবন্দী থাকা মেসি এবার রাইট উইঙ্গারের পজিশনে চলে গিয়ে বল নিয়ে ড্রিবলিং করতে করতে ইংল্যান্ড রক্ষণের বাম দিক থেকে একের পর এক মাপা পাশ আর ক্রশ বাড়াতে থাকেন। তার থেকে ফারনান্দেজ এবং মারতিনেজ চমৎকার শট ও হেডে দুটি গোল করে ইংল্যান্ড কে ২ -১ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে নিয়ে যান।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় গোলের ফুলঝুরি বয়ে যায়। প্রথমার্ধে ইংল্যান্ড চার গোল দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে তারা আরও দুটি এবং ফ্রান্স চারটি গোল দেয়। ইংল্যান্ড ৬–৪ গোলে জেতে। ইংল্যান্ডের তরফে সাকা হ্যাট্রিক করেন এবং রাইস, কোন্সা ও বেলিংহাম একটি করে গোল করেন। কেনকে এই ম্যাচে খেলানো হয়নি। ফ্রান্সের পক্ষে এম বাপে দুটি এবং বারকোলা ও দেম্বেলে একটি করে গোল দেন।

ফাইনালে ভরা স্টেডিয়ামের সামনে ঝলমলে রোদে প্রথমার্ধ আক্রমণ প্রতিআক্রমণে উপভোগ্য হলেও ছিল গোলশূন্য। স্পেনের প্রাধান্য এবং বল পজেশন অনেক বেশি ছিল। রদ্রির নেতৃত্বে মাঝমাঠ ও রক্ষণ মেসিদের নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল এবং ফরওয়ার্ডদের একের পর এক পাশ বাড়াচ্ছিল। কিন্তু স্পেনের ফরওয়ার্ডরা গোলমুখে

আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের ভিড়ে ঠিকমত শট নিতে পারছিলেন না। হাফ টাইমে শাকিরা, পিট বুল প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। দ্বিতীয়ার্ধে স্পেন আর্জেন্টিনাকে আরও চেপে ধরল। আর্জেন্টিনার অর্ধে পেনাল্টি বক্সে ও আশেপাশে খেলা হচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই স্পেন গোল দিতে পারছিল না। আর্জেন্টিনার গোলকিপার ইমিলিয়ানো মারতিনেজ পাহাড়ের মত গোলপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক গোল বাঁচিয়ে গেলেন। অতিরিক্ত সময়েও স্পেনের একচ্ছত্র প্রাধান্য এবং অবিশ্বাস্য সব গোল মিস। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ১০৬ মিনিটে অবশেষে এক চমৎকার যৌথ মুভ থেকে জোরালো শটে পরিবর্ত খেলোয়াড় এফ. টোরেস স্পেনের হয়ে গোল করলেন। স্পেন ১–০ তে বিজয়ী হয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল। আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের মারদাঙ্গা সত্ত্বেও এই হাই টেনশনের ম্যাচ রেফারি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করলেন।

স্পেনের মিডফিল্ডার ক্যাপ্টেন রদ্রি টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে গোল্ডেন বল পেলেন। সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়ে স্পেনের উনাই সিমন সোনার গ্লাভস পেলেন। সর্বোচ্চ ১০ টি গোল করে ফ্রান্সের এম বাপে সোনার বুট পেলেন। সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন স্পেনের ১৯ বছর বয়সী সেন্ট্রাল ব্যাক পাও কুবারসি। আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার তিন প্রেসিডেন্ট এবং ফিফার প্রেসিডেন্ট পুরস্কার দিলেন।

সব মিলিয়ে অবশ্যই ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল ছিল ঘটনাবহুল।

ফিলিপাইনস, ভেনেজুয়েলা, মায়ানমার, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক—একের পর এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ধ্বংসলীলা ও মৃত্যুমিছিলে আমরা শোকস্তব্ধ। এরপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউক্রেন, ইজরায়েল, ইরান, হেজবোল্লা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিন, উত্তর কোরিয়া আরও ক্ষতিকর পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে। জন আন্দোলনে আরাবল্লী ধ্বংস আটকানো গেলেও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পরিবেশ ধ্বংস অব্যহত।

- সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার বাজারি পুঁজির মালিক এবং বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশে ব্যবসা করা ভারতের বৃহত্তর ওষুধ কোম্পানি দিলীপ সাংভির সান ফার্মাসিউটিকাল ইনডাষ্ট্রিস লিমিটেড ১১.৭৫ বিলিয়ন ডলারে মার্কিন বৃহৎ ওষুধ কোম্পানি অরগানন অ্যাণ্ড কোম্পানিকে কিনে নিল। এটি এখন পর্যন্ত কোন ভারতীয় কোম্পানির বৃহত্তম অধিগ্রহণ।
- মার্কিন বৃহৎ নির্মাণ ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সংস্থা 'ওয়েল টাওয়ার'-এর সিইও প্রাক্তন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শঙ্খ মিত্র টেসলার সিইও ইলন মাস্কের পর বিশ্বের সবচাইতে বেতনভোগীর স্বীকৃতি পেলেন। তাঁর বার্ষিক প্যাকেজ ৭,৭৫০ কোটি টাকা।

''ঋতুকালীন স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার সংবিধানকৃত জীবনের অধিকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার তার অঙ্গ।''—সুপ্রিম কোর্ট ৩০.০১.২০২৬

''রাজনৈতিক নেতারা নাগরিকদের বলতে চাইছেন—আপনাদের মর্যাদা, উন্নত জীবিকা এবং স্থায়ী আয় নিশ্চিত করতে পারছি না। আপাতত সামান্য কিছু অনুদান নিয়ে কাজ চালিয়ে যান।''—ডি. সুব্বারাও, প্রাক্তন গভর্ণর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

''পথ কুকুরের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। সমস্ত পথকুকুরকে নির্দ্দিষ্ট শেল্টারে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে। বন্ধ্যাত্বকরণ করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যারা পথ কুকুরদের খেতে দেন পথকুকুররা কাউকে কামড়ালে তারা দায়ী হবেন। তাদের উচিৎ ঐ পথকুকুরগুলি কে নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়া।''—সুপ্রিম কোর্ট, জানুয়ারি ২০২৬

কেন্দ্র বাজেট ২০২৬-'২৭-র কিছু দিক

- প্রতিরক্ষাখাতে বাজেট ১৫.১৯% বেড়ে দাঁড়াল ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ১১%)
- বিগত আর্থিক বর্ষে সামাজিক উন্নয়নে বিপুল অর্থ খরচ করা যায়নি তাই কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ ছাঁটাই
- ১৪ লক্ষ কোটি টাকা সুদ মেটাতে ও ১৭ লক্ষ কোটি টাকা ধার মেটাতে হবে। জিডিপির তুলনায় ঋণের হার ছিল ৫৬.১%
- গত আর্থিক বর্ষে ৭৮ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়েছে
- আগামী অর্থ বছরে মোট ঋণ ২১৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে

শিল্প ও সংস্কৃতি

ফিওদর দস্তভয়েস্কি ও তাঁর ব্রাদার্স কারামাজভ

নাসির আহমেদ

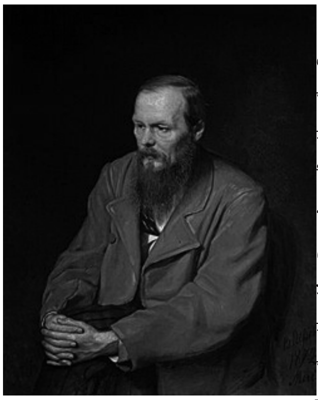

এ বঙ্গে পাঁচ দশক আগে একটা সময় গিয়েছে, যখন তরুণ প্রজন্মের মফস্‌সলের কলেজ পড়ুয়ারাও রুশ সাহিত্য নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে বিস্তর। পুশকিন, টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি ও চেখভের মতো বিশ্বখ্যাতদের সৃষ্টি বাঙালি পাঠকেরা ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদে তখন ব্যগ্র আগ্রহে পড়ছেন বা পড়েছেন। সাতের দশকে, ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদী সাহিত্যের তিন রথী আলবেয়ার কামু, ফ্রান্জ কাফ্‌কা ও জ্যাঁ পল সার্ত্রের রচনা কলকাতার পাঠক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের বাইরে মফস্‌সলে তখনও সমাদর পায়নি যতটা টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি বা তুর্গেনিভের সৃজনী আদৃত ছিল। এর একটা কারণ মস্কোর প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, যারা ইংরেজি ও বাংলায় ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যসম্ভার অনুবাদে প্রকাশ করেছিল, তাদের পরিবেশকের মফস্‌সলে ব্যবসায়িক সাফল্য। শহরের একটি পরিচিত দৃশ্য ছিল: প্রগতি প্রকাশনের এজেন্টদের ব্যাগ ভর্তি বিভিন্ন বিষয়ের বই বিশেষত সাহিত্যের পাড়া ঘুরে পরিচিতদের বাড়িতে স্বল্প দক্ষিণায় বিক্রি করা। ছয়ের দশক থেকে বামপন্থী মতাদর্শ বাংলার সাধারণ মানুষের অনিবার্য অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। তাই কমিউনিস্টদের প্রতিপোষণা যে রুশ সাহিত্যকে এ বাংলায় জনপ্রিয় করেছিল, অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া সব কিসিমের সাম্যবাদী দলের সমর্থনের কাছে লেনিনের রাশিয়ার জন্য রোমান্টিক আবেগ আজও দুর্মর। কলেজ ক্যাম্পাসে, চায়ের দোকানে আড্ডায় তুখোড় যুবকেরা একদা প্রগলভ হয়েছে ওয়ার অ্যান্ড পিসের কাউন্ট বেজুখব, আনা কারেনিনার আনা, দস্তয়েস্কির রাসকলনিখভ, দিমিত্রি কারামাজভের মতো চরিত্রদের নানা দৃষ্টিকোণী আলোচনায়। যদিও জার আমলে চিরায়ত সেইসব সাহিত্য একটা মার্কসীয় বিশ্লেষণে ছিল সামন্তবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল অতএব ব্রাত্য। আজ অবশ্য সে অপবাদ ঘুচে গেছে।

আধুনিক রুশ সাহিত্যের যখন উন্মেষ তখন ইউরোপের ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান সাহিত্য পূর্ণ বিকশিত। রুশ সাহিত্যের জাতীয় পরিচয় আলেকজান্ডার পুশকিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) হাত ধরে। এর আগে মধ্যযুগে খ্রিস্টিয় যাজকদের নীতিভাষ্য ও মৌখিক লোকসাহিত্য ছিল সাহিত্যের উপজীব্য। প্রাক পুশকিন পর্বে রুশ সাহিত্য ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের নির্জীব অনুকরণ মাত্র। ফরাসি সাহিত্যের যৌনতা, জার্মান সাহিত্যের মানবতাবাদী মরমিবাদ ও ইংরেজ রোমান্টিকতার ছাপ ছিল রাশিয়ার আত্মপরিচয়হীন সাহিত্যে। সেই সাংস্কৃতিক সংকটের সময় পুশকিন রাশিয়ার পাঠককে উপহার দেন তাঁর অমর সৃষ্টি 'ইউজিন ওনিজিন' কাব্য। ওনিজিন রুশ সাহিত্যের সেই চরিত্র যাকে দস্তয়েভস্কি আখ্যায়িত করেছেন রাশিয়ার চিরন্তন নায়ক, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। ওনিজিনের শুভ বোধ, বিবেকী মন, অনিকেত অস্তিত্ব চেতনা থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক রুশ সাহিত্যের আদর্শ চরিত্র। পুশকিনের প্রতি তাই দস্তয়েভস্কির অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার।

বঙ্গদেশে দস্তয়েভস্কির বিশেষ জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করা মুশকিল। দস্তয়েভস্কির রাজনৈতিক মানস ছিল রক্ষণশীল, খ্রিস্টধর্ম চেতনা ছিল প্রবল যা বাঙালির তর্কপ্রবণ প্রগতিবাদী সত্তায় খুব একটা সায় দেয় না। তাছাড়া টলস্টয়, যাঁর রচনা ও দর্শন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যিনি প্রতিভা ও সৃষ্টির বিচারে শেক্সপিয়ারের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে থাকেন, অনায়াসে হতে পারতেন এ বাংলার বহুল পঠিত লেখক, কিন্তু হননি হয়েছিলেন ফিওদর দস্তয়েভস্কি। সম্ভবত ইংরেজিভাষী বিশ্বে ইংল্যান্ডে, সাধারণ পাঠকের দস্তয়েভস্কি প্রীতি বাঙালি পাঠককে তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী করেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে রুশ সাহিত্যের খুব সমাদর ছিল। ওস্কার ওয়াইল্ড থেকে ডি. এইচ. লরেন্স, কনরাড থেকে জেমস জয়েস, অল্ডাস হাক্সলি সকলে রুশ সাহিত্যের শ্রেয়তা স্বীকার করেছেন। ইংরেজ পাঠকের কাছে রাশিয়ার সাহিত্য পড়া উন্নত রুচির পরিচায়ক ছিল। কিংবদন্তি হাসির লেখক পি.জি. উডহাউসের Jeeves and the Feudal Spirit উপন্যাসে শিক্ষিত খানসামা জিভ্‌স তার মনিব বার্টি উসটারকে শোনায়, তার রাশিয়ার উপন্যাস বিশেষত দস্তয়েভস্কি পড়ার বিশেষ আসক্তি আছে।

দস্তয়েভস্কি রুশ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার। পাঠক তাঁর গল্পে ক্ষণিকে আবিষ্ট হয়ে পড়েন, কারণ তাঁর আখ্যানের সুডৌল গ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণে উদ্ভাবনী বৈচিত্র্য ও মৌলিকত্ব। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় মানুষের প্রবৃত্তি, তার বেআব্রু মনোজগৎ, শুভ-অশুভ দ্বন্দ্ব ও আধুনিক জগতে নৈতিক অবস্থান। দস্তয়েভস্কির উপন্যাসশৈলী ও শিল্পচেতনা যাঁরা অনুধাবন করেছেন, অনেকের বিচারে তিনি ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে তুলনীয়। ডিকেন্সের মতো সমাজের নীচু তলার দরিদ্র ও উপেক্ষিত মানুষের প্রতি দস্তয়েভস্কির সহানুভূতি তাঁর শিল্পচেতনার অন্যতম প্রেরণা।

এটা অখণ্ডনীয় সত্য, একমাত্র দস্তভয়েস্কির উপন্যাস উনিশ ও বিশ শতকের পশ্চিমী দর্শন ও সাহিত্যের সব নিরীক্ষার ল্যাবরেটরি হয়েছে। দার্শনিক নীটশে ও ফ্রয়েড থেকে অস্তিত্ববাদী কামু, কাফ্‌কা ও সার্ত্রের গল্প উপন্যাস কাফ্‌কার স্বীকারোক্তিতে দস্তভয়েস্কি তো তাঁর রক্তের আত্মীয়, আমেরিকার হেমিংওয়ে ও উইলিয়াম ফকনার,

এমনকি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পর্যন্ত মহানেরা দস্তভয়েস্কিকে প্রণিপাত করেছেন। অবাক করা তথ্য এই, নতুন মিলেনিয়ামের জেন ছেলেমেয়েদেরও দস্তভয়েস্কির রচনার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার পৃথিবীতে, বিপন্ন অস্তিত্বের যন্ত্রণার বিচরণভূমিতে জেনZ কিশোর কিশোরীরা যেন খুঁজে পায় তাদের প্রিয় নায়ক নীচু তলার অসহায় মানুষকে। দস্তয়েভস্কির প্রতি আজকের পাঠকের বিশেষ কৌতূহলের বিষয়টি বুঝতে দুই সমসাময়িক সতীর্থ টলস্টয় ও তুর্গেনিভের প্রসঙ্গ টানতে হয়। টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি ও তুর্গেনিভের রচনা উনিশ শতকে ইউরোপীয় বাস্তববাদের চূড়ান্ত প্রকাশ। বাস্তববাদ আসলে পূর্ববর্তী রোমান্টিক যুগের আতিশয্যবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া। প্রতিদিনের যাপনের বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্রণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বাস্তবানুগ বর্ণনা, সমস্যাপীড়িত, দোষ ত্রুটিতে স্খলিত চরিত্রদের কষ্ট ও সংগ্রামের কথা ও মানবচরিত্রের মনোজগতের শিল্পিত প্রকাশে রুশ সাহিত্য পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। টলস্টয় ও তুর্গেনিভের মানবতাবাদ ও সমাজচেতনা তাদের গল্প উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' ও 'আনা কারেনিনা'তে রাশিয়ার দৃশ্যাবলী ও বিভিন্ন স্তরের সমাজ ও পরিবারের মহাকাব্যিক বিস্তৃতির আখ্যানে, তুর্গেনিভের নির্মোহে দেখা রুশ সমাজের অপ্রিয় বাস্তবের যে অনন্য শৈল্পিক প্রকাশ দেখি সেখানে দস্তয়েভস্কির উপস্থিত হয়েছেন তার চরিত্রদের মনোজগতের ঈশ্বর হয়ে। তিনি মানব মনের অনুসন্ধান করেছেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কারের মত। তাঁর উপন্যাসগুলি যেন মনোবিজ্ঞানের এক একটি টেক্সট। সেই কারণেই নীটশে বলেছিলেন তিনি মনোবিজ্ঞানের যাবতীয় পাঠ নিয়েছেন দস্তয়েভস্কির উপন্যাস থেকে। 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টে'র খুনী অপরাধী রাসকলানিকভ, 'ব্রাদার্স কারামাজভে'র উদ্বেগ আক্রান্ত মিতিয়া কারমাজভ, 'ইডিয়ট' উপন্যাসে ঈর্ষাপীড়িত রোঘজিন, দেবতার মত নিষ্কলুষ, তবু হীনতাবোধে জর্জরিত প্রিন্স মিশকিন সকলের আত্মার শুশ্রূষা করেছেন লেখক।

দস্তয়েভস্কি আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ষাট বছর (১৮২১-১৮৮১)। আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত তাঁর জীবনে দুঃস্বপ্নের মত ছিল অনিরাময়যোগ্য মৃগীরোগ। অনেকে মনে করেন তাঁর এই ব্যাধি একদিকে শাপে বর হয়েছিল। রোগের প্রত্যাঘাত থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর বিদ্যুৎ চমকের মতো দেখা দিত কল্পনা ও সৃষ্টিভাবনার বিচিত্র দিগন্তে। টলস্টয়ের মতো দস্তয়েভস্কির অভিজাত বংশের গৌরব ছিল না। চরিত্ররা তাঁরই মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা, যেখানে ভিড় করে আছে - ছাত্র, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী। রাশিয়ার সুবিশাল প্রান্তরভূমির গ্রামজীবন নয়, তাঁর গল্প উপনাসের পটভূমি শহর মূলত মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গ। মেধাবী ছাত্র দস্তয়েভস্কি ছিলেন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কৃতী ছাত্র। তবু বাধ্যতামূলক দুই বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করে তিনি সেখান থেকে ইস্তফা দেন লক্ষ্য আর স্বপ্ন ছিল লেখক হওয়ার। দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের সংখ্যা বারো, তার সঙ্গে যুক্ত চার ছোটো উপন্যাস (novella) মোট ষোলো। এদের মধ্যে তিনটি উপন্যাস Crime and Punishment, The Idiot Brothers Karamazov সর্বাধিক আলোচিত, প্রশংসিত বলা যায় লেখকের অমরত্ব নিশ্চিত করেছে।

দস্তয়েস্কির সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস- Brothers Karamazov তাঁর জীবনের সেরা রচনা। টলস্টয়ের War and Peace ততদিনে বিশ্ববিখ্যাত। ওই উপন্যাসের কথা ভেবে দস্তয়েভস্কির ইচ্ছে ছিল পাঁচ পর্বে তাঁর উপন্যাসের কাহিনি পরিসরকে বিস্তৃত করতে। শেষে দুই পর্বে প্রায় নয়শো পৃষ্ঠার এক ঠাসবুনোট থ্রিলারের মতো গতিময় এক পরিবার কাহিনি Brothers Karamazov পাঠকের কাছে পৌঁছোলো। তর্কসাপেক্ষে এই উপন্যাস দস্তয়েভস্কির শ্রেষ্ঠ রচনা। আয়ুসীমার শেষে লেখক তাঁর না-বলা ভাবনা ও কথা সব ব্যক্ত করেছেন এই উপন্যাসে। Brothers Karamazov লেখকের সারাজীবনের আচ্ছন্ন অন্বেষণ, শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বের নিরীক্ষা, তাঁর ধর্ম ভাবনা, আত্মার সংকট ও মুক্তির কথা। প্রায় পঞ্চাশটি চরিত্রের ভিড়ে মূল কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন উপকাহিনীতে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলি রাশিয়ার সমাজ ও ব্যক্তি মানসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলিত রূপ।

উপন্যাসের মূল কাহিনি সংক্ষেপে এই কারামাজভ পরিবারের প্রধান ফিওদর পাভলোভিচের চার পুত্র। তার প্রথম স্ত্রী অ্যাডেলাইভার একমাত্র পুত্র দিমিত্রি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দ্বিতীয় স্ত্রী সোফিয়ার দুই পুত্র, মধ্যম জন আইভান ও তৃতীয় আলেক্সি বা আলিওশা। চতুর্থ সন্তান স্মারডিয়াকভ যে stinky নামে নিন্দিত ফিওদরের জারজ সন্তান, পারিবারিক ভৃত্য।

ফিওদর পাভলোভিচ কারামাজভ এক ছোটো প্রাদেশিক শহরের ভূ-স্বামী, অভিজাতদের জাতে উঠতে না পারলেও যথেষ্ট বিত্তশালী। তার বিশৃঙ্খল জীবন কেটেছে যৌনাচার ও ভাঁড়ামিতে। কৃপণ ও পুত্রদের প্রতি উদাসীন পাভলোভিচ বড়ো ছেলে দিমিত্রির প্রতি ক্ষুব্ধ কারণ সে বাবার কাছে তার বিচ্ছেদ নেওয়া মা-র পারিবারিক প্রাপ্য অর্থ চায়। পাভলোভিচ দিমিত্রিকে টাকা দিতে অস্বীকার করে। দিমিত্রির বয়স সাতাশ। পাভলোভিচের আর দুই পুত্র আইভান ও আলেক্সি স্বভাবে আচরণে সম্পূর্ণ বিপরীতে। আইভান ইউরোপপ্রেমিক উচ্চশিক্ষিত, নেতিবাদী, দর্শন ও সাহিত্যের ছাত্র। আলেক্সি বিনয়ী নম্র গভীর ধর্মানুরাগী, স্বদেশের প্রতি সমর্পিত প্রাণ। আইভান মধ্যযুগের স্পেনের খ্রিস্ট বিরুদ্ধ, অপরাধ সন্ধানী যাজকের প্রশংসা করে কবিতা লিখতে চায়। ক্ষমাসুন্দর খ্রিস্টের আদর্শ তার নয়। আইভান এক পতিত আত্মা, অ্যালেক্সি করুণার আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিমিত্রি শুভ ও অশুভ বোধের দ্বন্দ্বে এক বিক্ষত প্রাণ। গূঢ়ার্থে দিমিত্রি তার চরিত্রের স্ববিরোধিতা নিয়ে সমগ্র রাশিয়ার প্রতীক।

আলেক্সির ধর্মগুরু ফাদার জোশিমা দিমিত্রি ও তার বাবা ফিওদরের তিক্ত সম্পর্কের নিরসনে মধ্যস্থতা করতে আসেন। ফিওদর রাজি হয়, তবু পুত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আর ফাদার জেশিমাকে তাচ্ছিল্য। ফাদার রুষ্ট না হয়ে পাভলোভিচ ও তার নাস্তিক পুত্র আইভানকে শোনান কিছু অপ্রিয় সত্য। দিমিত্রির জন্য বলেন তার দুঃখ, যন্ত্রণার জীবন অনিবার্য। শেষে জোশিমা অ্যালেক্সিকে বলেন, ধর্মশালার নির্জনবাস ছেড়ে জীবনের যুদ্ধে অংশ নিতে তার ভ্রষ্ট ভাইদের রক্ষার প্রয়োজনে।

দিমিত্রি তার বাবার মতোই উচ্ছৃঙ্খল ও নারী অভিলাষী, যদিও বাবার মতো সে ব্যাভিচারী নয়। সে মানসিক শক্তি পেয়েছে তার মায়ের। কৃপণ পাভলোভিচ দিমিত্রিকে তার মায়ের টাকা দিতে অস্বীকার করলে দিমিত্রি ধনী কলোনেলের কন্যা ক্যাটেরিনার সঙ্গে বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। দিমিত্রি কিন্তু ক্যাটেরিনাকে নয়, গ্রুশেঙ্কাকে ভালোবাসে যার সঙ্গ তার বাবা ফিওদরও কামনা করে। দিমিত্রি ক্যাটেরিনার কয়েক হাজার রুবল নিয়ে গ্রুশেঙ্কার সঙ্গে পালিয়ে যায়, সে সব ব্যয় করে মত্ত আনন্দে। তারপর ছোটোভাই আলেক্সিকে অনুরোধ করে বাবাকে বলে তার মা-র টাকা ফেরত দিতে। কারণ ক্যাটেরিনাকে তার ঋণের অর্থ ফেরত দিতে হবে। দিমিত্রি একদিন গ্রুশেঙ্কাকে বাবার ঘরে খুঁজে পেতে পারে, এই সন্দেহে ফিওদরকে আক্রমণ করতে চায়। নিজের বাবার অধঃপতিত চরিত্র সে মেনে নিতে পারে না। আলেক্সি ইতিমধ্যে ক্যাটেরিনাকে বলে গ্রুশেঙ্কাকে কিছু টাকা ঘুষ দিতে যায়, যাতে সে দিমিত্রির সংস্রব ত্যাগ করে। এদিকে আইভান ভালোবাসে ক্যাটেরিনাকে। ক্যাটেরিনা দিমিত্রিকে ভালোবাসে, আইভানকে নয়। আইভান চায় দিমিত্রি গ্রুশেঙ্কাকে বিয়ে করুক তখন ক্যাটেরিনাকে পেতে অসুবিধে হবে না। আইভানের প্রস্তাব ক্যাটেরিনা প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখাত-র বেদনা নিয়ে তবুও আইভান ক্যাটেরিনাকে গভীর ভালোবাসে। গ্রুশেঙ্কাকে ঘিরে পিতা-পুত্র ফিওদর ও দিমিত্রির তিক্ত সম্পর্ক সহিংস পরিণতির দিকে যেতে থাকে। দিমিত্রি বাবাকে হত্যা করতে যায়। আক্রান্ত হয় বাড়ির পুরোনো ভৃত্য, ফিওদর প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ফিওদরকে কেউ হত্যা করে সেইসঙ্গে তার সমস্ত অর্থও চুরি হয়ে যায়। পুলিশ দিমিত্রিকে ফিওদরের ঘাতক মনে করে গ্রেফতার করে। দিমিত্রি বলে সে নির্দোষ, বাবার খুনী নয়। ইতিমধ্যে স্মারডিয়াকভ বাড়ির চাকর, ফিওদরের জারজ সন্তান আইভানকে জানায় সে ফিওদরকে খুন করেছে। সে এমন সময় ঘটনাটি ঘটিয়েছে যাতে দিমিত্রি অভিযুক্ত হয়। ফিওদরকে হত্যার প্ররোচনার জন্য স্মারডিয়াকভ আইভানকে দায়ী করে। কারণ আইভান তার কাছে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করত যে বাবা ফিওদর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে পরিবারে শান্তি আসবে। ফিওদরের চুরি যাওয়া টাকা স্মারডিয়াকভ আইভানকে ফেরত দেয়। অনুশোচনায় দগ্ধ আইভান প্রলাপ বকতে থাকে যে সে শয়তানের আত্মাকে ধারণ করে আছে। স্মারডিয়াকভ আত্মহত্যা করে। দিমিত্রি ও গ্রুশেঙ্কার প্রেমে ঈর্ষান্বিত ক্যাটেরিনা দিমিত্রির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়। সে পুলিশকে দেখায় দিমিত্রির তাকে লেখা একটি চিঠি, যেখানে দিমিত্রি ক্যাটেরিনাকে জানায় তার পিতাকে হত্যা করার ইচ্ছে। সে কাজ সম্পন্ন হলে তার মায়ের অর্থ পেতে আর বাধা থাকবে না। আর সে টাকা ক্যাটেরিনাকে ফেরত দিয়ে সে ঋণমুক্ত হতে চায়। দিমিত্রি যে পিতৃহন্তা এ চিঠি তার প্রমাণ। দিমিত্রি গ্রেফতার হয়। বিবেকের দংশনে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ আইভানের প্রলাপ কথনে স্বীকারোক্তি দাদা দিমিত্রিকে বাঁচাতে পারে না। কিন্তু দিমিত্রি সম্পূর্ণ নির্দোষ— ফিওদরের খুনী স্মারডিয়াকভ। যদিও দিমিত্রি খুনী নয় তবু তার উচ্ছৃঙ্খল পাপদগ্ধ জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন অক্লেশে মেনে নেয়। ক্যাটেরিনা অ্যালেক্সি ও গ্রুশেঙ্কার সামনে দিমিত্রির কাছে ক্ষমা চায়। সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত, কোমল প্রাণ দরদি মানবপ্রেমিক অ্যালেক্সি দাদা দিমিত্রির সঙ্গে সাইবেরিয়ায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে সহযোগী হয় পদচিহ্ন রেখে যায় আগামী প্রজন্মের রাশিয়ার আদর্শ নাগরিকের প্রতীক হয়ে।

Brothers Karamazov উপন্যাসের দুটি ঘটনায় দস্তয়েভস্কির জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। এক, পিতৃহত্যার প্রশ্ন। দস্তয়েভস্কির কৈশোরের অন্যতম বেদনাবহ ঘটনা ভৃত্যদের আক্রমণে তাঁর পিতার মৃত্যু। যদিও উপন্যাসে পিতৃহত্যার প্রসঙ্গটি উচিত-অনুচিতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা। দস্তয়েভস্কির অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বিতীয়ত, যৌবনে দস্তয়েভস্কি একটি উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদী, পশ্চিমী সংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জার কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। শেষে জারের আদেশে মৃত্যুর শাস্তি থেকে রেহাই পেলে তাঁকে কয়েক বছর সাইবেরিয়ায় কারাবাস জীবন কাটাতে হয়। বিবেচনাহীন, হঠকারী জার বিরোধিতার জন্য কারাবাসকে তিনি উচিত শাস্তি মনে করেছিলেন। তিনি যেন রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ দিমিত্রির আত্মার মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। দস্তয়েভস্কির ধর্মভাবনা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লেখক দিমিত্রি চরিত্রকে দেখেছেন সমসাময়িক রাশিয়ার এক স্খালিত মানব—পাপ-পুণ্যের স্বচ্ছ চেতনায় যার নিরন্তর অন্তর্দহন। দস্তয়েভস্কি তাঁর চরিত্রদের যাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে তাদের কর্মের নৈতিক দায়িত্ব স্কন্ধে চাপিয়েছেন। খ্রিস্ট তাঁকে মুক্ত ইচ্ছাধীন জীবনের বোঝা বহন করতে বলেছেন নৈতিক কর্তব্যজ্ঞানে। ক্যাথলিক চার্চে যাজকের উপযাচকতার বিধান পাপীর পাপমুক্তি ব্যবস্থায় যাজকতন্ত্রের মতো সবরকম কল্যাণকামী স্বৈরতন্ত্রের, এমনকি সমাজবাদেরও তিনি বিরোধিতা করেছেন, যা মানুষের মুক্ত ইচ্ছাধীন জীবনকে শৃঙ্খল পরাতে চায়।

দস্তয়েভস্কি এই তত্ত্ব কথা শুনিয়েছেন উপন্যাসের পঞ্চম পর্বে গ্রান্ড ইনক্যুইজিটর শীর্ষক অধ্যায়ে এক দীর্ঘ কবিতার আকারে, দুই ভায়ের বাদানুবাদে। যুক্তিবাদী নাস্তিক আইভান কারামাজভ বাইবেলের গ্রান্ড ইনকুইজিটর প্রধান জেরাকারী হয়ে স্যাটানের বা শয়তানের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বরপ্রেমী ভাই আলেক্সিকে শোনায় যিশুখ্রিস্ট প্রদর্শিত স্বাধীন ইচ্ছার পথ নয়, বরং সমর্পণ করা ভালো কর্তৃত্বর কাছে। সেখান নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা যায়। উপন্যাসে গ্র্যান্ড ইনক্যুইজিটর অনেকটা মহাভারতের গীতার মত— অধ্যায়টিকে পৃথক একটি তত্ত্ব আলোচনা হিসাবে পড়া যায়।

দস্তয়েভস্কির মানবের এই মুক্ত স্বেচ্ছাধীন জীবন তুর্গেনিভের নৈরাজ্যবাদে রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রণকে যে অমান্য করার কথা বলে তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। দস্তয়েভস্কির দেশের সমাজ, সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিলো, জাতীয়তাবাদী মন ছিলো- ‘ব্রাদার্স কারামাজভে’ ছোট ভাই আলেক্সির মতো। তবে নৈতিক নৈরাজ্যবাদের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। দার্শনিক কান্টের নৈতিক বিশ্বের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্বকে তিনি মানতেন। অবশ্য সেই নৈতিকতাকে লেখক গোঁড়া রুশ চার্চের খ্রিস্টবাদের সঙ্গে এক করে দেখেছেন।

উজবেকিস্তান দর্শন

মৌসুমী রায়

উজবেকিস্তান মধ্য এশিয়ার অন্যতম দেশ। তার চারদিক পাঁচখানা দেশ দিয়ে ঘেরা-কাজাকস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান।

উজবেকিস্তানের উত্তর পূর্বে তিয়েনশান পর্বতমালা, উত্তর পশ্চিমে আরল সাগর। আর উত্তর-দক্ষিণে যেন বেড় দিয়ে বয়ে চলেছে মধ্য এশিয়ার দুই ঐতিহাসিক নদী- উত্তরে সিরদরিয়া আর দক্ষিণে আমুদরিয়া বা অক্সাস। রয়েছে দুটি মরুভূমি কিজিলকুম ও কারাকুম। মধ্যে মধ্যে মরুদ্যান কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ছোটো-বড়ো শহরগুলি।

উজবেকিস্তান বৃহৎ তুর্কিস্তানের অংশ অর্থাৎ তুর্ক মানুষদের দেশ। বহুযুগ আগে যাযাবর পশুপালকেরা এখানে থিতু হয়ে মরুভূমির মধ্যে নদীর জলকে কাজে লাগিয়ে বিশাল সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। দুই নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছিল সগদিয়ানা এলাকা।

যুগে যুগে এদেশ পারসিক বা ইরানিয়ান, গ্রিক, সিথিয়ান, কুষাণ, পার্থিয়ান, মোঙ্গল, তুর্কি, রাশিয়ান ও সোভিয়েত শাসনে থেকেছে। যে উন্নত ‘রেশম পথ’ বা বাণিজ্যপথ পশ্চিমের দেশগুলোতে গেছিল, তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল বুখারা ও সমরখন্দ। শুধু বাণিজ্যে নয়, তৈমুর লঙ-এর আমলে বা তৈমুরিদ বংশের শাসনে এই জনপদেরা হয়ে ওঠে উচ্চমানের শিক্ষা-বিজ্ঞানচর্চা-শিল্পসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় আর উজবেকিস্তান স্বাধীন হয়ে যায়। বর্তমানে তাদের সরকারি ধর্ম ইসলাম, অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষেরাও এখানে বসবাস করেন।

এখানের ভাষা উজবেক। রাশিয়ান চলে। এদের মুদ্রার নাম ‘সোম’, সাক্ষরতার হার ১০০%।

তাসখন্দ:

আমরা উজবেকিস্তান এয়ারলাইন্সের প্লেনে চেপে দিল্লি থেকে প্রথমে গেছিলাম উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ-এ। ঘন্টা তিনেকের যাত্রাপথ। অক্টোবর মাস, চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া, না গরম-না শীত। তাসখন্দ উজবেকিস্তানের একদম উত্তর পূর্বে সিরদরিয়া নদীর আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। তাসখন্দ আসলে মরুদ্যান-শহর, প্রাচীন রেশম পথের এক জনপদ। ১২১৯ সালে চেঙ্গিজ খান (১১৬২-১২২৭) একে ধ্বংস করে। এক সময়ে এটি ছিল তুর্কিস্তানের রাশিয়ান অংশের রাজধানী; সোভিয়েত শাসনে একে এক মডেল শহর হিসাবে গড়ে তোলা হয়। পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তা, চওড়া ফুটপাথ, ছায়াঘন গাছ, পার্ক, ফোয়ারা, মনুমেন্ট, বড় বড় প্রাচীন স্থাপত্য, প্লাজা, অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক তার সৌন্দর্য ধরে রেখেছে।

তাসখন্দের এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমে ডলার ভাঙিয়ে 'সোম' এর নোট নেওয়া হল। আর নেওয়া হল বি-লাইন ফোনের সিম। ইয়ানডেক্সের অ্যাপ ইনস্টল করা হল ফোনে। তাতে ট্যাক্সি ও খাবারের অনলাইন ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে।

উজবেকিস্তানের ট্যাক্সি, হোটেল ও খাবার তুলনামূলক বেশ সস্তা, রাস্তাঘাট নিরাপদ, সবকিছু বেশ নিয়মমতন চলে আর মানুষজন বেশ আন্তরিক। লোকসংখ্যা কম। মধ্য এশিয়ার একটা ছোট্ট দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান এতটাই ভালো করে ফেলেছে দেখে ভারত থেকে গিয়ে মাঝেমাঝে তাই হীনমন্যতায় ভুগছিলাম।

তাসখন্দের মেট্রোরেল অনেক পুরানো (১৯৭৭), শহর জুড়ে বেশ ভালো নেটওয়ার্ক, অপূর্ব অলংকরণ দিয়ে সাজানো স্টেশনগুলি। যাত্রী সংখ্যা ভালই, তবে সুশৃঙ্খল।

তাসখন্দের পুরানো স্থাপত্যের মধ্যে হজরত ইমাম কমপ্লেক্স অন্যতম। বিরাট এলাকা জুড়ে অজস্র চত্বরের মাঝেমাঝে মিনারওয়ালা বিশাল বিশাল স্থাপত্য- কেউ মাদ্রাসা, কেউ বাজার, কেউ মিউজিয়াম, কেউ বা অফিস। বেলেপাথর রঙ এর দেয়ালের গায়ে অসাধারণ নীল (নীলের নানা শেড), লাল, কালো, সাদা টাইলের ওপরে অপূর্ব কারুকাজ। বেশিরভাগই পারসিক স্টাইলের ফুল লতা পাতা, মাঝেমাঝে ধর্মীয় লেখাও আছে। খুব উন্নত ক্যালিগ্রাফি ও শিল্পকলা।

এর পরে গেলাম কুকেলদাশ মাদ্রাসায়। অপূর্ব স্থাপত্য আর কারুকাজ তার। সোভিয়েত জমানায় এটিকে ঢেলে সাজিয়ে বানানো হয়েছিল "নাস্তিকতার মিউজিয়াম"। বাড়িটি এর আগে পরে অনেক রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমানে সেটি একটি চালু মাদ্রাসা ও হোস্টেল।

এর কাছেই তাসখন্দের বিখ্যাত চোরসু বাজার। বাজারখানা বিশাল বড়ো, পাহাড়ের মতো নানা ধাপে ধাপে ছড়িয়ে। উজবেকিস্তানের অন্যান্য বিখ্যাত বাজারের মতোই এর কাঁচা সবজির এলাকাটা দেখবার মতো। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্রকান্ড প্রকান্ড কুমড়ো ও বাঁধাকপি, বৃহৎ সফেদ মূলো, বৃহৎ পেঁয়াজ, শালগম, নানা ধরনের শাক, ধনেপাতা, লংকা, রসুন ও আরো নানা রকমের সবজি। তাদের রঙ ও সাইজ দেখে আমরা হাঁ হয়ে গেছি। এরপরে ফলের বাজার। সেখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে তবলা সাইজের তরমুজ, খরমুজ ও ফুটি, খেজুর, আঙুর। নীরস মরুভূমিতে সেচের সাহায্যে ফলানো

তরকারি আর ফলের এত রঙ দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এর পরে নানা ধরনের চায়ে ভরা কাচের বাক্স, ঢিপি ঢিপি মশলা, শুকনো ফল। জামাকাপড়, জুতো আর পাঁচমেশালি দোকান তো আছেই। একটা বিশাল ডোমের তলায় ঢাকা মাছ-মাংসের বিরাট বাজার।

চোরসু বাজার থেকে মেট্রো চেপে বিখ্যাত 'হোটেল উজবেকিস্তান'-এর দোরগোড়ায় এসে পড়লাম। সোভিয়েত জমানার বিশাল হোটেল, রঙিন বিকেলের সূর্যের আলো এসে তার কাচগুলো তখন চকচক করছে, চারপাশে অনেকটা খোলা জায়গা, বড়ো বড়ো গাছ, চওড়া ফুটপাথে মানুষজন অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানেই ১৯৬৬ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় লালবাহাদুর শাস্ত্রী রহস্যজনকভাবে মারা যান।

বিশাল রাস্তা পেরিয়ে বিপরীতে আমির তৈমুর স্কোয়ার। গাছে ঢাকা বিরাট পার্কের মধ্যে তৈমুর লঙ এর ঘোড়ায় চড়া মূর্তি (আগে ছিল স্তালিনের মূর্তি)।

রসনাতৃপ্তির অজস্র ব্যবস্থা। প্রতি জনপদে আলাদা আলাদা নকশার রুটি। প্লভ (পোলাও), সামোসা (আমিষ ও নিরামিষ সিঙ্গারা), শাসলিক (কাবাব), দোলমা (আঙ্গুরপাতায় মোড়া মাংস), মান্টি (মোমো জাতীয়), শুরপা (স্যুপ ধরনের), ন্যুডলের নানা পদ, পাতির, মাংসের নানা পদ, তরকারির পদ। মিষ্টি বলতে বিভিন্ন শুকনো ফল-বাদামের হালুয়া, বাকলাভা, বেকারির জিনিস।

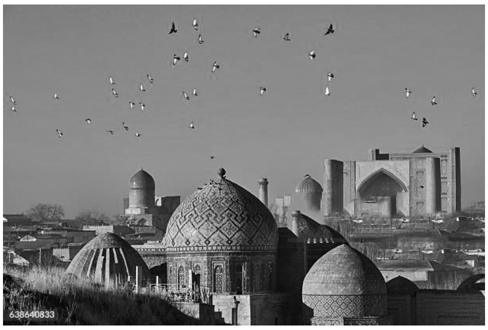

তাসখন্দে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (ICP)। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জি, মহম্মদ আলি, মহম্মদ শাফিক, রোজা ফিটিনগভ, ইভলিন রায়, এম পি টি আচার্য ইত্যাদি।

পরেরদিন ভোরের আফ্রাসিয়াব কোম্পানির বুলেট ট্রেনে চেপে সমরকন্দ ঘণ্টা দুয়েকের যাত্রা।

সমরখন্দ:

তৈমুর লঙ (১৩৩৬-১৪০৫) পরাক্রমে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও যুগের পত্তন করে যান। তার নাম তৈমুরিদ রেনেসাঁ। পশ্চিমে কনস্টান্টিনোপল থেকে উত্তরে মস্কো, পূর্বে চিনের সীমানা ও দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর ভারত, দক্ষিণে মিশর হয়ে আরব সাগরের কূল অবধি তার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল ঘোড়সোয়ারবাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল, লুটেপুটে সম্পদ এনেছিল চারদিক থেকে। সাম্রাজ্যখানাও কম বিশাল ছিল না। সমরখন্দ ছিল সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী। এত বছর পরেও সেসময়ে বানানো অসাধারণ যেসব সৌধ ও স্থাপত্য এখনো রয়েছে।

সমরখন্দ অতি প্রাচীন একটি জনপদ। সেই সোগদিয়ান আমল থেকেই বাণিজ্যকেন্দ্র। গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার যখন এখানে এসেছিলেন, একে 'মার্কন্ড' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই শহরে মার্কো পোলো, ইবন বতুতা থেকে শুরু করে অরেল স্টাইন পর্যন্ত ঘুরে গেছেন।

সমরখন্দের বিখ্যাত স্থাপত্যগুলো হল গুর-এ-আমির (তৈমুর ও শাহি পরিবারের সমাধি), রেগিস্তান স্কোয়ার (তিনটি বিখ্যাত মাদ্রাসা...শের ডোল, উলুঘ বেগ ও তিলিয়া কোরি), বিবি খানমের মসজিদ (তৈমুরের প্রধান স্ত্রী চাঘতাই বংশজাত চেঙ্গিজ খানের সরাসরি বংশধর ছিলেন, তার সমাধি), হজরত ইমামের মসজিদ (কিংবদন্তী সুফি সাধক 'জিন্দাপীর' বা সিন্ধিদের 'ঝুলেলাল'), শাহি জিন্দা (মহম্মদের এক আত্মীয়র স্মরণে অসাধারণ সব সমাধি সৌধের একটা কমপ্লেক্স বা 'নেক্রোপলিস'), উলুঘ বেগের মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও মিউজিয়াম।

সুলতান উলুঘ বেগ (১৩৯৪-১৪৪৯) ছিলেন তৈমুরের নাতি। রণনায়ক, দক্ষ প্রশাসক ছাড়াও তিনি ছিলেন নামি পন্ডিত, অঙ্কবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও শিক্ষক। তাঁর উৎসাহে ও অবদানে সেসময়ে তৈমুরিদ রেনেসাঁ বা স্বর্ণযুগ চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছয়। দেশ বিদেশ থেকে নানা জ্ঞানী-গুণীজন, বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের সমারোহ ঘটে, সমরখন্দ হয়ে ওঠে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চার এক কেন্দ্রস্থল। উলুঘ বেগের "Book of fixed stars" তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার এক অনন্য কীর্তি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের নামডাক তখন সারা এশিয়া জুড়ে। সেই মানমন্দিরের ভগ্নাবশেষের সামনে বসে রাতের খোলা আকাশে ঝকঝকে গ্রহ নক্ষত্র দেখতে দেখতে শিহরণ হচ্ছিল। ভাবছিলাম আমাদের দেশের মোগল সম্রাটদের মধ্যে সুরুচি, শিল্পবোধ ও জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ তো বংশজাত। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর তো এই বংশের সন্তান, উজবেকিস্তানের ফরঘনা উপত্যকার আন্দিজানে তাঁর জন্ম। তাই যুদ্ধজয়ের পাশাপাশি তিনি সুললিত "বাবরনামা"ও লিখেছিলেন।

পরের দিন দুপুরে শার্ক ট্রেনে করে বুখারা গেলাম।

বুখারা বা বোখারা:

বুখারা শহরটিও যথেষ্ট আধুনিক। বুখারা সেই প্রাচীনযুগ থেকেই ছিল রেশম পথের একটি অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। ইউনেসকো হেরিটেজ সাইট। একে 'জীবন্ত মিউজিয়াম' আখ্যা দেয়া হয়। বুখারার বিখ্যাত আকর্ষণ হল বুখারা দুর্গ (আর্ক অফ বুখারা), পো-ই-কল্যাণ মসজিদ, চোর মিনার, বোলো হাউজ মসজিদ, ইমাম বুখারির জন্মস্থল ও অজস্র নামীদামী মসজিদ-মাদ্রাসা এবং লাবি হাউজ কমপ্লেক্স।

পরেরদিন বুখারা দূর্গ দেখে শহর থেকে খানিক দূরে শেখ বাহাউদ্দিন 'নকশাবন্দী' সুফির মাজারে গেলাম। আধা-মরুর মধ্যে গাছে ঢাকা, ফুলে ঢাকা মসৃণ চওড়া রাস্তা। মাজার চত্বর বিশাল, খুব শান্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশ। স্থাপত্য শ্রেণির গায়ের টাইলের রঙ ও

নকশার তো তুলনা নেই। বাহাউদ্দিন ছিলেন মধ্য যুগের খুব সম্মানিত সাধক, 'নকশাবন্দী' ঘরানার জনক। কোনো চত্বরে আধুনিক শিল্প প্রদর্শনী চলছিল (বাইনিয়েল), কোথাও গাধা সমেত মোল্লা নাসিরুদ্দিনের মূর্তি, কোথাও সোভিয়েত জমানার সুভ্যেনির ও ব্যাজ বিক্রি হচ্ছিল, কোথাও জমজমাট গান বাজনা চলছিল।

পরেরদিন ভোরে আমরা দূর পাল্লার ট্রেনে চেপে মরুশহর খিভাতে।

খিভাঃ

দারুণ অনুভূতি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়া সে ট্রেনে চেপে। উল্টোদিকের বৃদ্ধ উজবেক দম্পতির সঙ্গে প্রায় ইশারায় আলাপ হল। তাঁরা চা-রুটি খাচ্ছিলেন। বাইরে সেকেলে কলওয়ালা পোর্সেলিনের হিটারে গরম জল। সবাই কাপে করে এনে টি ব্যাগ ডুবিয়ে চা খাচ্ছে। প্রৌঢ় কোচ কন্ডাক্টর বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব দেখভাল করছে। উজবেক দম্পতি 'হিন্দোস্থানে'র ভক্ত, তাঁরা রাজ কাপুর থেকে মিঠুন চক্রবর্তীকে চেনেন, 'দোস্ত দোস্ত না রহা' ও 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি' গানও গেয়ে শোনালেন। সব জায়গাতেই দেখেছি তাঁরা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরেন, ছবি তুলতে চান, 'হিন্দোস্থান'-এর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা বোঝা যায়। তাঁদেরই ছেলে বাবর একদিন হিন্দোস্থান গিয়ে বিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তাঁরা গর্বিত।

বিখ্যাত আমুদরিয়া নদী পার হয়ে আমরা মরু শহর খিভাতে পৌঁছেছিলাম।

খিভা উজবেকিস্তানের পশ্চিমে কিজিলকুম ও কারাকুম মরুভূমির মধ্যে একটি জনপদ। একদা খোয়ারাজম রাজ্যের একটি অন্যতম শহর ছিল। বাণিজ্যকেন্দ্র তো বটেই, এটি ছিল দাস ব্যবসারও অন্যতম কেন্দ্র।

খিভার আসল আকর্ষণ 'ইচান কালা দূর্গ' এলাকা। আসলে সেটি একটি পাঁচিল ঘেরা বিস্তৃত এলাকা, ২৫০০ বছরের পুরানো, যার বাড়িঘর অলিগলি রেনোভেশন করে সব একই রকম রেখে দেওয়া হয়েছে। মানুষজন বাস করে, অনেক হোটেলও আছে, দোকানপাট তো আছেই।

খোয়ারাজিম রাজ্য একসময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল। ইচান কালার মধ্যে "জ্ঞানী মানুষের মিউজিয়াম" দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চার বিখ্যাত পন্ডিতের মূর্তি... আল বিরুনি (জন্মস্থল খোয়ারাজম), ইবন সিনা (জন্মস্থল বুখারা), অ্যালজেব্রার জনক আল খোয়ারিজমি (জন্মস্থল খোয়ারাজম) এবং ব্যকরণবিদ মাহমুদ আল জামাকশারি (জন্মস্থল খোয়ারাজম) সামনে দাঁড়িয়ে। এরা সব এক একজন দিকপাল 'পলিম্যাথ'। মিউজিয়ামে অ্যাস্ট্রোল্যাবের প্রতিমূর্তি, বিভিন্ন কুঠুরিতে জ্ঞানী মানুষজন ও তাঁদের কাজকর্মের কথা মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। খিভায় এসে এই মিউজিয়ামটি না দেখতে পেলে অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত।

ইচান কালায় আমরা দু কুঁজওয়ালা উট দেখলাম। দুদিন খিভা-বাসের শেষে আমাদের এবার ফেরার পালা। এবারে উজবেক এয়ারলাইন্সের প্লেনে চেপে ফের তাসখন্দে।

সেখান থেকে দিল্লির প্লেন। বাড়ি ফেরার পালা। ফেরার পথে প্লেন নিচু করে ওড়াতে আর আবহাওয়া পরিষ্কার থাকাতে সুবিখ্যাত তিয়েনশান, পামির-আলাই, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম আর হিমালয়ের একের পর এক বরফঢাকা পর্বতশ্রেণীর গা ঘেঁষে উড়তে উড়তে তাদের ভয়ংকর সৌন্দর্য দেখে শিহরিত হতে হতে দেশে ফিরলাম।

হাতছানি দেয় ‘সাতশো পাহাড়’

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

ডাক দেয় পথ। সে তো সকলকেই ডাকে, কিন্তু কজন পারে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ‘পথের পাঁচালি’ লিখতে। সেই অমর পাঁচালিকারের আর এক পথ-পাঁচালি ‘বনে পাহাড়ে’ পড়ে আবেগমথিত হয়ে পড়েছিল এক নেহাৎ সাধারণ পাঠক। অপেক্ষায় ছিল এক সমমনস্ক সহযাত্রীর। হাত বাড়ালে বন্ধুর মত সঙ্গী হতে রাজি হলেন স্বয়ং পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়। তবে আর কি! ফের দুই হুজুরে আর একবার লাল মাটির পাথুরে পথে। মুঠোফোনে টিকিট কাটা, সাঙ্গ হ’ল বাঁধাছাঁদা। বাঁধাছাঁদার আর আছেটা কি? ঐ তো আপনি আর কোপনি। কিন্তু ঐ পথে রেল সকট বেগড়বাই। কাছাকাছি পৌঁছাতে ট্রেন একটাই—‘হাওড়া বড়বিল জনশতাব্দী’। সময়ে পৌঁছোতে তার দায় কি! বেলা দেড়টায় পৌঁছাব বলে পৌঁছায় রাত দশটায়, তাও পুরো নয়, দম শেষ ‘বড়া জামদায়’। তারপর ঐ রাতে জঙ্গলপথে যাবে কোথায়? ভাবলেই লাগে বড় অসহায়। অবশেষে সারান্দা বনবিভাগের কর্মী রোয়ান দিল অন্য পথের সুলুক সন্ধান। এবারে পথ বদল, আর বড় জামদা দিয়ে নয়, টাটানগর-সম্বলপুর পথে মনোহরপুর স্টেশনে নেমে কিরিবুরু। গাড়ির ব্যবস্থাও সেই করে দেবে। পকেটে একটু টান পড়ল বটে কিন্তু মনোহরপুরের নদী-জঙ্গলও যে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু যাবার যে আর দুদিন বাকি। টিকিটের হবে টা কি? ভাগ্যি দুজনের পাকা মাথা, তাই সিনিয়র সিটিজেন কোটায় টিকিট জুটে গেল পাকা।

শেষ নভেম্বরের রাতভোরে ট্রেন থেকে মনোহরপুরে নামতেই দুহাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানালো সারান্দার জমাট ঠাণ্ডা। রোয়ানের ঠিক করে দেওয়া বাহন খানিক বাদেই এসে দিল দেখা। শেষ হ’ল আমাদের অপেক্ষা। মনোহরপুরের এক মস্ত আকর্ষণ ‘কোয়েল’ আর ‘কারো’ নদীর সঙ্গম। খানিক বাদেই দেখা হল সেই দুই বোনের সাথে। দুই নদীর সারা শরীর জুড়ে তখন শীতের কুয়াশার চাদর। কোয়েলে

তবু স্রোতের তিরতিরানি দেখা যাচ্ছে কিন্তু কারোর ঘোলা জল যেন জমাট নিথর। শুধু তাতে পেতে রাখা জালের মাঝে মহাশোলের খলবল আর তার ঝাপটায় ছিটকে উঠছে আঁজলা আঁজলা জল। কুয়াশা জড়ানো নদীর বুকে শালতি বেয়ে আসা মাঝধরার বৈঠাঘাতে জলের মূর্ছনায় যেন ঊষার মন্ত্রদ্যোতনা। নদীপারে ছোট্ট অথচ সুন্দর এক আশ্রম। পূজারীর আবাহনে হল দেবদর্শন। কোয়েলের কাছে দাঁড়িয়ে মন উচাটন আর এক বোনকে দেখার জন্য। সারথী রথ ছোটাল তার উদ্দেশে। সকালের আলো ফুটছে, জেগে উঠছে গ্রামজীবন। ধানের গোলা, নিকানো উঠান, ফসল কেটে নেওয়া মাঠ জুড়ে প্রকৃত ভারতবর্ষ। সকালের মিঠে রোদে দেখা হল দুষ্টু মিষ্টি 'কোয়না'র সাথে। তার ঠান্ডা হাত ছোঁওয়াতেই সে যেন কানে কানে বলে উঠল তোমাদের বিভূতিভূষণ আমাকে খুব ভালবাসতেন। কত ছলে যে তিনি আমায় দেখতে আসতেন! জানি সে কথা। ইছামতী আর সুবর্ণরেখার পরেই বারবার তার উল্লেখ আছে পাঁচালির কথকথায়। কতবার কত ঘাটে-আঘাটে যে তিনি দেখা করেছিলেন তোমার সাথে!

দুপাশে নিবিড় বনরাজির বুকচেরা পথ বেয়ে ছুটে চলেছে আমাদের বোলেরো বাহন। মাঝে মাঝেই আমাদের অতিক্রম করে চলেছে সশস্ত্র সুরক্ষা বাহিনীর মটর বাইক। একজন চালাচ্ছে আর পিছনে স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের ট্রিগারে হাতরাখা অন্য জওয়ান। জানান দিচ্ছে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা, তাই সাবধান। আমরা দুজন মামুলি বিভূতি অনুরাগী। সাবধান হওয়ার আর আমাদের আছেটা কি! নেহাৎই সাদামাটা প্রাণ দুটি, তাতেও বড় ফাটাফুটি। কিন্তু সেই ফুটোফাটা প্রাণকেও সাদরে বরণ করে নিল কিরিবুরু বনবিভাগের অতিথি নিবাস। আহা! জঙ্গল আর খাদানের মাঝে যেন এক টুকরো তারকা বিলাস। অবশ্য এখানে ঠাঁই পাওয়ার পুরো কৃতিত্বটাই আমার জামাতা বাবাজীবনের। সেই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তার পদাধিকারবলে।

শেষ হতে না হতে দুপুরের ভোজন এসে গেল বনদর্শনের জন্য বনবিভাগের অনুমোদন। ব্যাস আর আমাদের পায় কে রে, জঙ্গলের বারমহল, অন্দরমহল মেঘাতাবুরুর লৌহখনির হৃদয়তল সবই দেখা যাবে উঁকি মেরে। আমাদের সারথি প্রথমেই নিয়ে গেল মেঘাতাবুরুর লৌহ আকরিকের খনি দেখাতে। খনিগুলি সবকটি SAIL-এর নিয়ন্ত্রণে। বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি যেন ময়দানবের কলা কৌশল। লাল ধুলির জটাজালকে বিন্যস্ত করতে বিশাল বিশাল গাড়িতে জল ছেটানো হচ্ছে মাটিতে। এখন তো প্রশস্ত রাস্তায় দিব্যি চলছে মটরযান। বিভূতিভূষণের সময়ে এ পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। খানিক হেঁটে, খানিক তারে ঝোলা বড় বালতির মত ট্রলিতে করে তিনি তখনকার খনিতে এসেছিলেন। তবে একথা মানতেই হয় সে পথ পাড়ি দেওয়া ছিল অনেক রোমাঞ্চকর। পাহাড়ের অনেক ওপরে তৈরি হয়ে গেছে ব্রডগেজ রেলপথ। স্টেশনও আছে একটি 'করমপদা'। তবে তা কেবল মালগাড়ি যাওয়া-আসার জন্য। লৌহ আকরিকে বোঝাই একটি মালগাড়ি আমাদের সামনে দিয়েই চলে গেল ঝমঝম করে।

এরপর বনবিভাগের 'ঘাঘিরথি' পর্যটন কেন্দ্র। কারো নদীর একটি শাখায় বাঁধ দিয়ে জল এনে এক চমৎকার প্রোজেক্ট বানাচ্ছে সারান্দা বনবিভাগ। শেষ হলে একটি দারুণ পর্যটন স্থল হয়ে উঠবে। আমরা নির্মিয়মান অংশেই ঘুরে ফিরে বেশ খানিকটা রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। বিশেষতঃ স্রোতস্বিনীর ওপর দিয়ে লোহার দড়িতে বাঁধা ঝুলন্ত কাঠের লম্বা লম্বা সাঁকো গুলি পারাপার করে।

এরপর আরো কিছুটা গিয়ে বেশ কিছুটা পাহাড়ের পাকদণ্ডিতে জঙ্গল পায়ে হেঁটে উপর থেকে খাড়াভাবে পরা 'ঝিক্‌রা' ওয়াটার ফলস্‌। এটি আবার ওড়িশার কেওনঝড় জেলায় পড়ছে। ঠান্ডা জলকণা গায়ে মেঘে ফিরে আসতেই জঙ্গলপথে গাড়ি দৌড়াল মেঘাতাবুরু সানসেটে পয়েন্টে যাওয়ার জন্য। কিন্তু পথ মাঝেই পাহাড়ের আড়ালে ডুব দিলেন দিনমণি। আজ দেখা না হলেও দেখা হবে কাল। সাঁঝের আঁচলে ঢাকা পড়তে লাগল সারা পাহাড়ি ঢাল।

পরের দিন: যাচ্ছো কোথা? এই হেথা হোথা। তবু নাম তো তার আছে একটা না কি! তা আছে বৈ কি, এই ধরো না কেন চাঁইবাসা। তা সেখানে আবার আছে কি টা? সে কি! তাও জানো না? বড় ভাল সেখানের জল-হাওয়া। বটে বটে! তবে! বাঙালি তো বরাবরই পেটরোগা, তাই পশ্চিমে হাওয়া বদলের ঠিক-ঠিকানায় মধুপুর, দেওঘর, ঘাটশিলা, শিমূলতলার পাশাপাশি চাঁইবাসাও পেয়েছিল পরিচিতি। ঘাটশিলায় এলে সময় করে বিভূতিভূষণ চলে আসতেন চাঁইবাসায়। তাঁর বড় প্রিয় জায়গা ছিল এটি। তিনি আসলেই স্থানীয় বাঙালিদের তাঁকে নিয়ে বসে যেতো জমজমাট আড্ডা। তা সে যা হোক আমাদের অবশ্য চাঁইবাসা যাওয়ার অভিপ্রায় ছিল না মোটেই। গন্তব্য ছিল থলকোবাদ। কিন্তু কেন্দ্রীয় এজেন্সির কিছু লোকজন এসেছে সারান্দায় সার্ভে করতে। তাদের দুজন উঠেছে এই অতিথি নিবাসে। যেতে মানা করলেন দিন কয়েক আগে মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে ছাগল চড়াতে যাওয়া এক বালিকার দেহ। সারথিও দেখছি গাঁইগুঁই করছে যেতে, বনদপ্তরও অনুমতি দিল না। অতয়েব চালাও পানসি বেলঘরিয়া, থুড়ি চাঁইবাসা। পশ্চিম সিংভুম জেলার সদর শহর। ছুটল বাহন, কিছুটা উৎরাই পার হতেই বনবিভাগের আর একটি অতিথি নিবাস বরাইবুরু। ঘনঘোর জঙ্গল ঘিরে আছে এই অতিথিনিবাসটিকে। চাইলে থাকতে পারতাম কিন্তু কিরিবুরুর মত আরামদায়ক নয়। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লৌহকণা বহনকারী রক্তিম বর্ণা কোয়েনা।

ছুটন্ত বাহনে সারান্দার চলন্ত প্রকৃতি দর্শনের পর থামতে হল

সিরিঙ্গাসিয়া ঘাঁটিতে এসে। কোল বিদ্রোহের দুর্জয় মাটি এ সিরিঙ্গাসিয়া ঘাঁটি। দুরন্ত জাত্যাভিমান ও ব্রিটিশ শাসনে শোষণ আর অত্যাচারের প্রতিবাদে হো, ওঁরাও, খেড়িয়া, ভূমিজ আদিবাসিরা একত্রিত হয়ে ১৮৩১-৩২ সালে গড়ে তুলেছিল দুর্জয় প্রতিরোধ। বন্দুক কার্তুজের বিরুদ্ধে তীর, বর্শা, গুলতি, কুড়ালের লড়াই। অসম লড়াই, তবু সময় লেগেছিল ব্রিটিশদের এই বিদ্রোহ দমন করতে। তারপর লালমাটি আদিবাসীদের রক্তে আরো লাল হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধারে আজকের বৃক্ষের পূর্বপুরুষদের ডালে ফাঁসিতে একের পর এক লটকে দেওয়া হয়েছিল কোল পুরুষদের। আর মহিলাদের ইজ্জত-সম্মান হয়েছিল ভূলুণ্ঠিত। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে যায় মন। এখন সিরিঙ্গাসিয়ার সেই রণক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে তৈরি হয়েছে কোল বিদ্রোহের সুদৃশ্য স্মারকস্থল। মাটি ছুঁয়ে সেই বীর সেনানীদের প্রণাম করে ফের চড়ে বসা বাহন যানে।

'রোড়ো' নদীর পুল পার করে চাঁইবাসার সদর কার্যালয়। একঝাঁক রঙ্গিন প্রজাপতির মত পুল পার হয়ে ওপার থেকে এপারে আসছিল একদল বিদ্যার্থী। লেখাপড়ার চাঁইবাসার খুব সুনাম। এখানকার বহু মিশনারি স্কুল-কলেজ দেশকে উপহার দিয়েছে প্রশাসক, চিকিৎসক, দেশসেবক।

কিছুদূরে পাহাড়ি ঝরনা 'লুপুঙ্গুটু'। এই ঠান্ডায় সে শীর্ণ হয়ে একেবারে এতটুকু। কিন্তু মহাবনস্পতিদের ছায়ায়-মায়ায় সে কেমন যেন রহস্যময়। তাকে বেড় দিয়ে রাস্তা একটা মাঠ পেরিয়েই গেছে থেমে। সেখান থেকে একটু নামতেই আবার দেখা পেলাম 'রোড়ো' নদীর। তবে এখানে সে শ্যামলিমায় সবুজ হয়ে মমতাময়ী রূপ নিয়েছে। সেই মমতায় শরীর ও মন জুড়িয়ে নিয়ে ফের শুরু হল চলা। এবার সোজা মেঘাতাবুরু সানসেট পয়েন্ট।

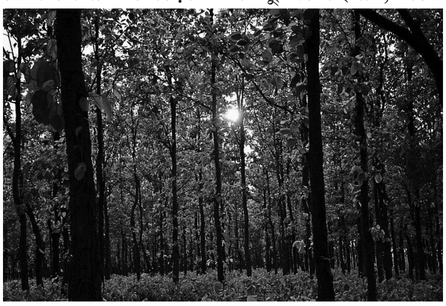

দিনমণিও ঢলছে, আমাদের বাহনও ছুটছে। অবশেষে পৌঁছে গেলাম সূর্যাস্তদর্শন স্থলে। পাহাড়ের মাথায় একটি মন্দির ও বসার জায়গা। গাছগাছালিতে ভরা জায়গাটির সামনে গভীর খাত আর তার বেশ কিছুটা দূরে একের পর এক পাহাড়ের সারি। তাদের সবুজ শরীর গোধূলি আলোয় কালচে দেখাচ্ছে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মেঘের দল নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে। গোনা শুরু করলাম, ১-২-১০-৫০ না আর গোনা যাচ্ছে না। সকলে বলে 'সাতশো পাহাড়', তার বেশী হলেই বা গুনছে কে? পৃথিবীর আদিম শিলাভূমি। সেই ২৩৯ মিলিয়ন বছর আগে মেসোযোয়িক যুগে গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড আফ্রিকা থেকে আলাদা হয়ে অথৈ মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে এসে জুড়ে গিয়েছিল এশিয়া মহাদেশের সাথে। নিয়ে এসেছিল মহামূল্যবান সব খনিজ আকর। সেই প্রাচীন ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা এক অনন্য অনুভূতিতে মন ভরিয়ে দেয়। ডুবছে দিনমণি, কিন্তু আমাদের লোভ-লালসা কি আদৌ ডুববে। এই সুউচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে শেষ আলোয় চোখে পড়ছে পাহাড়ে পাহাড়ে গভীর ক্ষত। আকরিকের লোভে যথেচ্ছাচারে তা উত্তোলনের জন্য ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে কত পাহাড়। সেসব দগদগে ঘায়ের মত দেখাচ্ছে। এই 'সাতশো পাহাড়' ও কি থাকবে? সভ্যতার বিকাশ কি প্রকৃতি ধ্বংসের নামান্তর মাত্র?

সমুদ্রে ভেসে আসা 'সাতশো পাহাড়' যেন তার ভেসে আসার সাক্ষী থেকে সিন্ধু তরঙ্গের মত পাষাণীভূত হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে অস্তাচলগামী দিবাকরকে। গোটা পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে তার লালিমা। নীচে সাঁঝের কুহেলি জমাট বাঁধছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। একে একে জ্বলে উঠছে মেঘাতাবুরু-কিরিবুরু জনপদের আলো। সারাদিনে অনেক ঘোরাঘুরির পর আমরাও ফিরে চললাম আমাদের ডেরায়। সেখানে আমাদের 'কুক' বিভীষণের হাতের ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা যেন সারাদিনের ক্লান্তি নিমেষে উধাও করে দিল।

তৃতীয় দিনঃ হাট বসেছে শনিবারে, কিরিবুরুর রাস্তাধারে। দিনটা ছিল ২২ ডিসেম্বর, শনিবার। শনিবার কিরিবুরুতে হাটবার। আর লালমাটি পাহাড়ি দেশে হাট মানে চলমান এক লোকসংস্কৃতি। বেড়াতে এসে এমন একটা হাটবার পেয়ে যাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সারান্দার জনজীবনকে এত কাছ থেকে দেখতে পাব ভাবতেই দারুণ ভাল লাগতে শুরু করল। আজ আর কোথায় যাওয়া নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে আশ মিটিয়ে দেখবো কিরিবুরু আর মেঘাতাবুরু জনজীবনকে। বাড়ি থেকে এখানকার ছোটদের জন্য বেশ কিছু চকোলেট আর বড়দের জন্য নতুন-পুরানো শাড়ি ও গরম জামাকাপড় কিছু এনেছিলাম, যাদের প্রয়োজন তাদের বিলি করার জন্য। সেগুলি সদ্ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে গেলাম। বড়া জামদা, গুয়া, নোয়ামুন্ডির দূর দূর গ্রাম থেকে ভোর ভোর মানুষজন চলে এসেছে তাদের নিজেদের মাঠ-ঘাট-আঙ্গিনায় ফলা আনাজ-ফল-সবজি নিয়ে। যেমন সেগুলির চেহারা, তেমন তাদের স্বাদ। এনেছে ঘরে ভাজা মুড়ি, তিল-তক্তি আরো কত কিছু। দেখলেই কিনে ফেলতে ইচ্ছে হয় কিন্তু ঘর যে অনেক দূর। তবু কিনে নিলাম কিছু কুদরুম ফুল। এগুলোতে ভাল চাটনি হয় আর সোনারঙা দুটি পেঁপে আর অবশ্যই তাদের ঘরে ভাজা ছোলা ও মুড়ি। ব্যাগ খালি করে বিলিয়ে দিলাম জামা-কাপড় আর ভরে নিলাম হাটের খরিদারি। দিলাম তাদের আর কতটুকু কিন্তু তাদের মুখের খানিকটা অবিশ্বাস ভরা অনাবিল হাসি আর অনেকটা খুশি যার মূল্য অনেক বেশি। দেওয়া-নেওয়া সবটাই খুশিতে খুশিয়াল।

হাটের একধারে বেশ বড় জায়গা জুড়েই ঐ সাতসকালেই জমে উঠেছে দেশী মদ হাড়িয়া, মহুয়ার সাথে নানারকম চাটের বেচাকেনা। সম্পাদক মশাই কৌতুক করে তার নাম দিলেন 'ফুডকোর্ট'। ভিড় বেশি সেখানেই। ছবি তুলছি বলে তাদেরও চোখে মুখে কৌতুক। নিজেদের লোক মনে করে কত কথাই যে বলছে! এদের ভাষা কিন্তু মোটামুটি বাংলা ঘেঁষা, তাই বুঝতে অসুবিধা নেই। এদের নিয়ে সম্পাদক মশাইয়ের খুব উৎসাহ। নেহাৎই সহজ সরল সাদা-মাটা

মানুষ এরা, তবু তরলের প্রভাবে কখন যে কি করে বসে...তাই Handle with care।

যেহেতু হাট থেকে আমাদের ডেরা খুবই কাছে তাই দফায় দফায় হাট ঘুরে যাচ্ছিলাম হাটের রূপ বদল দেখতে। সময়ের নিরিখে হাটের বেচাকেনার ধরন বদলে যাচ্ছিল। সকালে যে হাট ছিল গ্রামীণদের দখলে মূলত তাদের নিজেদের ফলানো আনাজ-পত্রে, ক্রমশ তার দখল নিতে থাকে পাইকার ও ব্যবসায়িরা। তাদের ফেরিতে তখন অধিকাংশই শহুরে দ্রব্য যাতে লেগে আছে নাগরিক কালিমা। আমাদের অতিথি নিবাসের কুক বিভীষণকেও দেখলাম এক কর্মচারিকে নিয়ে আনাজ-পত্র কিনতে। বিভীষণকে নিয়ে এক কলম না লিখলে অকৃতজ্ঞতা হবে। প্রথম ডাকে শুনে ভেবেছিলাম তার নাম বুঝি ভীমসেন, পরে জানলাম বিভীষণ। ওড়িশার কেওনঝড়ে বাড়ি, খুবই করিৎকর্মা। রান্নার হাত এমন চমৎকার যে যা রাঁধে তাই মনে হয় অভূতপূর্ব। আবার যদি কিরিবুরু আসি তবে তার একটা কারণ নিশ্চই হবে বিভীষণের হাতের রান্না। কেননা আফশোষ রয়ে গেল বাড়ির অন্যান্য প্রিয়জনকে খাওয়াতে পারলাম না বলে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত নামতে লাগল সারান্দার জঙ্গলে। 'সাতশো পাহাড়' নিঃঝুম আঁধারে বুঝিবা আকাশের হাজার হীরকখণ্ডের মত তারা গুণে চলেছে। দূরে কারো-কোয়েল-কোয়না ছলছল করে বয়ে চলেছে সেই অনাদিকালের মতো। আমার মনের মাঝে আবার দেখা দিলেন চির ভাস্বর অমর কথাকার পথের পাঁচালির পাঁচালিকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কোন ছেলেবেলায় যিনি ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন ভারতের এই অনাদি আদিম অরণ্যকে—

"...শুক্লা চতুর্দশীর অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠলো তখন আমরা পার্বত্য কোইনা নদীর উপলাস্তীর্ণ তীরে পৌঁছে গিয়েছি। দুধারের নিবিড় অরণ্যাণীর মধ্যে দিয়ে কলকল তানে কোইনা নদী বয়ে চলেছে।... যেদিকে চাই সেদিকেই ঝিল্লীমুখর বনানী জ্যোৎস্নাস্নাত প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণী ধ্যামমগ্ন ঋষিদের মত শান্ত সমাহিত—জন্মমরণভীতিভ্রংশি কোন্ মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর। জয় হোক সে দেবতার, যার করুণায় আজ আমার মত দরিদ্রের এ অপরূপ বনস্থলী দর্শনের সুযোগ ঘটল। তাঁরই শব্দহীন বাণী এই বনানীর নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রহরে প্রহরে মুখরিত হয়ে উঠছে...। ('থলকোবাদে একরাত্রি' বিভূতি রচনাবলী-মিত্র ঘোষ পৃষ্ঠা ৭২৮)

প্রণাম হে মহাদেবতা, প্রণাম হে বিভূতিভূষণ, প্রণাম ভারতবর্ষ।

The US Kidnapping of President Maduro

The Global Capital has played a trick by awarding Nobel Peace Prize 2025, apparently resisting the great fiasco criminal racist Donald Trump, to Far - Right, Pro - Capital, Pro - Corporate, Pro - US, Pro - Israel Venezuelan Industrial Engineer turned Politician Ms. Maria Corina Machado (1967 -), who is opining for overthrowing the 'Socialist' Madura Government and for privatization of Venezuelan rich oil reserve from the nationalised state. The highly acclaimed Nobel accolade came when the Imperialist US has enacted a naval blockade to the struggling country besides sanctions and other measures and is also garnering excuses to invade the Latin American Oil Rich Sovereign Country, to overthow the present regime and to install a kowtow government.

Madam Machado, mother of three children and Ex - Member of the National Assembly, is regarded by the US and the West as the crusader of democracy in Venezuela against 'popular' but 'authoritarian' 'Socialist' rules of Hugo Chavez and Nicholas Maduro. She is the leader of 'Sumante', 'Democratic Unity Roundtable', 'Unity Platform' and 'Vente Venezuela' and has received Vaclov Havel Human Rights Prize (2024) and Sakharov Prize (2024) earlier. Later she handed over her Nobel Prize to Trump with gratitude that Trump kidnapped the elected President of Venezuela Mr. Maduro and his wife in a midnight military operation and kept them in a detention centre in the USA.

কবিতা

কাগজের নৌকো

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

“মগর মুঝকো লওটা দো বচপনকা সাওয়ান
উও কাগজ কি কশতি উও বারিষকা পানি…”

উৎসর্গ: ওয়ার বেবিদের জন্য ভালবাসা

তীক্ষ্ণ হুইশেলে ঝলসে উঠলো বারুদ আর
লাল মদে ছিটিয়ে গেল ঝলমলে মাংস ও হাড়
বাঁচাখুচা জীবন কাপড়ে বেঁধে দৌড় দিই
ফুলে ওঠা দুপুরের শব
তার শেষ নিঃশ্বাসের শোক ধরেছি আঁজলায়
কাঁচা মাংস ওজন করে যারা
পাখা ও পল্লবে বিঁধে থাকা লোহাচুর,
ফোঁটা ফোঁটা মধু ও মোমের কাছে
হাত পেতে দাঁড়াই নি আমরা?
পাথরের খোলা মঞ্চ বলো
বলো দেবদারুর দীর্ঘ একাকী
সমস্ত হত্যাকারীর মুখ কেন এক?
মেঘ ভারে আমরা তো ছড়িয়েছি এমন ময়ূর
নুন আর বার্লি খেতে বুলেটের ফাঁক ফোকরে
তাও ঝুলে থাকবে আর্তনাদ?
এত যে নীল নদী ভাসালাম শিরায়
ঢেউয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে আইভরি বা
তার চেয়ে সাদা স্তব্ধতা বলো একবার
ধাতব নলের মুখে কেন গোল হয়ে ঘোরে কাটা স্তন
মাথার গর্তে কেন চটচটে আগুন বেঁধে দেবে কার্তুজ
ফোলা পেটে মেয়েরা ভরে নেবে
রক্ত চোবানো রুটি আর ওয়ার বেবিদের ঋণ
জন্মের তেষ্টায় শোনো তবে
তছনছ করবে ওরা তাবৎ যুদ্ধ একদিন
শুনে রাখো ব্যারাকে ব্যারাকে বৃষ্টি আনবে ওরা
পৃথিবীর উপকূলে ওরা রেখে যাবে
শ্রাবণ… কাগজের নৌকো ভরা দীর্ঘ কবিতা…

অস্তিত্ব

সুপ্তশ্রী সোম

ঝরিয়ে ফেলেছি সমস্ত পালক
রঙিন স্বপ্নের সাথে বিনিময় প্রথায়
এনে ফেলছি সাদা কালো দিন
সাবেকি দোচালায় ডিস্টেমপারের গর্ব
টেরাকোটার দীনতার কাছে যেভাবে হেরে যায়

পালক ঝরাতেই কাঠামোয় টান টান দিব্যতা
দেবী সুলভ মায়ায় ক্ষমা করে দিই সব
লাইটহাউসের অদূরবর্তী আলোয় ভাসা সমুদ্র
আমার অন্ধতার কাছে চাঁদের আলোই

পালকহীন আমি এখন উড়তে ভুলে যাওয়া পোষা পাখি
দাঁড়ে বসে দানা খেয়েই যাচ্ছি খেয়েই যাচ্ছি

সে ভাষার বিরোধী

আর্যতীর্থ

মারাঠি না বলায় কারা যেন মেরে কার মুখ ফাটালো মহারাষ্ট্রতে
সময় নেয়নি সেই ক্ষমা চাওয়া ভিডিওটি ভাইরাল হতে,
পেছনে গর্বিত মারাঠিদের ‘জয় মহারাষ্ট্র’ শ্লোগান।

ভাষার দিনের কথা জ্ঞাত আছে সেই সব ভাষা-মস্তান?

সম্প্রতি কর্নাটকে নাকি ফতোয়া এসেছে
শিক্ষার মাধ্যম যত ইংরাজি হোক,
ভিনরাজ্যের থেকে আসা পড়ুয়ার বাধ্যবোধক
জানতেই হবে কন্নড়…

ভাষার তারিখে তারা উৎসব-পালনে কি হবে তৎপর?

এভাবেই প্রদেশে প্রদেশে, ভাষার খবরদারি
বহুবিভাজিত দেশে আরো খাল কাটে,
আর কোনো ভাষা নেই এই তল্লাটে,
তাই বলে হুংকার দেয় একভাষাভাষী যত রাজনীতি-বোড়ে,

একুশে ফেব্রুয়ারি নিজের ভাষাকে নিয়ে
মিছিলে বেরোবে তারা কখনো কী ভোরে?

তবে যে বাংলাভাষী বাধ্যরত বহুযুগ ভিটেমাটি ছাড়া.
কাজের সুবাদে থাকে অবাংলা-প্রদেশে,
বাংলা বলার দোষে কাঁটাতার পার করে ফেলেছে পুলিশ ওপারে,
সেখানে বিদেশী বলে জেলে গেছে সে…
দুদেশে বেখাপ্পা লোক, জায়গা জোটেনি যার নাগরিক-খাপে,

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলার নাম শুনে তার বুক কাঁপে।

যে ভাষা শাসানি হয় বিভাজক-ঠোঁটে,
যে ভাষা দাবার চাল কারো কোনো ভোটে,
যে ভাষা থামাতে চায় বাকি ভাষা-ভাষীদের জিভ

যে ভাষা এলাকা মেপে ক্রমাগত করে ত্রিসীমানা জরিপ,
যে ভাষা আগ্রাসী,
বুলডোজারের মতো বাকিদের ঘর ভাঙে শাসকের গড় হবে বলে,
যে ভাষা সর্বনাশী,
প্যারাসাইটের মতো আশ্রয়ী ভাষা মারে বিষের ছোবলে,

রবি কাজীর দিব্যি,
ঈশ্বরচন্দ্রের দিব্যি,
আজীবন যেন সেই সব ভাষাদের তীব্র বিরোধী হতে পারি।

কলমে সে শক্তি দিও , একুশে ফেব্রুয়ারি।

লড়াই

(ছাত্র সংগঠক হর্ষেন্দু জানা স্মরণে)

সিদ্ধার্থ সেন

শ্রীকৃষ্ণের মত অষ্টম গর্ভে জন্মেছিলাম
তাই আজন্ম অপুষ্টিতে ভুগেছি
আর সর্ব কনিষ্ঠ বলে
বন্ধু ছিল শুধু কুকুর বেড়াল।
পাঁচ বছরে ডিপথেরিয়া হলো
মরিনি।
ভাঙ্গা হাতেই তেঁতুল পেরেছি,
আঁচারের বয়াম ভেঙ্গে পায়ে কাঁচ ফুটে
সে কী রক্তপাত,
মাকে জড়িয়ে ধরে
কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম—
আর কোনদিন দুষ্টুমি করবো না।
ভুলে গেছি
ফের মাথা ফাটিয়ে বাড়ি ফিরেছি।
মা বলেছে—তোর কোনদিন শিক্ষে হবে না,
সত্যিই হয়নি।

সোত্তরের দশক
সিঁথির অলিতে গলিতে শুধুই বারুদের গন্ধ
স্কুলের দেওয়ালে লেখা—
বন্দুকের নল শক্তির উৎসস্থল,
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
দৌড়ে পালানো বিপ্লবীদের পদসঞ্চার
বোমার বিকট আস্ফালন
আর বদ্ধ ঘরের উৎকণ্ঠা নিয়ে
বড় হোলাম।

নর্দমার জলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা
মেজদার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে
চোখ মুছতে মুছতে বাবা বলেছিলেন—
এ ভাবে হয় না।

সত্যিই হয়নি,
প্রেম হয়নি
চাকরি হয়নি
বয়স কালে ভুঁড়ি হয়নি
চুলে পাক ধরেনি
বন্ধুরা বলে—বুদ্ধিও হয়নি।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে
কুকুরগুলো লেজ নাড়ে,
গোলা পায়রা গুলো
হাতে বসে দানা খায়,
চায়ের দোকানে হাসাহাসির রোল ওঠে।
লোকে বলে—
বোকা।

বড়দা একবার রাগ করে বলেছিল -
তোর কিচ্ছু হবে না।
সত্যিই কিচ্ছু হয়নি,
তবে যা হয়েছে তাই বা মন্দ কি।

অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনের প্রসাদ খেয়ে
তক্তপোষে পিঠ ঠেকাতেই
ঘুম এসে যায়,
মাঝরাতে মৃত্যু ভয়ে আতঁকে উঠি না,
শুধু স্বপ্ন দেখি—
ফুল; পাখি; ঝর্নার,
আর কল্পনা করি
হিমশৈলের চূড়া ভেদ করে
একদিন চাগিয়ে উঠবে
রক্তিম সূর্য্য।

সত্যিই কিছু হয়নি
তবু, ভালো আছি।
হয়তো কিছু না হয়েও
এভাবেই ভাল থাকা যায়,
যখন সমাজটাকে সংসার
পৃথিবীটাকে দেশ বলে মেনে নিয়ে,
অগণিত ব্যর্থতার মিছিলে
হর্ষেন্দুরা স্লোগান তোলে—
লড়াই লড়াই লড়াই চাই
লড়াই করে বাঁচতে চাই।

ছোটগল্প

শম্বুক

হিন্দি মূল রচনা: যশপাল

বাংলা রূপান্তর: দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

[লেখক পরিচিতি: সম্পূর্ণ নাম : যশপাল সিংহ

জন্ম: ০৩ ডিসেম্বর, ১৯০৩; মৃত্যু: ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬

মুন্সি প্রেমচাঁদ পরবর্তী পর্বে যে সকল যথার্থবাদী, প্রগতিশীল সাহিত্যিক হিন্দি ভাষায় কলম ধরেছিলেন যশপাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষত সশস্ত্র বিপ্লবে তিনি ছিলেন একজন পুরোভাগের বিপ্লবী। ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, আজাদের সহকর্মী ছিলেন যশপাল। চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যু হলে তিনি হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির কমান্ডার-ইন-চিফ নির্বাচিত হন। পশ্চিম ও উত্তরভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত একাধিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে ও প্রবল শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৩৮ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয় ও কড়া নজরদারিতে রাখা হয়।

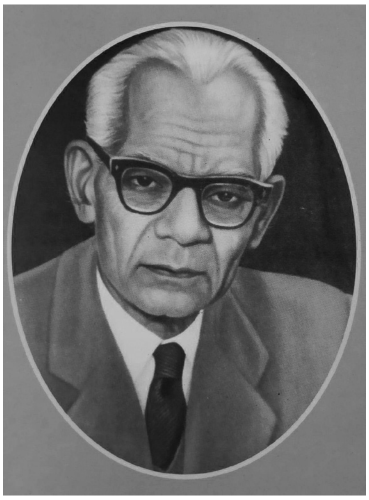

দেশভাগের যন্ত্রণা, অন্ধধার্মিকতা, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল প্রতিবাদী মানুষের ভাষা। সমাজের শোষিত, নিপীড়িত মানুষের তিনি ছিলেন আপনজন। যথার্থবাদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি সর্বদাই সমাজও দেশকে বদলাতে চাইতেন। ভারত সরকার ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মান ও এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। এই মহান সাহিত্যিকের নানা ছোটগল্পের বাংলা রূপান্তর মাঝে মাঝেই এই পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় আগে ছাপা হয়েছে। পত্রিকায় বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত ‘শম্বুক’ গল্পটি সাহিত্য অ্যাকাডেমি দ্বারা প্রকাশিত ‘যশপাল রচনা সঞ্চয়ন’ পুস্তক থেকে আহরিত। এই প্রয়াসে আমরা একই সাথে সাহিত্য অ্যাকাডেমি ও যশপালজীর পরিবারের কাছে ঋণী।]

মুদগল্ নগরীতে দাস ও শূদ্ররা বিদ্রোহ শুরু করলে নগরীতে প্রবল অরাজকতা দেখা দেয়। বংশানুক্রমে প্রচলিত দ্বিজ-ব্রাহ্মণদের সেবাকার্য করতে তারা অস্বীকার করে। এবং বিপ্রদের ন্যায় তারাও যপ-তপ, সাধন-ভজনে আগ্রহী হয়।

মহর্ষি বজ্রাহুতির কর্ম-কাণ্ড, জ্ঞান-নিষ্ঠার যশোগাধা সে সময় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহর্ষির ‘আত্মবাদ’ মিথিলাধিপতি ‘বিদেহ’ জনকরাজ আরো প্রতিষ্ঠিত করেন। আত্মবাদের মূলকথা: কর্মের সাথে ফল ও আসক্তির অবিভাজ্য সম্বন্ধ। এমন কি সুকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত সুফলও অবিনাশী আত্মাকে জীবন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মোক্ষলাভে বাধা দেয়। শাশ্বত আত্মা কেবলমাত্র কর্মশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলেই পরমানন্দের সন্ধান পেতে পারে।

মহর্ষি কর্ম থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে পরমানন্দের খোঁজে আশ্রম ছেড়ে একান্তে কোন এক নির্জন স্থানে অন্তর্হিত হলেন। প্রভুর অন্তর্ধানে তারই মতবাদে প্রভাবিত হয়ে মহর্ষির দাস শম্বুক পরমানন্দ প্রাপ্তির আশায় মুদগল্ নগরীতে এসে পৌঁছায়। তবে প্রভুর মতো একান্তে ও একাকী নয় শম্বুক চাইল ক্লেশকর জীবনে আবদ্ধ নগরীর সকল দাস ও শূদ্ররাও যাতে সেই পরমানন্দের খোঁজ পায়। তাই মুদগল্ নগরীর সকল দাস ও শূদ্রদের আবাহন করে বলে— অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্যই তারা ইহলোকে সকল সুখভোগে বঞ্চিত তো আছেই, যজ্ঞ, জপ-তপ আদির আয়োজন ও সুসম্পাদন করতে না পারলে পরলোকেও তাদের জীবন অনন্ত কষ্টকর হবে। পরম সুখ ও চরমমুক্তি বিপ্রসেবায় দ্বারা আহরিত হবে না, কেবল জপ-তপ, সাধনের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির মাধ্যমেই সেই পরমসুখ মিলবে।

সে আরও বলে যে শূদ্র ও দাসেরা নিজেদের ভুলেই অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও ক্লেশকর জীবন যাপন করে। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম যা একান্তই জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন বলে মনে হয় তাও মনের মাঝে উদ্ভুত এক ভ্রম মাত্র। এগুলির অভাবে শরীরে যে কষ্ট অনুভূত হয় তাকে আরও শারীরিক ক্লেশের দ্বারা জয় করতে হবে। এই মানসিক ভ্রমকে জপ-তপের দ্বারা আহরিত জ্ঞানের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব।

ধীরে ধীরে মুদগল্ নগরীর দাস ও শূদ্রেরা শম্বুকের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে বিপ্র-ব্রাহ্মণ-সেবা পরিত্যাগ করে। কিন্তু জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম সামগ্রীর অভাবে বিশেষতঃ ক্ষুধার জ্বালায় তারা অত্যন্ত কষ্ট পেতে লাগল। শম্বুক তাদের কঠোর তপস্যার অঙ্গ হিসাবে আরও বেশী বাহিরী শারীরিক ক্লেশের দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে জয় করতে উৎসাহিত করল। তার উপদেশে শূদ্রজন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে শরীরের চর্মকে তপ্ত করে শূলশয্যায় শয়ন করে। শরীরে শলাকা প্রবিষ্ট করে ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভ্রমকে দূর করে পরমমুক্তি জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হলো।

মুদগল্ নগরীর বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থা প্রয়োজনীয় দাস ও শূদ্রের সেবাকর্মের অভাবে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস, যম-নিয়ম কোনোকিছুই আর সঠিকভাবে পালন করতে পারল না। সর্বত্র অরাজক অবস্থা দেখা দিল।

মহাজ্ঞানী ঋত্বক ঔর্হি সে সময় এক মহা যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। দীর্ঘ কঠিন রোগভোগে শয্যাশায়ী তার একমাত্র পুত্র কেবলমাত্র দাস-দাসীদের পরিচর্যাতেই বেঁচে ছিল। কিন্তু তারা কর্ম পরিত্যাগ করে বিদায় নিলে পুত্রের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুত্রের অসহায়তা যাজ্ঞিক ওর্হিকে অত্যন্ত ব্যাকুল করে তোলে। যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রেখে তিনি মহা অনিয়ম করে পুত্রের পরিচর্যায় মন দেবেন নাকি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে মহাপূণ্য অর্জন করবেন তাই নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়লেন।

অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে পুত্র-কলহ, ধন-সম্পদ কেবল ইহলোকের সাথী। পরলোকের একমাত্র সাথী হল ধর্ম। যাবৎ সাংসারিক সুখ সবই পুণ্যকর্মের ফল মাত্র। তাই সর্বাগ্রে পুণ্যকার্যই সমাধা করা উচিত।

মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হল বটে কিন্তু যথোপযুক্ত সেবা-পরিচর্যার অভাবে তার পুত্রেরও মৃত্যু ঘটল। পরমজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও ঋত্বক পুত্রশোকে অধীর হয়ে গেলেন। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তার মন। মহাযজ্ঞের ন্যায় পুণ্যকর্মের ফলরূপে তিনি পেলেন একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক। ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি তার সুগভীর আস্থা অবিশ্বাসে পরিবর্তিত হলো।

তারপর সময়ের পরিণতিতে পুত্রশোক সংহত হলে তিনি ভাবতে থাকলেন পৃথিবীতে মহাপাপ সংক্রমিত না হলে দেবতাদের কোপ এত ভয়ঙ্কর হতে পারেনা। গভীর চিন্তায় ডুব দিয়ে তিনি এই মহাপাপের উৎস খুঁজে পেলেন। দেশে বর্ণাশ্রম প্রথা লোপ পাওয়ার কারণেই যে অরাজকতা, অশান্তি ও অন্যায়ের প্রার্দুভাব ঘটেছে তার ফলেই সংঘটিত হয়েছে এই মহাপাপ। শূদ্র ও দাসেরা দ্বিজ-ব্রাহ্মণদের কর্ম জপ-তপ, সাধন-ভজনে মগ্ন হয়েছে আর ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হয়েছে শূদ্রদের কর্ম করতে। বংশানুক্রমে চলে আসা কর্ম-নিয়মশৃঙ্খল ভাঙ্গার মহাপাপের জন্য মর্ত্যের দেবতা বিপ্র-ব্রাহ্মণকে পুত্র নিধনের মহাশোক পেতে হলো। অতঃপর নিজের পুত্রশোককে ব্যাপক রূপ দিয়ে ঋত্বকের হৃদয় এই মহাপাপের প্রতিকার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মহাজ্ঞানী ঔর্হি ঋত্বক এই পাপের প্রতিকারকল্পে ভক্তবৎসল রঘুকুল সূর্য ভগবান রামের শরণে অযোধ্যা রওনা দিলেন। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণের আগমণ সংবাদ পেতেই ভগবান নগ্নপদে প্রাসাদ দ্বারে দৌড়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। করজোড়ে বললেন, ''হে ভূদেব, পৃথিবীতে আপনাদের বাণীই ধর্ম ও নিয়ম। ব্রাহ্মণদের আর্শীবাদেই ক্ষত্রিয়রা রাজসিংহাসনে বসে রাজ্যে ধর্ম ও ন্যায় রক্ষা করে। আপনার এই দাস আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত। শুধু আদেশ করুন।''

মহাজ্ঞানী ঔর্হির মুখে মুদগল্ নগরীতে মহাপাতকদের স্পর্ধা ও বিপ্রদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে ভক্ত বৎসল রাম তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর মাটিতে পুনরায় ধর্ম সংস্থাপনায় সংকল্পবদ্ধ হলেন। তাঁর চতুরঙ্গিণী অজেয় সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি মুদগল্ নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শম্বুকের অনুগামীরা সকলে মুদগল্ নগরী সংলগ্ন এক উপবনে একত্রিত হয়ে নানারকম মুদ্রায় ও উপাচারে কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত হয়ে শারীরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভ্রম দূর করে পরমানন্দের খোঁজে সচেষ্ট ছিল তখন। দুষ্ট দমন ভগবান রামের বীর সৈনিকেরা প্রথমেই মুক্তিকামী ধর্মাদ্রোহী শূদ্রদের বন্দী করে ময়দানে একত্রিত করল। ভগবান রাম অতঃপর কৃপাণ হাতে শম্বুকের গুহায় প্রবেশ করলেন। শম্বুক সেখানে জ্বলন্ত অগ্নির পঞ্চকুণ্ড বানিয়ে তার কেন্দ্রে শীর্যাসনে মুক্তি কামনায় মগ্ন।

ভগবান রাম গুহায় প্রবেশ করে শম্বুকের কেশাকর্ষণ করে তাকে টানতে টানতে গুহার বাইরে এনে বিস্মিত দৃষ্টিতে দন্ডায়মান ব্রাহ্মণ ও পিছনে বন্দী দাস ও শূদ্রদের চোখের সামনে শম্বুককে আছড়ে ফেললেন।

শম্বুক নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চোখের সামনে আভামণ্ডলে আবৃত সর্বদুঃখহরণ মোক্ষদাতা নয়নাভিরাম সাক্ষাৎ ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে শিহরিত হয়ে উঠল। তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে বলে উঠল ''আজ আমার তপস্যা সফল। হে ভগবান আমায় মুক্তি ভিক্ষা দিন''। এই বলে সে দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে শ্রী রামের উদ্দেশ্যে মেলে ধরল।

অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের দুনয়ন রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি শম্বুককে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন ''ওরে মুর্খ! মুক্তি ব্রাহ্মণের প্রাপ্য, শূদ্রের নয়।''

শম্বুক কাতর কণ্ঠে ভগবানের কাছে ন্যায় যাচনা করল।

''প্রভু এবং ব্রাহ্মণের কথা-প্রবচনই ন্যায়!'' মেঘমন্দ্রিত স্বরে উত্তর দিলেন শ্রী রামচন্দ্র। তারপর তার দক্ষিণহস্তের কৃপাণ শম্বুকের স্কন্ধে এসে ঠেকল।

শম্বুক চোখ তুলে স্কন্ধোপরি কৃপাণে দৃষ্টিপাত করে আরো একবার কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ''ভগবান এই কি তবে আপনার ন্যায়?''

মহাক্রোধে ভগবান প্রবল গর্জনে বলে উঠলেন ''ওরে পামর। শুনিসনি আমার কথা—ব্রাহ্মণের প্রবচনই হল ন্যায়।''

এতক্ষণে মাথা উঁচু করে সরাসরি ভগবানের চোখে চোখ রেখে স্মিতহাস্যে শম্বুক ব্যাঙ্গের সাথে উত্তর দিল ''তবে তো মুক্তিলাভে আমার আর কোনো ইচ্ছাই নেই।''

''মহাপাতক!'' প্রবল ক্রোধে ভগবানের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হল শব্দটি। পরক্ষণেই শম্বুকের উঁচু মাথা ভগবানের কৃপাণের এক কোপে মাটিতে এসে পড়ল।

ভগবান অগ্নিদৃষ্টিতে বন্দী শূদ্রদের দিকে তাকালেন। তারা সকলে মাথা নিচু করে ক্ষমা প্রার্থনায় স্থির।

বিপ্র-ব্রাহ্মণেরা শ্রীরামচন্দ্রের জয় জয়কারে মুখর।

পৃথিবীতে আরো একবার ধর্মরাজ্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হল। মুদগল নগরীতে আবার নতুন করে শুরু হল বর্ণাশ্রম কর্মশৃঙ্খল প্রথা।

ছায়ানট
Chhayanaut
ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবন, বাড়ি ৭২, সড়ক ১৫এ, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৮

ছায়ানটের প্রতিক্রিয়া

১৮ তারিখ রাত ১২টার পর ওসমান হাদির মর্মান্তিক মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে একজোট লোক ছায়ানট-সংস্কৃতি ভবনে জোরপূর্বক প্রবেশ করে ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালায় এবং অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। তারা ছয়তলা ভবনের সকল সিসি ক্যামেরাসহ অধিকাংশ কক্ষ, প্রক্ষালণ কক্ষ এবং বহু বাদ্যযন্ত্র, মিলনায়তন, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে। সার্ভারসহ ছায়ানটের কিছু বাদ্যযন্ত্র ও আসবাবপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। অন্তত ৭টি ল্যাপটপসহ গোটা চারেক ফোন ও কিছু হার্ড ডিস্ক লুঠ করেছে। তাদের ভাঙচুরে বৈদ্যুতিক সংযোগ ও সরঞ্জামও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ছায়ানট একটি স্বেচ্ছাসেবী ও স্বনির্ভর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ছায়ানট কোনো সরকার, বিদেশি সংস্থা বা কর্পোরেট অনুদান গ্রহণ করে না। সুতরাং, ছায়ানট আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই ক্ষতিপূরণ করবে। সঙ্গীত এবং শিশুদের সাধারণ শিক্ষায় এই সাময়িক বিঘ্নের দ্রুত প্রতিকার করতে বদ্ধপরিকর।

ছায়ানটের কাজের ক্ষেত্র রাজনীতি নয়, সঙ্গীতসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বাঙালী জাতিসত্তাকে ধারণ করে ছায়ানট। ছায়ানট সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সমাজ গড়তে প্রয়াসী। আমরা ওসমান হাদির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে শোকাহত। কিন্তু ওই সূত্র ধরে ছায়ানট-সংস্কৃতি ভবনে কেন হামলা সংঘটিত হলো তা মোটেই বোধগম্য নয়। হয়তো, পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছে সংস্কৃতি চর্চার বিরোধী গোষ্ঠী।

ছায়ানট এই উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ অনানুষ্ঠানিক সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশে সমাদৃত। বাংলা গানের চর্চা বিস্তৃতির পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে ছায়ানটের ভূমিকাও সারা বিশ্বে স্বীকৃত। তাই ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে এই নিন্দনীয় হামলা মাতৃভূমি সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে পারে বিশ্বে।

দেশ ও বিদেশ থেকে যে অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জানিয়েছেন, তাঁদের সকলের কাছে ছায়ানট কৃতজ্ঞ।

বাঙালির আবহমান সঙ্গীতসংস্কৃতির সাধনা ও প্রসারে ছায়ানট তার স্থির প্রত্যয় যাত্রায় অবিচল থাকবে।

লাইসা আহমদ লিসা
লাইসা আহমদ লিসা
সাধারণ সম্পাদক

সারওয়ার আলী
সভাপতি

Chhayanaut Shangsa-Bhavan House 72 Road 15A Dhanmondi R/A, Dhaka 1208 201730482462
website: www.chhayanaut.org email chhayena@gmail.com facebook: facebook.com/groups/chtwanaut
youtube: bit.ly/chhayanaut

ব্যারেজ নয় নদীর জীবন ফেরত চাই
আদি গঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন
অবিরল-নির্মল স্রোতধারা, পরিচ্ছন্ন কিনারা

সাথী,

কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীন নদী আদি গঙ্গা। প্রকৃতির নিয়মে ও ব্রিটিশ যুগের শেখানো দখলদারি মানসিকতায় আদি গঙ্গা নদীর টালিনালা নাম হয়েছে আদও তা নয়। নদী বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার প্রবাহ পথ থেকে। যদিও আজ সেই নালা শুধুই নর্দমা। কিন্তু ইতিহাস বিচ্ছিন্ন হয়ে আর কতদিন? নদীকে নদীর মতো করে বোঝা ও তার পুনর্জীবন দরকার। জলবায়ু পরিবর্তন ও কংক্রিট উন্নয়নের আগ্রাসন থেকে অবিরল-নির্মল ধারা পরিচ্ছন্ন কিনারা ফিরে পাওয়া নদীর পাড়ের মানুষের সাংবিধানিক ও নৈতিক অধিকার। যদিও সেই বিষয়ে নদী পাড়ের মানুষেরা দুঃখের হলেও এখনও উদাসীন।

এরই মধ্যে কলকাতা পৌর সংস্থা আদি গঙ্গার উৎস মুখ দইঘাটের কাছে নদী প্রবাহ পথে বাধা সৃষ্টি করে ৪২ মিটারের ব্যারেজ ও পাম্প হাউস তৈরি করতে চলেছে। ঐ স্থানে প্রতিদিন আদি গঙ্গায় ২৬ মিটারেরও বেশি বিস্তারে জোয়ারের জল ওঠা নামা করে। স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে বিপুল জল-পলি রাশি এই জলরেখায় হুগলী-গঙ্গা থেকে কলকাতার জলপথে প্রবেশ করে। পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বর্ষার জলের নিকাশি আদি গঙ্গার প্রাচীন পথ, টলি নালার ধারা ও নারায়ণপুর খাল হয়ে কাটাখাল পথে দক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়। পৌরসভার প্রস্তাবিত ব্যারেজটিতে চারটি স্লুইস গেট থাকবে, জল-পলির প্রবাহ যাওয়া আসা করার জন্য। ধরা যাক চারটি গেট সারা বছর খোলা থাকবে অতি বর্ষায় বা বর্ষার জোয়ারের সময় ব্যতিত অন্য সময়ে। তাহলেও কেবলমাত্র ১২-১৫ ফুটের অধিক জলপথ থাকছে না। ৪২ মিটার কংক্রিটের নির্মাণ প্রাচীন এই শাখা নদীর প্রবাহ পথে ভয়ংকর বিঘ্ন সৃষ্টি করবেই। আমরা জানি, কংক্রিটের এই নির্মাণ তৈরি করতে নীচের গভীরে এক স্থায়ী কংক্রিটের ভিত তৈরি করতে হবে। স্বভাবিকভাবেই বোঝা যায় স্লুইস গেটের মাধ্যমে জল আসা যাওয়া সম্ভব হলেও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে তৈরি হবে স্থায়ী পরিকাঠামো। নগরায়নের যুগে নদী ব্যবহারের ধারণা পদ্ধতি শিখিয়েছিল নদীর উপরে বাধা সৃষ্টি করে জল প্রবাহ কে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কিন্তু বিগত ১০০ বছরের নদী ব্যবহারের এই ধারণা-পদ্ধতির অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। ফারাক্কা থেকে গাজলডোবা। সাম্প্রতিক তিলপাড়া ব্যারেজের ফাটল স্পষ্ট করেছে, যে নদী ব্যবহারের ধারণা-পদ্ধতির বদল করার সময় এসেছে। নদীকে অবিরল বইতে দেওয়া মানব সভ্যতার সহায়ক।

শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের অধিকার বন্ধক রেখে ব্যারেজ-বাঁধ-ব্রিজের উন্নয়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা সকলের সামনে সহজ বোধগম্য সাধারণ জ্ঞান। কোন বাঁধ-ব্যারেজ দীর্ঘস্থায়ী সমাজের সর্বস্তরের মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম নয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও জৈব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি আজ নতুন করে 'উন্নয়ন-বিকাশ-Development' শব্দকে পুনঃবিশ্লেষণ করতে বাধ্য করছে। গবেষণা দেখাচ্ছে গঙ্গা অববাহিকায় ভূগর্ভস্থ ও নদীর জল-পলির প্রবাহে অস্বাভাবিক ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এই সময় ব্যারেজ নয় নদীর জীবন ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি।

সার্বিক দৃষ্টিকোণে আদি গঙ্গা কে দেখা জরুরি, কলকাতার মধ্যে ১৫.৫ কিমি নদী সংস্কার একমাত্র বিচার্য্য মাপকাঠি নয়। কলকাতা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে অববাহিকার ভূমিরূপ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রয়োজন। কলকাতায় ব্যারেজ কখনোই স্থায়ী সমাধান নয় মত দিয়েছেন কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ, রাজনৈতিক সংগঠন, নদী কর্মীরা ও সর্বোপরি নদী পাড়ের মানুষেরা।

নদীপাড়ের মানুষদের উৎখাত না করিয়ে বরঞ্চ তাদের বাসস্থানে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা করে আদি গঙ্গার পুনর্জীবন সম্ভব। নদী খাতে দীর্ঘকালের জমা পলি ও বর্জ্য নদীর জল বহনের যোগ্যতাকে ব্যহত করেছে। ব্যারেজ নির্মাণ সেই সমস্যা কোনভাবেই লাঘব হবে না। বরঞ্চ পলিস্তর আরো বৃদ্ধি করবে। সুতরাং নদীখাত পুনরুদ্ধারের মাধ্যমেই নদীর জল বহন ক্ষমতা বাড়লে শহরে জল ঢোকার সম্ভাবনা কমবে। পয়ঃপ্রণালীর যে মুখ গুলি থেকে আদি গঙ্গার জল ভবানীপুর, কালীঘাট সহ শহরের যে যে অঞ্চলে প্রবেশ করে সেই গেট গুলির সুবন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। নদী পাড়ের বাসিন্দাদের পৌরসভার স্থায়ী নিয়োগের মধ্য দিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জরুরি।

পৌর সংস্থাকে দই ঘাটের কাছে ব্যারেজ প্রকল্প যা আদিগঙ্গা নদী পাড়ের মানুষের নানাবিধ সংকটকে বাড়াতে চলেছে এবং তা শুধুমাত্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপালটি, বারুইপুর, থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ জলের সামঞ্জস্য সহ মাছ চাষ ও কৃষিকাজে মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনবে।

এই ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে সমস্ত স্তরের মানুষকে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাই।

আদি গঙ্গা বাঁচাও

ব্যারেজ নয় নদীর জীবন ফেরত চাই

'আদি গঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে তাপস দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত; যোগাযোগ: +919830779291%+919804990582

খবরাখবর

- ৮,০৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে বৈরাবি-মাইরাং ৫১.৩৮ কি.মি. ব্রডগেজ রেল লাইন সম্পূর্ণ হওয়ার পর মিজোরামের রাজধানী আইজলের সঙ্গে দেশের রেল সংযোগ স্থাপিত হল। পাহাড় অরণ্য কেটে এই অংশটি সম্পূর্ণ করতে ১২.৮৫ কি.মি. ব্যাপী ৪৮টি টানেল এবং ৫৫টি ব্রিজ তৈরি করতে হয়েছে যার মধ্যে সাইরাং সেতু দেশের সর্বোচ্চ ১১৪ মিটার। ১৩ সেপ্টেম্বর '২৫ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাইরাং থেকে (১) সাইরাং-আনন্দবিহার (দিল্লি) সাপ্তাহিক রাজধানী এক্সপ্রেস, (১) সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস (সপ্তাহে তিনদিন) এবং (৩) দৈনিক সাইরাং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস উদ্বোধন করলেন।
- ভেনিস চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানে ওরিজোন্তি বিভাগে প্রথমবার সেরা ভারতীয় পরিচালক পুরুলিয়া কন্যা অন্নপূর্ণা রায় তাঁর 'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' এর জন্য।
- লাদাখে নিয়ন্ত্রণরেখার নিকটে খারদুংলা (১৮,৩৮০ ফুট) ও উমলিংলা (১৯,০২৪ ফুট)-র পর মিগলা (১৯৪০০ ফুট) এ উচ্চতম সড়ক নির্মাণ করে নজির সৃষ্টি করল 'বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বি.আর.ও)'।
- কাজিরাঙ্গার মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে এসেছে বিপন্ন প্রজাতির পেইনটেড স্টক বা রঙিলা বক।
- বন দপ্তরের সমীক্ষায় জানা গেছে যে হিমাচল প্রদেশে স্পিতি, তাবো প্রমুখ উচ্চ পাহাড়ি এলাকায় তুষার চিতাবাঘ বা স্নো লেপার্ডের (প্যান্থেরা উনসিয়া) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ সহ বিস্তীর্ণ হিমালয় পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই বিপন্ন প্রাণীটির অস্তিত্ব রয়েছে।
- জার্মান শেপার্ড বা ডোবারম্যানের মত বিদেশি প্রজাতির বদলে রামপুর হাউণ্ড ও মুধোল হাউণ্ডের মত দেশিয় প্রজাতির শিকারি কুকুরের উপর ভারতীয় সেনা ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সীমান্ত পাহারায় নির্ভর করতে শুরু করেছে। এরা ক্ষিপ্র দক্ষ ভারতীয় পরিবেশে মানানসই। এদের রক্ষণাবেক্ষণের খরচও অনেক কম।
- অসম সরকার তাই অহোম, ছতিয়া, মোরান, মোটোক, কোচ-রাজবংশী এবং চা-জনজাতিদের 'সিডিউল্ড ট্রাইব (ST) তালিকাভুক্ত করলেন। এর প্রতিবাদে বোড়ো ছাত্রসংগঠন প্রতিবাদ করে।
- ভারতের ২.৭৬% জনসংখ্যা কেরলের, কিন্তু ভারতের ৪০% সেবিকা বা নার্স কেরলের। মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগর অঞ্চলে, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচুর কেরলের নার্স কর্মরত।
- একের পর এক খোলামুখ খনির জন্য যেমন অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে তেমনই পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের ধিরাউলিতে আদানি গোষ্ঠীর কয়লা খনি প্রকল্পে অবাধে অরণ্য ধ্বংস করার অভিযোগ।
- ১৯২৫-র বাঁল দ্য ট্রফি পুরুষ ও মহিলা ফুটবলারদের মধ্যে পেলেন উসমান দেম্বলে (পি.এস.জি., ফ্রান্স) এবং আইতানা বোনমাতি (বার্সেলোনা, স্পেন)।
- 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' নিয়ে তাঁদের কাজের জন্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ২০২৫-র নোবেল পেলেন মেরি ই ব্রুনকো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), শিমন সাকাগুচি (জাপান) ও ফ্রেড আসেডেল (মা:যু); 'কোয়ান্টাম টানেলিং-র গবেষণার জন্য ফিজিক্সে এম. মার্টিনিস, জন ক্লার্ক ও মিশেল ডেভোরেট (মা:যু:); 'মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক' তৈরির জন্য রসায়নে সুসুমু কিটাগাওয়া (জাপান), রিচার্ড রবসন (অস্ট্রেলিয়া) ও ওমর ইয়ামি (মা:যু:)। সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরীয় সাহিত্যিক লাসলো ক্রাজনাহর্কাই। ভেনেজুয়েলার সরকার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো পেলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। প্রগতির সঙ্গে অর্থনীতির সাযুজ্য গবেষণায় অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন জোয়েল মকির (মা:যু:), পিটার হওয়িট (কানাডা) ও ফিলিপ আগিয়ঁ (ফ্রান্স)।
- কোন বৃত্ত ও ব্যাসের অনুপাত হল 'পাই'। 'পাই' এর মান ধরা হয় ৩.১৪। 'পাই'এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজমের সূত্র ধরে 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-র 'সেন্টার ফর হাই এনার্জি ফিজিক্স'-র গবেষকরা জটিল গণনা ও সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে দশমিকের পরে কোটি তম ডিজিট অবধি নির্ধারণ করতে পেরেছেন।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পকে রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ফুড অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন' (এফএও) স্বীকৃতি দিয়েছে। একইসঙ্গে গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি ও কনকচুর চালকে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্য হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে তারা।
- মদ বিক্রি নিষেধের মত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন বিহারের ১০ বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। পশ্চিম চম্পারণে 'সমৃদ্ধি যাত্রা'র সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করল বিহার সরকার এপ্রিল ২০২৬ থেকে।
- কুনো জাতীয় উদ্যানে এদেশের জঙ্গলে জন্মানো আফ্রিকা থেকে আনা চিতার সন্তান গামিনী চারটি শাবকের জন্ম দিল।
- ৩০ এপ্রিল '২৬ থেকে জম্মু-শ্রীনগর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলাচল শুরু হল। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে কাশ্মীর উপত্যকার এই পাঁচ ঘণ্টার যাত্রাপথে অনেকগুলি ব্রিজ ও টনেল পার হতে হয়। তারমধ্যে ৩৫৯ মিটার উচ্চতার চেনাব ব্রিজের অবস্থান আইফেল টাওয়ারের চাইতেও ৩৫ মিটার উঁচু।
- বৃহত্তম ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা 'সান ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাষ্ট্রিজ' রেকর্ড ১১.৭৫ বিলিয়ন ডলার প্রায় ১.১৭ লক্ষ কোটি

টাকা দিয়ে মার্কিন 'অর্গাননন অ্যাণ্ড কো.' কে অধিগ্রহণ করল। এর আগে ১২ বিলিয়ন ডলার দিয়ে ২০০৭এ টাটা স্টিল যুক্তরাজ্যের কোরাস গোষ্ঠীকে অধিগ্রহণ করেছিল।

- আয়ারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ২০২৬ আইবিএসএফ বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানশিপে জয়ী প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মনোজ কোঠারির পুত্র কলকাতাবাসী সৌরভ কোঠারি।
- নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন প্রাক্তন ভারত সরকারের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা, অর্থমন্ত্রকের উপদেষ্টা; বিশিষ্ট অর্থনীতিক অশোক লাহিড়ী।
- কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে যাতায়াত ও বাণিজ্যে গতি আনতে হুগলীনদীর নিচ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করে হাওড়ায় জাতীয় সড়ক ১৬কে তে এলিভেটেড করিডর বানিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হবে।
- ২০২৬-'২৭ আর্থিক বছরে ১৪,২০৫ কোটি টাকার প্রকল্প সহ এক লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্প পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এর মধ্যে শিলিগুড়ি-দিল্লি ছ ঘণ্টার বুলেট ট্রেন, ডানকুনি-সুরাত 'ইস্ট-ওয়েস্ট ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর' উল্লেখযোগ্য।
- ৬ জুন নয়া দিল্লির যন্তর মন্তরে মূলত জেন জি দের সংগঠন' ককরোজ জনতা পার্টি (সিজিপি)' নিট প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, সিবিএস-ই পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে গোলমালের দায় নিয়ে মোদি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। উপস্থিত ছিলেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং বেশ কিছু বিরোধী দলের নেতা।
- ২০২২ সালে ব্যাঘ্রসুমারিতে সুন্দরবনে ১০১টি বাঘের অস্তিত্ব জানিয়েছিল বনবিভাগ। ২০২৫-র ব্যাঘ্রসুমারিতে সেখানে ১১০টি বাঘের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।
- হাওড়ার সাঁকরাইলের শিল্পতালুকে 'আমূল' ৬৫০ কোটি টাকার একটি আধুনিক কারখানা তৈরি করতে চলেছে যেখানে দৈনিক ১০ লক্ষ কেজির দই ও ১৫ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকবে।
- কেনিয়া, উগাণ্ডা ডি. আর. কঙ্গোয় ইবোলা হেমোরেজিক ফিভারের মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। কঙ্গোয় শতাধিক মৃত্যু ঘটেছে।
- ষষ্ঠ জাতীয় স্বাস্থ্য পারিবারিক সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৩৬.৪%-র ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে গছে যা দেশের মধ্যে শীর্ষে।
- ২০২৪ এর শীতে মহারাষ্ট্রের তাদোবা-আন্ধেরি অরণ্য থেকে সদ্য যুবতী দুটি বাঘিনীকে এনে ওড়িশার সিমলিপাল অরণ্যে ছাড়া হয়েছিল সেখানকার বাঘেদের অন্তর্প্রজনন ও কালো বাঘ জন্মানো আটকাতে। এর মধ্যে একটি বাঘিনী জিনাত ৩০০ কিমি বেশি পথ পেড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে উপস্থিত হয়। পরে তাকে ধরে আবার সিমলিপালে পাঠানো হয়। সেখানে ২০২৬এর গ্রীষ্মে সে চারটি শাবকের জন্ম দেয়।
- ইয়াং শুয়াংজি রচিত এবং লিন কিং অনুদিত 'তাইওয়ান ট্রাভেলস' ২০২৬এর বুকার প্রাইজ পেল।
- বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় শ্যাম ষ্টীল ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণের পর হাওড়ার সাকরাইলে আমূল বৃহত্তম দই তৈরির কারখানা তৈরি করল।

ভিভা রদ্রি, ভিভা স্পেন

অনেক বছর পর কোন ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরে কোন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হলেন। দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ী দুর্ধর্ষ স্পেন দলের হৃদপিণ্ড বলুন বা ডায়নামো বলুন এই ৩০ বছর বয়সী ৬'৩" উচ্চতার কুশলী খেলোয়াড় রদ্রিগো হার্নান্দেজ ক্যাসকান্তা বা রদ্রি। সারা মাঠ চষে খেলেন, বিপক্ষকে রুখে দেন আর ফরোয়ার্ড দের কম্পাসের মত পাশের পর পাশ বাড়ান। প্রয়োজনে গোল করে আসেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে লীগ ম্যাচ গুলো থেকে ফাইনাল অবধি দুর্দান্ত খেলে গোল্ডেন বল পেলেন।

স্পেনের জাতীয় দলের এই অধিনায়ক ২০২২ ও ২০২৬ দুটো ফিফা বিশ্বকাপ খেলেছেন, তারমধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপ ও গোল্ডেন বল জয়। ২০২০ ও ২০২৪ এ দেশের হয়ে দুবার উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ এ খেলেছেন, তারমধ্যে ২০২৪ এ চ্যাম্পিয়ন ও প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট হন। দেশের হয়ে ২০২৩ এ উয়েফা নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়ন ও বেস্ট প্লেয়ার অফ দ্য ফাইনাল। ২০২৪ এ পান 'ব্যালন দ্য অর'।

দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে দল ও ব্যক্তিগত অনন্য নজিরের পর ক্লাব স্তরেও বিরল সব কৃতিত্ব।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের হয়ে স্পেনে লা লিগা খেলার পর ২০১৯ এ ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টার সিটি দলে যোগ দেন।

ম্যানচেস্টার সিটি ২০২০ - '২১ থেকে পরপর চারবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয় করে। এছাড়া দুবার এফএ কাপ ও অন্যান্য ট্রফি।

ম্যানচেস্টার সিটি ২০২৩ এ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়। রদ্রি ফাইনালের একমাত্র স্কোরার, প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ এবং টুর্নামেন্টের প্লেয়ার অফ দ্য সিজন। এছাড়াও ম্যানচেস্টার সিটি ২০২৩ এ ফিফা ক্লাব ওয়ার্ড কাপ জয় করে।

এবারের বিশ্বকাপে পাও কুবারসি, উনাই সিমন, জুড বেলিংহাম, সাকা, ল্যমিনে ইয়ামল, ওলিসে, বরকোলা প্রমুখ নতুন তারকাদের উদয় হল।

এই প্রজন্মের সেরা দুই ফুটবলার লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শেষ টা ভাল হল না। সময় থাকতে ছাড়া টাও দরকার। অর্থ ও রেকর্ড হয়ত কিছুটা কম হয়, কিন্তু সম্মানটা অটুট থাকে।

যৎকিঞ্চিৎ

তিকিতাকা থেকে হাই লাইন ডিফেন্স

সুধীর কর্মকার

২০২৬ বিশ্বকাপে স্পেনের অত্যাধুনিক ফুটবল, ধারাবাহিক সাফল্য এবং পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মত শক্তিশালী দলগুলিকে পর্যুদস্ত করে বিশ্বকাপ জয় স্পেনের ফুটবল সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উরুগুয়ে, ব্রাজিল, হাঙ্গেরি, ইটালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি, দ্য নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মত স্পেন এমনিতেই ফুটবলের এক বড় শক্তি। ১৯৬০ এর দশক থেকে স্পেনের আরও বেশি করে উত্থান। সেখানকার বার্সেলোনা এফ সি, রিয়েল মাদ্রিদ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ প্রভৃতি দলগুলি অনেকদিন ধরেই বিশ্ব কাঁপাচ্ছে এবং তাদের অ্যাকাডেমি থেকে মেসি, জাভি, ইনিয়েস্তা, ইয়েমালের মত অসাধারণ সব খেলোয়াড় বের করে আনছে। স্প্যানিশ কোচরা ইউরোপের বড় বড় দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

এই অগ্রগতির মূল কারণ স্পেনের দুর্দান্ত ফুটবল পরিকাঠামো এবং ক্লাবগুলির অনবদ্য প্রশিক্ষণ। যাকে ভর করে ১৯৬০ থেকে চালু হওয়া চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত উয়েফা ইউরোপিয়ান নেশনস চ্যাম্পিয়নশিপ স্পেনের চার বার বিজয় (১৯৬৪, ২০০৮, ২০১২ ও ২০২৪) এবং দুবার ফিফা বিশ্বকাপ জয় (২০১০ ও ২০২৬)। ১৯৭০ এর দশকে দ্যা নেদারল্যান্ডস এর রেনে মিশেল – জোহান ক্রয়েফ প্রবর্তিত ‘টোটাল ফুটবল’ কে কেন্দ্র করে, যাতে প্রতিটি খেলোয়াড়কে খুব কুশলী (Complete Footballer) ও শারীরিকভাবে অত্যন্ত সক্ষম (Super Fit) হতে হবে এবং নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের ত্রুটিহীন বোঝাপড়া গড়ে তুলে সারাক্ষণ দ্রুতগামী আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে হবে, দেল বস্কের পরিচালনায় ক্যাসিলাস, র‍্যামোস, পিকে, জাভি, ইনিয়েস্তা, ফ্যাব্রেগাস, বাসকে, ফার্নান্দো তোরেস রা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বিশ্বকে উপহার দিলেন স্পেনের জাতীয় দলের (লা রোজা) লাল - হলুদ জার্সি গায়ে সারা মাঠে ফুল ফোটানো তিকিতাকা ফুটবল।

তিকিতাকা ফুটবল হল সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট দ্রুত পাশ খেলে ও দ্রুত জায়গা বদল করে বল ও মাঠের দখল নিয়ে বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দেওয়া। এভাবে পাশ খেলতে খেলতে (Long sequences of passes) হঠাৎ হঠাৎ উল্লম্ব বড় পাশ (Verical Long Pass) খেলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দ্রুত আক্রমণ (Pin pointed swift movement) শানিয়ে বিপক্ষের রক্ষণকে বোকা বানিয়ে গোল দিয়ে আসা। ২০২৬ বিশ্বকাপে লুই দে লা ফুয়েনতের পরিচালনায় সিমন, গার্সিয়া, কুবার্সি, কুকুরেলা, পেদ্রো, রদ্রি, রুইজ, ওলমে, মেরিনো, ইয়ামল, ফেরেন তোরেস, উইলিয়ামসরা এই তিকিতাকা ফুটবলের উপর ভর করে আমাদের উপহার দিলেন অত্যাধুনিক ফুটবলের ‘হাই লাইন ডিফেন্স’-এর চরম প্রয়োগ।

এটি কি? দলের ডিফেন্স সাধারণভাবে অনেকটা এগিয়ে সেন্টার লাইনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মাঠটা ছোট করে দিয়ে খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন তিকিতাকা ফুটবল খেলবে এবং মাঝখান দিয়ে দ্রুত আক্রমণ করবে, পাশাপাশি দুই উইং দিয়েও আক্রমণ চালিয়ে যাবে। পুরো মাঠ নিজেদের এমন মুঠোয় (Compactness) থাকবে যে বিপক্ষ আর জায়গাই পাবে না (Territorial Dominance)। ক্রমশ বিপক্ষের উপর প্রবল চাপ (Aggressive Ball Pressure) তৈরি হবে। এছাড়াও বিপক্ষ পাশ বাড়ালেই অফসাইডে র ফাঁদে (Offside trap) পড়বে। কিন্তু এর বিপদ হল পিছনে বড় জায়গা খালি পড়ে থাকা (Large space behind) এবং অল্প ভুল হলেই বিপদ (Small margin of error)। তাই কোনভাবে বিপক্ষের কেউ বল নিয়ে ঢুকে পড়লে অতি দ্রুত সেন্টার ব্যাকদের দৌড়ে কভার ও ট্যাকল করে বল কেড়ে নিতে হবে (Pacey Centre Backs)। সেটিও ব্যর্থ হলে গোলকিপার (Sweeper Keeper) দৌড়ে এসে বল ক্লিয়ার করবেন। এর সঙ্গে গোলরক্ষক পিছন থেকে আক্রমণের নেতৃত্ব দেবেন ও পাশ বাড়াবেন।

‘স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন’ প্রকাশিত কয়েকটি জনস্বাস্থ্য পুস্তিকা:

- **পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ সুযোগ ও সংস্থান**
- **কুকুর, সাপ ও অন্যান্য কামড় এবং তাদের চিকিৎসা**
- **মশা বাহিত কয়েকটি মারাত্মক রোগঃ ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানি এনকেফেলাইটিস ও জিকা**
- **নতুন ও নতুন করে হওয়া কয়েকটি গুরুতর রোগ: কোভিড, নিপা, মাঙ্কি পক্স, অ্যাডোনা ভাইরাস ডিজিজ, ইবোলা, মারবারগ, স্ক্রাব টাইফাস**
- **পতঙ্গ বাহিত আরও কয়েকটি গুরুতর রোগঃ কালাজ্বর, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া**
- **পেটের রোগ এবং তাদের চিকিৎসা**
- **মনের অসুখ এবং তাদের চিকিৎসা**
- **পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা**

CHAMPIONS

খেলার দুনিয়া

INDIA

apollo

MESSI
G.O.A.T
INDIA TOUR
2025
KOLKATA
13 DEC
MUMBAI
14 DEC
DELHI
15 DEC
district

YONEX

INDIA

INDIA

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সম্পাদকমণ্ডলী তরফ থেকে অরনি সেন কর্তৃক ৮৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বি ক্রীক লেন কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

e-mail: ssunnayan@gmail.com | website:www.ssu2011.com